স্বর্গাদপি গরীয়সী

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য চার টাকা

* *
*

দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫২

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

সৃষ্টির পরিকল্পনায় যাঁরা 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'

তাদেরই উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

"স্বর্গাদপি গরীয়সী" জীবনী নয়, যদিও একথা অস্বীকার করা চলে না যে ইহাতে জীবনীর উপকরণ প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান।

নারী জীবনের পূর্ণ সার্থকতা মাতৃত্বে,—এই মূল কথাটিই বলা আমার উদ্দেশ্য। এই মাতৃত্বের বিকাশ যাঁহার জীবনে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া আমি সেই উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াসী হইয়াছি। এই উপন্যাসের মধ্যে আমার এই ব্যক্তিগত অংশটুকু গৌণ বলিয়া ধরিয়া লওয়াই বোধ হয় ভালো। বিধাতার অনুকম্পায় আমি যে আদর্শ পাইয়াছিলাম উচ্চাঙ্গের—এ-সৌভাগ্যও ব্যক্তিগত, এবং উপন্যাসের পক্ষে আকস্মিক।

বিশেষ ভাবে এই যাহাকে আমি অবলম্বন করিয়াছি, তাঁহার জীবনের সেই অংশগুলিই বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি যাহা নারীর জীবনের এই চিরন্তন বৃত্তি অর্থাৎ মাতৃত্বের পরিপোষক। এর অতিরিক্ত যে সব অংশ, তাহাদের লইয়াছি উপন্যাসের দাবী মিটাইতে। গোটা মানুষটি দাঁড় করাইয়া তুলিতে না পারিলে তাহার কোন একটি বৃত্তির আধার সৃষ্টি হয় না; তেমনি গোটা মানুষটিকে দাঁড় করাইতে হইলে যাহারা তাহাকে ঘিরিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাদের আনিয়া ফেলিতে হয়।....এই করিয়াই যাহা এক কথাতেই বলা চলিত, তাহা বহু কথায় শাখায়িত হইয়া ওঠে,—যাহা মাত্র দুইটি শব্দের মন্ত্র, তাহা শব্দবহুল উপন্যাসে রূপ ধরিবার প্রয়াস করে।

আর একটা কথা বলা দরকার এইখানে। শুধু সত্য লইয়া উপন্যাসের চলে না। এই জন্য ইংরেজীতে উপন্যাসের একটি নামই fiction, বাংলায় এর প্রতিশব্দ গালগল্প। বিধাতা জীবনকে উপন্যাস করিয়া গড়েন না, বিশেষ করিয়া সামান্য একটি বাঙালী মেয়ের জীবনে ঘটনা-সংঘাত এত কম যে সত্য ধরিয়া বসিয়া থাকিলে উপন্যাসের কথা ভুলিতে হয়। সেই জন্য আমায়ও বহুল পরিমাণে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। অত কথা কি, যাত্রাই শুরু করিতে হইয়াছে কল্পলোকের মধ্যে দিয়া, এবং বইয়ের অনেকগুলি প্রধান চরিত্রও কাল্পনিক। এই পর্যন্তই বলিয়া রাখি, নাম করিয়া উপন্যাসের ইণ্টারেষ্ট (যদি কিছু থাকেই) নষ্ট করিয়া আত্মঘাতী হইব না।

আমার মূল উদ্দেশ্য ধরিয়া আরও একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। ঐ যে বলা হইল—"নারী-জীবনের পূর্ণ সার্থকতা মাতৃত্বে" ওটা প্রকাশ পায় ভাব এবং অভাব—দুয়ের মধ্যেই।—নারী-জীবনের এটা যে কতবড় সত্য,-যে মা হইতে পারিল সে তো ফুটাইয়া তুলিলই নিজের জীবনে, যে পারিল না হইতে, সেও কম করিয়া ফুটায় না। সন্তানকে যে পাইয়া অর্ধপথেই হারাইল, সে তো কম নয়ই, এমন কি যে পাইতে চাহিল না সেও মায়ের মনের একটি অপরূপত্বকেই রূপ দিয়া বসে।....তাই গিরিবালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কাত্যায়নী;—আরও পরবর্তী জীবনে মৈথিল বধূ দুলারমন, ঝি খজনী....বিধাতা তাঁর এই শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকে আকার দিতে নারীমনের আরও যে কত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সন্ধান কে-ই বা রাখিতে পারে?

ব. ভ. ম.

প্রথম খণ্ড

প্রথম পর্যায়

১

কি জানি কেন, কাজ করিতে করিতে হঠাৎ শৈলেন কেমন একটু অন্য-মনস্ক হইয়া পডিয়াছে।—

সব ব্যবধান-বৈষম্য মিটিয়া গিয়াছে,—স্থান, কাল এমন কি পাত্রেরও। দেখিতেছে তাহাব ললাট একটি শিশু কন্যার চরণে লুণ্ঠিত—আলতা-পরা, পদ্ম কোরকেব মতো দু'খানি পেলব চরণ।

চারি পাশে আরও কত শত কি সব স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে ঃ গোল-পাতায় ছাওয়া চারখানি ঘব, মাঝখানে ভিজা-ভিজা কালচে মাটির একটা উঠান। একপাশে তুলসীমঞ্চ, তাহাব উপবটা ঢাকিয়া একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ।····সদর দিকে সিঁডি দিয়া নামিয়াই একটা অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথ, তার একদিকে ঝুরি নামা বটের নিচে ধর্মঠাকুরের মন্দির, একদিকে মোড ঘুরিয়াই পাঁচুর মায়ের মুডকির দোকান। পাঁচুর মাকেও দেখা যায়—নথে, অনন্তয় আর ঠ্যাকারে জ্বলজ্বলে মানুষটি।····খিডকির দিকে উঠানটা আস্তে আস্তে ঢালু হইয়া গিয়া মন্থর-গতি কানা-নদীর মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কঞ্চির বেডার উপর ভর করিয়া সাথীর মতোই দুইপাশ দিয়া নামিয়া গেছে পুষ্পিত লতার ঝাড়—বন্য তেলাকুচাও আছে, যত্ন করিয়া আজ্ঞান অপরাজিতাও আছে। একদিকে একটা শিউলি ফুলের গাছ, কতকটা অসময় হইলেও তলায় অল্প ফুল বিছান। গন্ধ পাইতেছে শৈলেন, অস্পষ্ট, কিন্তু ভুল হইবার নয়; সমস্ত মনটাকে

যেন ভরিয়া তুলিতেছে।....শুধু বর্ণ গন্ধই নয়,—পাশেই কাদের বাড়িতে একটি ক্ষুধিত-গাভী হাম্বা রব করিয়া উঠিল, কে তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল— "থাম্, এলাম হাতের পাটটুকু সেরে।....আর তর সয় না ওঁর!"

পরিষ্কার করিয়া নিকানো শিউলি গাছের তলায় খানিকটা জায়গা ইটের বেড়া দিয়া ঘেরা। তাহার মধ্যে নানা আকারের খোলামকুচি, একটা ভাঙা কলসের কাণা, গোটা কতক ইতুর-ভাঁড়, একটা ভাঙা হাতার টুকরা, একটা ছোট বঁটি—সব যত্ন করিয়া সাজানো। শিশুটি এই গৃহস্থালীর কর্ত্রী। একদিকে একখানি ইট পাতা, তাহার উপব একটি হাতভাঙা মাটির পুতুল শোওয়ানো রহিয়াছে। ইটটি দোলনা, পালঙ্ক হইতেও বাধা নাই, পুতুলটি কর্ত্রীর শিশুপুত্র।

ছেলে যে ঘুমাইয়া আছে এমন নয়, অত্যন্ত বায়না ধরিয়াছে, মা বেশ বিব্রত।

ওপাশের একটি ঘরের দাওয়া থেকে ডাক পড়িল—"গিবি, খাবি আয়,·রাখ তোর পুতুল খেলা এখন।"

মেয়েটি গৃহস্থালীর ব্যস্ততার মধ্যে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণীপনার অভিনয়ে মুখখানি রাঙা হইয়া গেছে। সেই রাঙা মুখের উপর, টুকটুকে ঠোঁটের মাঝখানটিতে কম্পমান নোলকের উপর, ছোট্ট শাড়িখানির রাঙা পাড়ের উপর, গাছের ফাঁক দিয়া দীপ্ত রৌদ্রের আলোক আসিয়া পড়িয়াছে—পুণ্য শৈশবের উপর স্বর্গের পরশ;—গাছেব তলাটি হঠাৎ যেন ঝলমল করিয়া উঠিল।

শৈলেন কালের ব্যবধান থেকে দেখিতেছে স্বর্গের ছবি, দাওয়া থেকে কিন্তু যিনি ডাক দিলেন তাঁহার মেজাজ ছবি দেখার অনুকূল নয়। বেশ ঝাঁঝিয়াই বলিতেছেন—"বলি, খেতে হবে না? ঐ আদাড়ে খেলা নিয়ে থাকলেই চলবে? কী বাই বাপু!—পুতুল খেলা তো কেউ কখন

করো না! আয়, এলি, না, নামব?....দেখো মেয়ের চেহারা, দুপুর রোদ্দুরে মুখ একেবারে সিঁদুরবর্ণ হয়ে উঠেছে!"

মেয়েটি অগ্রসর হইতেছিল, আবার ব্যাকুলভাবে একবার ফিরিয়া পুতুলটির পানে চাহিল, তাহার পর আবার মায়ের পানে মিনতিনেত্রে চাহিয়া বলিল—"যাচ্ছি মাগো, একটুখানি রোস, এ—কটুখানি।"

যাইতেছিল মায়ের আহ্বানে, মায়ের কথাতেই তাহার বাধা পড়িল,—দুপুরের রোদে যদি তাহার নিজের মুখ সিঁদুরবর্ণ হইয়া থাকে তো তাহার ছেলেরও তো ঐ অবস্থাই হওয়ার কথা! পোড়ামাটির পুতুলে সিঁদুর বর্ণ কল্পনা করিতে অসুবিধাও হইল না, গিরিবালা গিয়া পুতুলটিকে বুকে চাপিয়া লইল। তাহার পর আরম্ভ হইল বিনাইয়া বিনাইয়া নানান্ রকম আলাপ-অনুযোগ—অবাধ্য ছেলে কথা শোনে না, শুধু দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ানো। রোদ নাই, বৃষ্টি নাই—মুখখানা যে একেবারে সিঁদুরবর্ণ হইয়া গেছে! হুঁস আছে সেদিকে ছেলের? মা একলা মানুষ কতদিকে যে দেখিবে!....

এমন সময় আসল মায়ের আর একটা উগ্রতর ধমক আসিল, নকল মাকে চলিয়া যাইতে হইল।

২

ছেলেটিকে অবশ্য কাঁখে করিয়া লইয়া আসিল।

প্রথম কারণ—কচি ছেলে, তায় ক্রন্দমান, বায়না ধরিয়াছে; তাহাকে একা ফেলিয়া আহার করিতে বসা চিরাচরিত মাতৃধর্মের বিরোধী। দ্বিতীয়ত, এক সে-ভিন্ন দুই বাড়ির শিশুমহলে কেহই স্থায়ীভাবে বিশ্বাস করে না যে ওটি একটি মানবশিশু। সুতরাং ওর প্রতি সবারই পুতুলের-

লোভ আছে, একটা গোটা ছেলের উপর যে দরদ থাকা দরকার তাহা নাই। ঐ হাত-ভাঙার ব্যাপারটাই ধরা যাক, মা অবশ্য ওটাকে ছেলের দস্যিপনার নিদর্শন করিয়া লইয়া তাহার মানবত্বের প্রমাণ পাকা করিয়া লইয়াছে, কিন্তু ভিতরের কথা এই যে, তাহার অলক্ষিতে কোন অদরদীর হাতে ওটি নিছক মাটির পুতুলের মতোই নাড়াচাড়া খাইয়াছিল বলিয়া ওর ঐ দুর্গতি।....মতের মধ্যে যেখানে এতটা প্রভেদ সেখানে ছেলেকে টাঙাইয়া লইয়া যাওয়া ছাড়া উপায় কি? মুখে বিপর্যস্ত মায়ের বিরক্তি ও ব্যাকুলতার ভাবটুকু ফুটাইয়া গিরিবালা রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া উঠিল।

ছোট ভাই হরিচরণ নিতান্তই ছোট। খাইতেছিল, উৎসাহভরে প্রশ্ন করিল—"টোর ছেলেকে ভাট খাওয়াবি ডিডি?"

দিদি চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—"চুপ কর হরু! ও কি ভাত খেতে পারে কখনও?"

হরিচরণের বিশ্বাসটা সত্য আর মিথ্যার মধ্যে দোলে। দিদিকে ছেলে কোলে আর সব মায়ের মতোই ভার মন্থর গতিতে আসিতে দেখিয়া আশা করিয়াছিল পুতুলের মুখে সত্যকার অন্ন দেওয়ার মতো পরম বিস্ময়কর ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করিবে; দিদির কথায় নিরাশ এবং একটু লজ্জিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"মুখ নেই, নারে?"

দিদি পিঁড়ায় বসিতে বসিতে বলিল—"না, মুখ নেই! তোর বুদ্ধি সুদ্ধি কবে হবে বল দিকিন হরু? মুখ নেই তো বেঁচে আছে কি করে?

একে তর্কটা অকাট্য, তায় বুদ্ধি সম্বন্ধে খোঁচা আছে, হরু আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া আহার করিতে লাগিল। গিরিবালা থেবড়ি খাইয়া বসিয়াছে, ছেলে কোলে করিয়া মায়েরা সাধারণত যেমন বসে; মুখে গ্রাস তুলিয়া হাঁটু দুলাইয়া দুলাইয়া ছেলেকে শান্ত করিবার

চেষ্টা করিতেছে! সমস্ত ব্যাপারটিতে সত্যের রূপ আবার এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, হরুর পক্ষে আগ্রহ চাপিয়া রাখা ক্রমেই কষ্টকর হইয়া উঠিল; দু' একবার কোলের পুতুলটার পানে আড়চোখে চাহিল, তাহার পর পূবের প্রসঙ্গ ধরিয়া প্রশ্ন করিয়া ফেলিল—"টবে কেন খেটে পারে না রে ডিডি?"

দিদি দুবন্ত ছেলের মাথায় বাঁ হাতে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল—"ওর কি বয়েস হয়েছে এখনও ভাত খাবার? চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছিস না?"

হরু পুতুলটার দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল; বয়সের কি লক্ষণ আবিষ্কার করিল সেই জানে, বলিল—"খোকাব মোটন, না রে?"

দিদি হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, ভাই-এব মন্তব্যের কোন উত্তর না দিয়া ঘাড়টা একটু তাহার দিকে বাড়াইয়া অপেক্ষাকৃত চাপা কণ্ঠে বলিল—"দু'টি ভাত তোর পাতে তুলে দিচ্ছি, মাকে বলে দিবি না তো? খোকার সমস্ত পাট আমার পড়ে রয়েছে ওদিকে।"

হরু অনেকক্ষণ পূর্বে খাইতে বসিয়াছিল, পেটে বিশেষ জায়গা ছিল এমন নয়, তা ভিন্ন শুধু ভাতের এমন কিছু একটা মোহও নাই; তবুও দিদির প্রয়োজনের গুরুত্বটা উপলব্ধি করিয়া রাজি হইল।

মা ভাত বাড়িয়া দিয়া কার্যান্তরে ওদিককার ঘরে গিয়াছেন, ভাই-বোনের কথাবার্তা তাই এত মুক্ত এবং সাহস এত প্রবল।

"তাহলে আদ্দেকটা দিই?....তা হরু নেবে'খন, বড্ড লক্ষ্মী ছেলে।.... তুইও শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসবি চলে, খেলবি।"—স্তোকবাক্যে ভাইকে ভিজাইয়া ভাত তুলিয়া দিতে যাইতেছিল, ওদিককার ঘর হইতে বরদা-সুন্দরীর গলা শোনা গেল—"হ্যা, দে তুলে ভাত! আমি সব দেখতে পাচ্ছি গিরি;—যখনই কাঁখে ভাঙা পুতুলটা দেখেছি, বুঝেছি খাওয়ার

দফা নিকেশ। একটি ভাত যদি পাতে পড়ে থাকে, আমি জন্মের শোধ খেলা ঘুচুব। না খেয়ে-খেয়ে মেয়ের চেহারা হচ্ছে দেখ না। বাপের আবার শখ ঐ মেয়ে গৌরীদান করবেন। মরি।”

বোধ হয় নিজের দোষটুকু ঢাকিয়া লইবার জন্যই কন্যা বলিল—“তাহলে আর একটু ডাল দিয়ে যাও।”

“ডাল আর হবে না; ডাল আজ বাড়ন্ত ছিল ঘরে, আর একজন মানুষ এখনও খেতে। যেকটা ভাত বাকি থাকে অম্বল দে’ খেও, পাতলা করে অম্বল করছি—হয়ে এল।....হরু, তুইও বসবি একটু।”

দুইজনই একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেছে; খানিকক্ষণ নীরবে আহার করিল,—তাহার পর পরস্পরের মুখের দিকে উভয়ে আড় চোখে চাহিল। বার দু’এক এরূপ চাওয়ার পর দু’টি মুখেই একটু করিয়া অর্থপূর্ণ হাসি ফুটিয়া মায়ের বকুনির গ্লানিটা ধুইয়া দিল; আবার উভয়ের মাঝে পতুলটা আসিয়া পড়িল; ভাই বলিল—“চোর ছেলে চুপ করেছে বুঝি?”

দিদি পা-নাড়াটা বন্ধ করিয়াছিল, ভাই-এর কথায় আবার দোলানিটা শুরু করিয়া দিয়া বলিল—“চুপ করার পাত্তোর কিনা। দেখছিস না চোখে?”

চোখে দেখিয়া কিছু বুঝুক বা নাই বুঝুক, পাছে চোখের মতো কানেরও অপবাদ হয় সেই আশঙ্কায় হরু বলিল—“কান ঝালাপালা করে ডিয়েচে, না রে ডিডি?”

ভাই-এর শ্রবণেন্দ্রিয়ের একবারে এতটা সূক্ষ্মতা দিদি আশা করে নাই, হাসিয়া উঠিয়া বলিল—“তুই হাসালি হরু, কান নাকি আবার ঝালাপালা ক’রেছে!”

তখনই কিন্তু হাঁটুতে একটা দোল দিয়া পুতুলের মাথায় লঘু করাঘাত করিতে করিতে বলিল—“ঐ শোন্, মামা কি বলছে!”

হক পুতুলটাকে দিদিব ছেলে বলিয়া মানিয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে যে তাহারও পদবৃদ্ধি হইয়াছে অতটা খতাইয়া দেখে নাই। উল্লসিত হইয়া একটু লজ্জিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—“আমি ওর মামা হই, নাবে ডিডি?”

দিদি বলিল—“হোস্‌না? আমার ছেলে তোর ভাগ্‌নে হয় না? তুই এত বোকা হক।”

হরিচরণ উবু হইয়া আহার করিতেছিল, জায়গাটা বাঁ-হাতে ঝাড়িয়া লইয়া সভ্যভব্য একজন রীতিমতো মামার মতো আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিল, এবং তাহার পব বাঁ হাতটা পেটের মধ্যে গুটাইয়া লইয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তবুও যেন নিজেকে হালকা বোধ হইতেছিল, মুখেও একটা কিছু না বলিলে যেন মান থাকে না। পাশের বাডির মাখনদাদা সম্প্রতি তাহার ভগ্নী আসিলে বড ভাগনেটির পিঠে হাত দিয়া একটা প্রশ্ন কবিয়াছিল;—তাহা লইয়া আলোচনাটা যেমন গুরুগম্ভীব হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে হবিচরণেব মনে হয় প্রশ্নটার দর আছে। সে বডদেব মতো আরও একটু ঝুকিয়া বসিয়া বলিল—“ছেলের পৈটে কবে ডিবি রে ডিডি?”

দিদিও সমালোচনার সময়টায় ছিল; কি একটা উত্তব দিবে এমন সময় মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দাওয়ায় উঠিতে উঠিতে বলিলেন—“খেয়ে উঠে খোকাটাকে একটু দেখবি গিরি, দাঁত উঠবে না কি, কোন মতেই একটু থির হয়ে ঘুমোতে চাইছে না। বলছি ক’দিন থেকে একটা ওষুধ দাও, পরেব ছেলেকেই ওষুধ বিলি ক’রে ফুরসৎ নেই তা····অম্বলটা বুঝি গেল ধ’রে, একটা মানুষ যে ক’দিক দেখে! দিদি আজও গেছেন কালও গেছেন····”

অভাবের সংসার—লোকের অভাব আর এদিকেও বেশ যে সচ্ছল

এমন নয়, অথচ যাহার ভাবিবার কথা তাহার অন্যের কথা ভাবিয়া অবসর থাকে না। বরদাসুন্দরী একটু গর্ গর্ করেন বেশি তবে কেমন হালকা রাশ, রাগ ধরিয়া রাখিতে পারেন না। তাই, কথায় যেটুকু বলেন সেটুকু কাজে কখনও পরিণত করিতে পারিবেন না বলিয়া স্বামী এবং আর সবাই নিশ্চিন্ত থাকে—সংসারের তাগিদে নিজের নিজের পথ ছাড়িয়া একটুও পাশ কাটাইয়া যাওয়ার প্রয়োজন দেখে না। শরতের আকাশের মতো মানুষটি,—যত গর্জান তাহার চেয়ে ঢের বেশি হাসেন—আওয়াজে বুকটা বোধ হয় একটু দুরু দুরু করে, কিন্তু মুখে সবার পরিপূর্ণ প্রসন্নতাই থাকে ছাইয়া।

অম্বল লইয়া আসিয়া হাতা কাত করিয়া বলিলেন—"ওমা, আজ হরুঠাকুর বড় ভব্যিসব্যি হ'য়ে বসেছেন যে। ব্যাপারখানা কি?"

ভাইবোনে মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে একবার পরস্পরের পানে আড়চোখে চাহিল, হরিচরণ বেশ একটু লজ্জিতও হইয়া পড়িয়াছে। দিদি প্রশ্ন করিল—"বলব হরু?"

হরিচরণ আরও লজ্জিতভাবে ঘাড়টা গুঁজিয়া দিয়া বলিল—"যাঃ"

তাহার আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া গিরিবালা মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি বোকা মা হরু?—খেলাঘরের মামা হ'লে নাকি আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে হয়?"

মা রান্না ঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন, কড়ায় খন্তির দুইটা ঘা দিয়া ঘুরিয়া চাহিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"খেলা ঘরের মা যদি আহার-নিদ্রে ভুলতে পারে তো মামা বেচারি শুধু আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসে আর কি দোষটা ক'রেছে?"

এমন সময় রসিকলালের ঘুড়িটা 'চিঁ-হিঁ-হিঁ' করিয়া ডাকিয়া উঠিল

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছ থেকে আওয়াজ আসিল—"মা-রাণী কই গো?"

বরদাসুন্দরী রন্ধনের পাত্রগুলা গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিলেন—"ঐ নাও আসল ছেলেও এল।....খবরদার উঠ্‌বিনি গিরি; এক পল' দুধ দোব, আর দু'টি ভাত খেয়ে উঠবি দু'জনে।"

"আমি বাবার সঙ্গেই খাব'খন"—বলিয়া গিরিবালা অম্বলের একটা মাছ মুখে ফেলিয়া এবং বাকিগুলা ভাইয়ের পাতে দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

হরিচরণ বলিল—"ডিড টোর ছেলে প'ড়ে রইল!"

মা আসিতে গিরিবালা পুতুলটাকে নামাইয়া পিড়ির পাশে রাখিয়া দিয়াছিল, দাওয়ার নিচে থেকে একবার দ্বিধাভরে ফিরিয়া চাহিল, তাহার পর পুকুরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল—"তুই নিয়ে গিয়ে ওর দোলনায় শুইয়ে দিস্ ভাই হরু, লক্ষ্মীটি।"

৩

গিরিবালার ধারাই ঐ। ওর আট বৎসরের স্বল্প শরীর-মনকে আশ্রয় করিয়া একটি পরিপূর্ণা জননী আছে; সে সর্বদাই আত্মপ্রকাশ খোঁজে এবং সাধারণত দুইটি আধারের মধ্যে দিয়া নিজেকে চরিতার্থ করে;—পুতুল এবং পিতা। পুতুলের ব্যাপারটা এমন কিছু অভিনবও নয়, আশ্চর্যও নয়;—তাহাদের কথা নাই, গতি নাই, মন নাই বলিয়া সব ছেলেমেয়েই তাহাদের মধ্যে নিজেদের সাধ-আহ্লাদ-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিবিম্বিত বেশ নিরুপদ্রবে করিতে পারে। কিন্তু বত্রিশ বৎসরের একটা আস্ত মানুষ যখন আট বৎসরের একটা মেয়ের মনে মায়ের মায়া

জাগায়—তখন আর ও-তত্ত্বটা লাগসই হয় না,—কারণটা একটু আলাদা করিয়া অনুসন্ধান কবিতে হয়।

রসিকলালের বয়স হইয়াছে; শরীরও তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়াছে, কিন্তু মনটা পড়িয়া আছে অনেক পিছনে।....বিত্থারম্ভের বয়স হইলে রসিকলাল হুড-হুড করিয়া সাত আট বৎসর বেশ পড়িয়া গেলেন। এই এক ঝোঁকে তিনি বয়সের যে স্থানটায় আসিয়া পড়িলেন সেখানে মানুষেব বিচারশক্তি আরম্ভ হয়, মনের দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, অনুকরণের যুগ ছাডাইয়া মানুষের বিচাবের যুগ আসিয়া পড়ে; সে ভালোকে চিনিতে শিখে, মন্দকে চিনিতে শিখে, আর তাহাদের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া নিজেও সংসারের জন্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে থাকে। রসিক-লালের মনটা কিন্তু এই চৌদ্দপনের বৎসরের রেখাটিতে আসিয়া দাঁডাইয়া পড়িল। তাহার পর আবার আবম্ভ হইল গতি, কিন্তু সেটা পিছনের দিকে। ওঁর মধ্যে সুপ্ত এক কবি ছিল, সে যেন সংসারের তোরণে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল; ওঁর সঙ্গী হইয়া পড়িল নদী, প্রান্তব আগাছার জঙ্গল; যে-ছেলে বই থেকে চোখ ফিরাইত না তাহার ব্যসন হইল নিরুদ্দেশ ভ্রমণ—বনে, মাঠে, এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে;—দিন রাতই ওঁকে যেন নিশিতে পাইয়া বসিল। ভাল ছেলে যখন ক্লাসে আটকাইয়া গেল তখন পিতার এদিকে ভালো করিয়া চোখ পড়িল; কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে চক্ষু বুজিতে হইল।

এর পর অভিভাবক হইলেন দাদা। বছর চারেকেব বড, অভিভাবক হিসাবে নিতান্ত বেমানান নয়; কিন্তু হঠাৎ বিপদে সংসারের চাপে তাঁহার প্রায় ছয়-সাত বৎসর পর্যন্ত মাথা তুলিবার অবসর রহিল না। এই ছয়-সাত বৎসরের পূর্ণ স্বরাজে রসিকলাল কবে বই টইয়ের পাঠ একেবারে উঠাইয়া প্রকৃতির অবাধ মুক্তির মধ্যে আসিয়া

দাঁড়াইলেন, অর্থাৎ জীবনের এই গঠনের সময় উনি এমন সব সহচরদের মধ্যে কাটাইলেন যাহারা দু'হাত তুলিয়া উঁহাকে শুধু দিলই,—দিল দ্বেষহীন প্রীতি আর অপরিমেয় আনন্দ।....শত্রুতা করিল আর কি, কেন না প্রীতি আর আনন্দের অতিরিক্ত যে আরও কিছু আছে—প্রতিপদেই সংসারকে যাহা বিষাইয়া তোলে—সে-সবের আর সন্ধান পাইতে দিল না। মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের যখন পাকাপাকি একরকম একটা ব্যবস্থা হইল, জ্যেষ্ঠের হুঁস হইল এদিকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ বাকি রহিয়া গেছে। একদিন কনিষ্ঠকে ডাকিয়া কহিলেন—"এবার একটা বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হ'তে হবে তো?"

কনিষ্ঠ নতশিরে নীরব হইয়া রহিলেন।

"বই-পত্তর চুলোয় দিয়ে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়ালি। সংসার পাতলে তার একটা সংস্থান করতে হবে তো?....শুনলাম নাকি পদ্য লিখিস্?"

মস্ত বড একটা সংস্থানের গোড়াপত্তন হইয়াছে ভাবিয়া ভাই মুখটা আরও নিচু করিয়া লইয়া একটু উৎসাহ ভরেই কহিলেন—"চেষ্টা করি মাঝে মাঝে।"

"ঐ হোল,—সেও কম দোষের কথা নয়, খুন ডাকাতির চেষ্টা ক'রলেও দ্বীপান্তর হয়।....খাতাটা তোর বৌদিকে দিয়ে দিস্, খোকার দুধ জ্বাল দেবার জন্যে বিচুলিগুলো নষ্ট করে।"

মুখের দিকে চাহিয়া আকাশ-পাতাল কি চিন্তা করিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর প্রস্তাবটা যেন ভাই-এর চেহারা, স্বভাব, বিদ্যাবুদ্ধি—সব জিনিষের সঙ্গে খাপে খাপে মিলিয়া গিয়াছে এইভাবে বলিয়া উঠিলেন—"হ'য়েছে, হোমিওপ্যাথি পড়, পড়বি?"

ভাই মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

জ্যেষ্ঠ নিজের ব্যবস্থায় হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"ঐ ভালো, তোর ধাতে সইবে। এদিকে যেমন চেরা-ফাড়া নেই, তেমনি আবার কবিরাজির পঞ্চতিক্ত-কটু কষায়, কি গোখরোর বিষ—এ সবেরও বালাই নেই। চিনিতে মোড়া নিরীহ জিনিস—লাগল, লাগল—না লাগল, সোবি আচ্ছা।....বেশ, তুই যা, করছি ব্যবস্থা।"

বছর দেড়েক কলিকাতায় থাকিয়া হোমিওপ্যাথি শিখিতে যে সময়টা গেল তাহারই মধ্যে দিন সাত-আটের মতো একবার আসিয়া রসিকলাল বরদাসুন্দরীকে বিবাহ করিয়া গেলেন।

বুদ্ধিমান ছেলে, তায় কলিকাতায় গিয়া বুদ্ধিটা একটু মাজা-ঘসা খাইল, শিক্ষা লইয়া রসিকলাল গ্রামে আসিয়া বসিলেন। ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ডাক হইতে লাগিল। নূতন কাজের উদ্দীপনার মধ্যে তিনি জীবনকে নূতন ভাবে পাইলেন, চিকিৎসায় সমস্ত প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। রোগ সারিতে লাগিল এবং সম্ভবত সস্তা ঔষধ বলিয়া যে-পসারটা নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল, সেটা মধ্যবিত্তদের স্তর পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। দূর গ্রাম পর্যন্ত পাল্লা দিতে হয়—জ্যেষ্ঠ কি উপায় করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় রসিকলালের চিকিৎসাধীনেই বুড়ো নবীন সা' মারা গেল। নবীন একটা ফক্‌রে ঘুড়ির পিঠে এক হাটে মালপত্র কিনিয়া অন্য হাটে বেচিত। হিসাবী লোক, এই করিয়া নিঃসাড়ে বেশ দু'পয়সা করিতেছিল, তবে অন্য দিকে যে হিসাবের ভুল হইয়া যাইতেছে—ভদ্রোচিত বয়সের গণ্ডি পারাইয়া একমাত্র উত্তরাধিকারী নাতিটিকে যে চটাইয়া তুলিতেছে, সেদিকে খেয়াল করে নাই।.... নিবারণের ঘুড়ি লইয়া হাটে হাটে ঘোরার না ছিল উৎসাহ, না ছিল প্রয়োজন; নবীন যেদিন মারা গেল তাহার দু'দিন পরে আসিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে মুখটা খুব বিষণ্ণ করিয়া রসিকলালকে বলিল—"দাদাঠাকুরের

মেহনতের জন্যে আমি আর কি দেব? এই ঘুড়িটা রইল; ঠাকুরদা' বড্ডই ভালোবাসতো—তবু মনে হবে বামুনের দানাপানি খাচ্ছে। সময় হ'লে বাচ্চাটা-আসটাও দেবে, ঠাকুরদাকে দিয়ে এসেছে বরাবর।"

গ্রামের লোক একটু আলগা ভাবে ইংরাজী ও বাংলা অর্থ একত্র করিয়া ব্যাপারটার নামকরণ করিল নিবারণের 'হর্ষোৎসর্গ',....নিজের উপার্জিত ঘুড়ির পিঠে চড়িয়া রসিকলাল পসার জমাইয়া চলিলেন। সঙ্গে থাকে তাক্ নাপিতের ছেলে হারাণ। ছোঁড়াটা সেই স্কুল-পালানোর যুগ থেকেই কি করিয়া রসিকলালের অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘুড়ির পাশে পাশে ঔষধের বাক্সটা হাতে ঝুলাইয়া বা কাঁধে বসাইয়া লইয়া চলে; রসিক যখন ভিতরে রোগী দেখেন, সে বাহিরে পাঁচজন জুটাইয়া ঘুড়ির আর মনিবের বড়াই করিয়া আসর জমায়; বাড়িতে আসিয়া ঘুড়িটার ঘাস কাটে; পরিচয় দেয়—ডাক্তারঠাকুরের 'কম্পুণ্ডার'; যখন বড়াই করিবার লোক পায় না, মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া ঔষধের বাক্স বা হাতের কাছে যাহা কিছুই পায় তাহার উপর তবলার বোল তোলে।

হাতযশে, ঘুড়িতে আর হারাণনাপিতে পসার জমিয়া চলিল বটে, কিন্তু পয়সা জমিল না। পয়সা করিতে হইলে চিকিৎসকের মাঝখানটিতে একটি সতর্ক হিসাবনবিশ থাকা দরকার। রসিকলালের সেই আসন জুড়িয়া বসিয়া রহিল কবি; নবীনের অত বড় পয়মন্ত কারবার ঘুড়ি আসিয়াও কোন পরিবতন ঘটাইতে পারিল না।

পয়সাহীন পসারের একটা মোটা ইঙ্গিত দেওয়া রহিল, ব্যাপারটা পরে আরও পরিষ্কার হইবে।

রসিকলালের নিয়মই হইতেছে বাহিরে আসিয়া মেয়েকে ডাকিয়া

একটা সাড়া দেন। ভিতরের ভাবগতিকটা আগে একবার বুঝিয়া লন, তাহার পর প্রবেশ করেন। সব সময় যে প্রবেশ করেনই এমনও নয়।

গিরিবালা তাড়াতাড়ি গোটাদুই কুলকুচা করিয়া লইল, হাতের এঁটো খানিকটা জলে ধুইয়া, খানিকটা কাপড়ে মুছিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল এবং বাপের হাঁটু দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া মুখে চোখ তুলিয়া হাসিভরা আবদারের সুরে বলিল—"এনেছ বাবা ?—দাও...."

রসিকলাল হাসি মুখে একটু ঝুঁকিয়া কন্যাকে আদর করিতে যাইতেছিলেন, হাতটা আলগা হইয়া গেল। নিস্প্রভমুখে বলিলেন—"ঐরে ! আজো গেছি ভুলে ; রমেশের দোকানের ওদিকেই যাওয়া হয় নি কিনা...."

কন্যা অভিমানে ঠোঁট দুইটি জড়ো করিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল, বলিল—"যাও, রোজই—'ঐরে, আজও ভুলে গেলাম !'....হারাণে, তোকেও তো ব'লে দিয়েছিলাম...."

হারাণ ঘুড়িটাকে বাঁধিয়া থাটি সহিসেব পদ্ধতিতে—'হিস্-হিস্' শব্দ করিয়া ডলাই-মলাই শুরু করিয়া দিয়াছিল, ঘাড়টা বাঁকাইয়া বলিল—"দাঁড়াও ঠাকরুণ, এক যা ঘুড়ি নিয়ে পড়েছি, ফুরসৎ হলে তো তোমার পুতুলের কথা ভাববে হারাণে ? তা ছাড়া, পুতুলের জন্যে তো কড়ি চাই ? রমেশঠাকুর তো পুতুলের দানছত্র খুলে...."

রসিকলাল ধমক দিয়া উঠিতে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া আবার 'হিস্-হিস্' করিয়া আওয়াজ শুরু করিয়া দিল।

গিরিবালার মুখের ভাবও বদলাইয়া গেল, চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"আজও কিছু পাওনি বাবা ?"

রসিকলাল তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন—"না, পাইনি ! বেলা দুপুর

পর্যন্ত অমান অমনি ঘুরে বেড়াবার পাত্তোর কিনা আমি! আজ যার নাম তিন-তিনটে টাকার হিল্লে করে তবে রসিক বাঁড়ুজ্যে বাড়ি ফিরেছে··· যা খরচ হ'য়ে গেছে তা আর ধরলামই না।"

মেয়ের চোখ দুইটি আপনা-আপনিই পকেটের উপর গিয়া পড়িতে বলিলেন—"কাছে নেই, কিন্তু সে কাছে থাকারই সামিল।"

পাছে সর্বজ্ঞ হারাণ আবার ফোড়ন দেয় সেই ভয়ে বলিলেন—"চল্ না গিরি ভেতরে, সব বলছি কিনা।"

গিরিবালা আর অভিমানিনী কন্যা নাই, এক নিমেষেই অনুকম্পাময়ী মায়ের পদবীতে উঠিয়া গেছে, সেই মায়ের—যার অদৃষ্টলিপি এই যে দুবল সন্তানকে চারিদিকের লাঞ্ছনা থেকে ক্রমাগতই আগুলাইয়া ফিরিতে হইবে।•··রসিকলাল অগ্রসর হইতেই একটু পথ-আটকানো গোছের করিয়া দাঁড়াইল, একবার হারাণের পানে চাহিয়া লইয়া বলিল—"বাবা শোন।"

পিতাপুত্রীর মধ্যে এ ধরণের আলাপ প্রায় প্রতিদিনের ব্যাপার, রসিকলাল বেশ একটু উৎসুকভাবেই মুখটা নামাইয়া লইলেন। গিরিবালা হারাণকে এড়াইয়া চাপা গলায় বলিল—"আজ কিচ্ছু পয়সা আননি বাবা?····ডাল বাড়ন্ত যে। সক্কাল বেলা থেকে মা গরগর করছেন····"

রসিকলাল ধীরে ধীরে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মাথাটা চুলকাইতে লাগিলেন। কন্যা আবার সেইরকম স্বরেই প্রশ্ন করিল—"তোমায় নাকি তিনদিন থেকে বলছেন, বাবা?"

রসিকলালের যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, ভিতরে শুনিলেও ক্ষতি নাই এই রকম সহজভাবে, বরং কতকটা গলা চড়াইয়াই বলিলেন—"ডাল আনতে হবে সে তো আজ তিনদিন থেকে ঐ বেটা নাপতের পোকে বলছি, তা····"

হারাণ হাত এবং শিস-দেওয়া দুই-ই বন্ধ করিয়া ফিরিয়া তাকাইল,

বলিল—"আম্মো তো তিন দিন থেকে কইছি—ডেলের পয়সা দেও, ও বেটা বেনে-বকাল বিজিটের ট্যাকা থেকে দাম কাটাবেনি, বলে—'নগদ চাই, বিজিটের সঙ্গে ডেলের কড়ির কি সম্বন্ধ?'....তবু তারই বাড়িতে আবার কলে যাবেন, ট্যাকা ফেলে রাখবেন। এমন মনিষ্যির...."

এবার কন্যাই ধমক দিল—"আচ্ছা হয়েছে, তুই চুপ কর্; চেঁচাচ্ছে দেখনা শুনিয়ে শুনিয়ে! দূর করে দাও বাবা এমন চাকরকে, কাজ নেই...."

বরদাসুন্দরীর গলা শোনা গেল—প্রতি কথাতেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে—"বাপে-মেয়েতে কি সব পরামর্শ হচ্ছে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? ডালের ভাবনা ভাববার লোক আছে, আমার বলাই ঝকমারি হয়েছিল। দুপুর গড়িয়ে গেল, এখন নেয়ে খেয়ে উব্‌গার করতে হবে, না, এই রকম ঠায় হাঁড়ি কোলে ক'রে বসে থাকব? ...একটা মনিষ্যি যে সকাল থেকে নাগাড়ে...."

গিরিবালা আর্তদৃষ্টিতে বাপের উৎকণ্ঠিত মুখের পানে চাহিয়া হাঁটুর কাপড়টা ধরিয়া বলিল—"চলো বাবা শাগ্‌গির।"

বরদাসুন্দরী রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। সুরটা আরও চড়াইতে যাইতেছিলেন, কিন্তু শঙ্কিত মেয়ের আড়ালে ততোধিক শঙ্কিত বাপকে নতশিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আর গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"মরিঃ, ঢুকলেন দেখোনা মায়ে-পোয়ে—কচি ছেলেও অমন ক'রে মায়ের আড়াল খোঁজে না।"

বরদাসুন্দরীর সংসারের ধারাই এই, এক কথাতেই থমথমে ভাবটা কাটিয়া গেল। রসিকলাল পাশ কাটাইয়া চলিয়া না গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, হাসিয়া বলিলেন—"কচি ছেলেদের যে একটা মস্ত সুবিধে,—বাপ-মায়ে চোখ রাঙাবার মানুষটিকে তখনও এনে হাজির করে না তো।"

"রঙ্গ রাখ', যেন চোখ রাঙিয়েই রয়েছি ; তবে একথাও বলব—অষ্টপহর একজন চোখ-রাঙাবার মানুষ কাছে থাকলেই তুমি থাকতে ভালো ; তোমার দরকার ছিল সেটা।"—বলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। সেখান থেকেই বলিলেন—"চট্ করে তেল মেখে নেয়ে নাও, ভাত বাড়ি। বকে মানুষ সাধ করে ?....একবার আরশিটা সামনে ধর্না গিরি, দেখুন কি চেহারা হয়েছে।"

ঘরে আসিয়াছে, মেয়ে বাপের পায়ের সামনে খড়ম জোড়াটা রাখিয়া জুতা খুলিতে খুলিতে একবার মুখের পানে চাহিল, ঠোঁট দুইটির উপর নোলক দুলাইয়া বলিল—"সত্যি বাবা, কি যে চেহারা হয়েছে তোমার ; মুখের দিকে চাওয়া যায় না।"

রসিকলাল জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিলেন—"নাও, ওদিকে সামলালাম তো মায়ের মুখ ভার। ও তবু মুখের পানে চাইতে পেরেছিল,—হাজার হোক পরই তো ? মা আর চাইতেই পারছে না.... তাই তো বলি...."

মা আবার নিমেষেই মেয়ে হইয়া গেল। হাসিয়া, লজ্জিত চকিত দৃষ্টিতে বাপের মুখের পানে একবার চাহিয়া বলিল—"যাঃ।"

ঐটুকু শরীরের মধ্যে কেমন করিয়া যেন দু'টিতে মিশিয়া গিয়াছে,—যে-মেয়ে ভাবীকালে মা হইবে আর যে-মা অতীতকালে এক সময় মেয়ে ছিল।—নাকের নোলকটির মতোই যেন সোনায় মুক্তায় জড়িত হইয়া মনের কোথায় দোল খাইতেছে।

সেবা আরম্ভ হইল—কোট, গেঞ্জি, র‍্যাপার একবার তাড়াতাড়ি আলনায় রাখিয়া দিয়া তেল, গামছা আনিয়া দেওয়া। ওদিকে তেলমাখা চলিল, এদিকে ছাড়া কাপড়-চোপড় গোছানো চলিল, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের গল্প, হুকুম, সলা-পরামর্শ—"ঐ যাঃ, 'অশ্বত্থমায় নমো' বলে মাটিতে তেল

ছিটুলে না তো বাবা ? তুমি কেমন রোজই ভুলে যাও, পুতুল আনতেও ভোল, তেল ছিটুতেও ভোল। যাকগে পুতুল,—ঘরে ডাল বাড়ন্ত !—কি বল বাবা ? আমিই কি পুতুলের কথা মনে করে বসে আছি ? বলে কাজ থেকেই ফুরসৎ নেই....আজ ও-বাড়ির চিলের ছাদ থেকে নন্তী ঠ্যাকার করে মোমের পুতুলটা দেখালে তাই মনে পড়ে গেল....নয়তো, বলে, কাজ থেকেই ফুরসৎ নেই—মা বেচারি একলা পড়ে গেছেন, খোকার দৌরাত্ম্যি....জেঠাইমা-জেঠামশাই কবে আসবেন বাবা ? পুতুরাণীর কথা আমি জিগ্যেসও করছি না, তিনি তো মামারবাড়ির মানুষই হয়ে গেছেন ! আমরা গরীব, আমাদের এই বাড়িই ভালো, কি বল বাবা ?"

পুতী জেঠতুত ভগ্নী, বয়সে ছোট, মামারবাড়িতে ছেলেপিলে নাই বলিয়া দিদিমা ধরিয়া রাখে, এক রকম সেইখানেই প্রতিপালিত হইতেছে। থাকিলে খেলার ভালো সঙ্গিনী হইতে পারিত বলিয়া গিরিবালা সুবিধা পাইলেই একটু খোঁচা দেয়।

রসিকলাল একটু হাসিয়া বলিলেন—"তাকে না ছাড়লে সে কি করে আসবে বল্ ?....দাদা বোধ হয় কালই চ'লে আসবেন। বৌদিদি ছুটো দিন থাকুন না বাপেরবাড়ি। তোকে যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে পাঠাবে গিরি, আমরা কি একদিনেই ছেড়ে দোব—বল না ?....পুতুল তোর আনব বৈকি। রমেশের দোকানে একটা দেখে রেখেছি—সে পুতুলের সামনে নন্তীর পুতুল দাঁড়াতে পারবে ?....কত দাম বল দিকিন পুতুলটার ?"

কন্যা উৎসুক স-প্রশ্ন নেত্রে চাহিতে মুঠার মধ্য হইতে ছুইটি আঙ্গুল আলাদা করিয়া ধরিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত চক্ষু ছুইটা বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কন্যার মুখটি আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল, বাপের মতোই চোখ বড় বড় করিয়া বলিল—"ছু টাকা !!"

জিনিসটা যেন চোখের সামনেই রহিয়াছে বাপ এইভাবে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন—"দু টাকা! ..আনছিলামও কিনে—ভারী তো দু'টো টাকা, তা ইয়ে হোল...."

মেয়ে কাপড় কোঁচাইয়া র‍্যাপার পাট করিয়া তামাক সাজিতেছিল, হুকাটা হাতে তুলিয়া দিল। রসিকলাল গলাটা খাটো করিয়া বলিলেন —"তোর মাকে বলবি নি তো?"

মেয়ে গম্ভীরভাবে বলিল—"মাকে কেন বলতে গেলাম? বোঝেন না সোঝেন না—সব কথাতেই গজর গজর ..."

রসিকলালের বক্তব্যটাকে জোরাল করিবার জন্য একটা উপমা দিয়াই আরম্ভ করিলেন—"এই ধর, নন্তীর কথাই গিরি—ঠ্যাকার করে তোকে দামি মোমের-পুতুল দেখালে,—দেখালে তো?—এখন যদি ওর পুতুলটি চুরি যায় কি ভেঙে যায়, আর তোকে বলে—'গিরিদিদি, তোর পুতুলটা একবার দে ভাই, খেলি'—তো 'না' বলতে পারবি? বল না?"... (হঠাৎ একটু উষ্ম হইয়া)—"ঐ গোকুল হারামজাদা—গাল না দিয়েও পারিনে—আমার কাছেই মেয়ের চিকিচ্ছে করাচ্ছিল, ছাড়িয়ে দিয়ে ডাকলে তো মতি চাটুজ্জেকে?....আজ আসছি, দেখি মুখটি চুণ করে বাইরের দাওয়ায় বসে আছে। 'কিগো গোকুলদা' মেয়েটা আছে কেমন?'.... 'আর ভাই, তোর হাত থেকে নিয়ে মতিকাকার হাতে দিলাম, এখন অ্যালোপেথি চিকিচ্ছের হিড়িক সামলাতে বুঝি মেয়েটাকে হারাতে হয়। মতিকাকা ওষুধ পথ্যিতে তিনটাকাব ফর্দ ধ'রে দিলে; বললাম—হাতে কুল্যে ঐ কটি টাকা আছে, তোমার ভিজিটটা না হয় আর একদিন দিয়ে দোব মতিকাকা—পরের ডাকে একসঙ্গে চারটে টাকা,....কোন মতে শুনলে না! বলে—বড় খরচের টানাটানিতে আছি—আজকাল কল্‌ও নেই তেমন, হেনতেন, সাত সতেরো....তার হাতে দুটি টাকা তুলে

দিয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি—কোথা থেকে ওষুধ আনাই, কিঁ করেই বা দু'টো বেদানা-কমলালেবু জোগাড় করি'....একটা মেয়ে ধুঁকছে গিরি, আর সে-সব পুরনো কথা মনে করে রাখতে পাবি ? মেয়েতো সবারই সমান—হ্যাঁগো গিরি, তুই-ই বল না ? তার ওপর আবার আমার গলা শুনে গোকুলদার বৌ ঘোমটা টেনে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ;—মায়ের প্রাণ ! ...পেয়েছিলাম গোটাকতক টাকা আজ—সামন্তর ওখানে আট আনা, ছ'কড়ের ওখানে আট আনা, এদিকে দাসু খুড়োব ওখানে দু' টাকা, সেখেদের বাড়ি ..."

বরদাসুন্দরী দুধটুকু জ্বাল দিয়া লইতেছিলেন, তাগাদা দিলেন—"তোমাদের হোল গা গপ্প শেষ ?"

রসিকলাল বলিলেন,—"তুমি বাড়ো না, একটা ডুব দেওয়া বৈ তো নয়। গিরি তামাকটা সেজে হাতের সামনে ধরলে নেহাৎ...."

গিরিবালা একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, সমস্ত বর্ণনাটিব মধ্যে একটি চিত্র তাহার মনে যেন গাঁথিয়া বসিয়া গিয়াছিল—'গোকুলদা'র বৌ ঘোমটা টেনে দোরগোড়ায় এসে মুখটি নিচু করে দাঁড়াল ; মায়ের প্রাণ ! ...'

এই বাপেরই মেয়ে তো ? তাহার উপর বিষাদে-আনন্দে, গৌরবে অভিমানে বিশ্বের যত মা সবাই যেন ওর আট বছরের দেহটিতে ভিড় করিয়া জড়ো হইয়াছে। ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—"আহা, ভালো হয়ে যাক, না বাবা ? পুতুল নাকি পালিয়ে যাচ্ছে ?—কি বল বাবা ?"

"আহা, তা আর নয় ? আর ও-টাকা আমার যাবে ভেবেছিস নাকি ? আমার !...এই দেখো, তোকে আসল কথাটাই বলতে ভুলে বসে আছি—আজ কোথায় গেছলাম বল দিকিন ?"

বরদাসুন্দরীর তাগাদা আসিল—"কৈ, ভাত যে বেড়ে ফেললাম।"

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE * LIBRARY
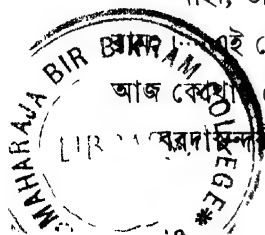
কথাটা মিথ্যা জানিয়াও মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিবার সাহস হইল না। রসিকলাল হুঁকা রাখিয়া গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

আহারে বসিলে বরদাসুন্দরী বলিলেন—"আজ বড্ড দেরি করে ফেলেছ, খুব দূরে গেছলে নিশ্চয়? পয়সার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, শরীর কালি ক'রে অত দূরে যাবার কি দরকার বাপু?"

কন্যা বলিল—"কোথায় যে গেছলে আজ বাবা, তখন বলতে বলতে নাইতে চলে গেলে?"

রসিকলালের হাতটা যেন থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কন্যাকে বারণ করিয়া দেওয়া হয় নাই, সে যে পাড়িবেই কথাটা তিনি বরাবর আশঙ্কা করিতেছিলেন। আর উপায় নাই দেখিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, গেছলাম বৈকি।—মাঝের-পাড়ায় হঠাৎ অখিলদা'র সঙ্গে দেখা। আমিও যাব না, সেও ছাড়বেনা...."

স্ত্রী ও কন্যা প্রায় এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—"গেছলে নাকি সিমুরে?"...."গেছলে নাকি মামার বাড়ি বাবা?"

রসিকলাল একবার কাসিয়া একটু যেন স্খলিত কণ্ঠেই বলিলেন—"না গিয়ে উপায় ছিল? অখিলদা ছাড়বার পাত্তোর কিনা! গোটা দু'এক টাকা পেয়েছিলাম খরচ হ'য়ে গেল, কুটুমবাড়ি তো আর খালি হাতে যাওয়া যায় না।"

মেয়ে আবার যাহাতে কিছু না বলিয়া বসে সেজন্য একবার চকিতে তাহার পানে চাহিয়া লইলেন।

বরদাসুন্দরী প্রসন্নভাবেই, বরং একটু গর্বের সহিতই বলিলেন—

"তা খরচ হয়েছে বেশ হয়েছে। জামাই ডাক্তারি করছে, দু'টো টাকার মিষ্টি নিয়ে গেছ তো আর কি অন্যায় করেছ? তবে একটা টাকা হ'লেও নিন্দে হ'ত না। তা যাক গে।....মা কেমন আছেন? পিসিমা, দাদা, বিকাশ, মেজদি', বৌদি', বড়দি'?....বড়দি' এদিকে আর এসেছিলেন?"

রসিকলাল বলিলেন—"আছে ভালোই সব। শাশুড়িঠাকরুণ বাপের-বাড়ি গেছেন, কাল-পরশু নাগাৎ ফিরবেন। না, বড়দি' আর আসতে পারেন না, তাঁর নাকি আবার ঝঞ্চাট বেড়ে গেছে। এঁরা সব আমায় কোনমতেই ছাড়বেন না, বলেন—"চৌধুরীদের ওখানে বাস হচ্ছে—গোপাল উড়ের যাত্রা এসেছে, দেখে যাও; বললাম...."

বরদাসুন্দরী বলিলেন—"দেখে এলেই পারতে একটা রাত, অত ক'রে বল্‌লে যখন....হারাণেকে দিয়ে বলে পাঠাতে।"

রসিকলাল যেন ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতেছেন। গিরিবালা শিশু হইলেও যেখানে বাপের চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা সেখানে পাকা গৃহিণী। বাকি টাকার কথা যে গোপন করিতে হইবে সেটা সে বুঝিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, ও-রহস্য ছাড়া আরও কিছু আছে যেন, সেটা প্রকাশ হইয়া যাহাতে না পড়ে বাবা যেন সেটুকু বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া চলিতেছেন। নয় তো সবই তো ভালো কথা, মিষ্টি পর্যন্ত লইয়া গেছেন শ্বশুরবাড়ি, অথচ বাপের কথার যেন বাঁধুনি নাই, কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব ভিতরে ভিতরে।

—গিরিবালা সতর্কভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বরদাসুন্দরীর কথায় রসিকলাল যেন একটু ওরই মধ্যে উৎসাহ পাইলেন, বলিলেন—"দাদা নেই, থাকব আর কি করে? তবে বলে এলাম—দাদা বৌদি' এসে গেলেই গিরি আর সাতুকে নিয়ে যাব।....যাবি নাকি গিরি?"

গিরিবালা রহস্যের সমাধানে অন্যমনস্ক হইয়া আছে, ঘাড়টা ঈষৎ নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। বরদাসুন্দরী বলিলেন—"তা বেশ করেছ, যাবে ওরা ; আহা এখানে দেখতে পায় না ওসব, যাবে না ?"

তাহার পর তাঁহার স্বরটাও হঠাৎ যেন জড়িত হইয়া গেল, বলিলেন—'হ্যাগা, একটা কথা জিগ্যেস করব ? ...আচ্ছা থাক্, আগে খেয়ে নাও।"

রসিকলালের মুখটা শুকাইয়া গেল, হাতটাও বন্ধ হইয়া গেল, যেন এতক্ষণ যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই আসিয়া পড়িল শেষ পর্যন্ত। একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন—"কি বলোই না।" সঙ্গে সঙ্গে যেন বিপদটার সম্মুখীন হইবার নেশা চাপিয়া গেল, হাত গুটাইয়া লইয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া লইয়া বলিলেন—"না, বলো, নইলে আমি এই হাত গুটিয়ে বসলাম।"

বরদাসুন্দরী যেন আরও গুটাইয়া গেলেন—নিজের বাপের বাড়ির কথা, স্বামীকে মনে হয় সেখানে তাঁহার পক্ষেও কুটুম। দু' একবার চোখ তুলিবার চেষ্টা করিয়া মুখটা নিচু করিয়াই বলিলেন—"গেলে—নাওয়া-খাওয়ার সময়, তা তারা খেতে বল্লে না ? পিসিমা রয়েছেন, মেজদি' রয়েছে, বৌদি' রয়েছে....মানে, এক সুযিতে বামনকে দু'বার খেতে নেই কিনা তাই জিগ্যেস করছি।"

মন থেকে মস্ত বড় একটা বোঝা নামিয়া যাওয়ায় রসিকলাল হালকা ভাবে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"এই কথা ? আমি মনে করি—না জানি কত বড় একটা কথা বলবে।....তা, তারা জামাইকে ভাত দেবে ? শুনে রাখ্ গিরি, তোর গর্ভধারিণীর বুদ্ধির কথা, সেখানে গিয়ে বলবি।"

শ্বশুরবাড়ির কথাটা একেবারে গোপন করিবার অভিপ্রায়েই রসিকলাল ক্ষুধা না থাকিলেও আহারে বসিয়াছিলেন, এখন লুচি

খাওয়ার উপবই জোর দিয়া কথাটা সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন—"তাড়াতাড়ি হ'লেও তারা লুচি আর আগডম্-বাগডম কি সব করেছিল; দিনের বেলা দু'টি ভাত না চাপা দিলে কি চলে? তাই মনে করলাম এক মুঠো ভাত খেয়ে নিই।"

এর পর কথা বেশ সহজভাবে চলিল অনেকক্ষণ, ফাঁড়াটা যেন কাটিয়া গেছে। তিন জনেই বেশ প্রাণ খুলিয়া যোগদান কবিলেন। হরিচরণেব ঝোকটা ঘুড়ির দিকে বেশি; এতক্ষণ বাহিবে ছিল, সেও আসিয়া নিজের টবর্গ-সঙ্কুল আলাপে আসরটাকে জমাইয়া তুলিল। তবকারির পর্ব শেষ হইলে বসিকলাল দুধেব বাটিটা টানিয়াছেন, এমন সময় বরদাসুন্দরী কতকটা আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন—"শুনেছিলাম বাড়িতে অখিল এবাব খুব ভালো মলো কবেছে, আব পালং শাকের গোড়া; কলকাতা থেকে নাকি ফুলকপিরও বিচি আনিযে লাগিয়েছিল··· কাটারিভোগ ধানের চিঁড়েও এবাবে কবলে কিনা কে জানে··"

রসিকলালের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়েও শুকাইয়া গেল। দুধের বাটি থেকে হাতটা টানিয়া লইয়া প্রায় উঠিয়া পড়িয়াছেন, বরদাসুন্দরী শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করিলেন—"কি হ'ল?"

এমন সময় হারাণ স্নান কবিয়া আসিয়া উঠানে কলাপাত বিছাইয়া বলিল—"দাও ছোট মাঠাকৃরুণ। ওখানেও হ'ল একচোট, কিন্তু দীঘ্য পথ, ক্ষিধে নেগে গেছে। কোথায় ভেবেছিনু ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি,—আজ বাড়ি এসে কুটুম বাড়ির মত্তমান কলা আব সাতেভোগ-ধানের চিঁড়ে ফলার করব, তা যত সব হাভাতের দল বাস্তা এগলে ব'সে রয়েছে; বাবাঠাকুরও তো দাতাকণ্ণ হয়ে····"

রসিকলালকে সামনে দাওয়ার উপর দেখিয়া থামিয়া গেল। বরদাসুন্দরী কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন, একটি কথা বলিলেন না।

ঘরে আসিয়া গিরিবালা চাপা ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"আবার সব বুঝি বিলিয়ে দিয়ে এসেছ বাবা—মামারবাড়িতে যা-সব দিয়েছিলেন ?"

রসিকলালের অপরাধী-ভাবটা তখনও কাটে নাই ; বলিলেন—"এক ছিলিম তামাক সাজ তো গিরি ; শখ করে বিলোব আমায় কি তেমনি বোকা পেয়েছে লোকে ? বাগ্দিপাড়া হয়ে আসব, দেখি দুলো বউটাকে বেধড়ক্ মার দিচ্ছে ধ'রে....তুই নিজে প'ড়ে ; রোজগারের দ্বিতীয় লোক নেই, একপাল কাচ্ছাবাচ্ছা—ও বৌমানুষ কদ্দূর কি করবে ?... তুই-ই বল না গিরি, আনতে পারতিস চিঁড়েগুলো বয়ে তাদের মাঝখান থেকে ?....তোর গর্ভধারিণীই পারত আনতে ?—অত যে মুখ ভার, অত যে তম্বি ?...."

৪

শৈলেনের এক একবার এই রকম হয়—কয়েকটা তীব্র-অনুভূত মুহূর্তের সমষ্টি হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া পড়ে,—মনে হয়, তাহার জাগ্রত দৃষ্টির উপর কে যেন স্বপ্নের প্রলেপ দিয়া গেল।—তাহাকে ঘিরিয়া আজিকার এই যে মহাকালের অংশটুকু—তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তন্ত্রী ছুঁইয়া বর্তমান এই যে নানা সুরে মিশ্র সঙ্গীত তুলিতেছে—এ সবই যায় মিটিয়া, স্তব্ধ হইয়া, আর তাহাদের জায়গায় জাগিয়া উঠে অতীত। জানার সঙ্গে অজানা মেশে, শোনার সঙ্গে অশ্রুত। সত্যে-মিথ্যায়, হাসিতে-অশ্রুতে কি যে একটা মায়াপ্রবাহ চলে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ইতিহাস-মাত্র নয় বলিয়া এ-অতীত প্রশ্নের উত্তর দেয় না, শুধু চলার মাতনে টানিয়া লইয়া চলে।—শৈলেন চেনে ঐ শিশু-জননীকে,

তার ঐ বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুটিকেও চেনে; গৃহের ঐ লক্ষ্মীকে চেনে, হকও চেনা, তার ঐ টকারের টঙ্কার না শোনা থাকিলেও। কিন্তু কে হারাণ, কে সামন্ত, দুলোই বা কে?—রুগ্ন মেয়ের অশুভ আশঙ্কা লইয়া যাহার বধু ঘোমটা টানিয়া নত নয়নে দোরগোড়াটিতে দাড়ায়?....অতীত যেন যাদু জানে,—সত্য আর অলীক মিলাইয়া একটা চঞ্চল স্বপ্নস্রোতের রচনা করে দু'টাকে পৃথক করিয়া দেখিবার জো নাই, তাহা হইলে সমস্ত স্রোতই হইয়া যাইবে অবলুপ্ত!... শৈলেন তাই প্রশ্ন করে না, মুগ্ধনেত্রে দেখিয়াই চলে, মাত্র দেখার আনন্দেই নিজেকে হারাইয়া ফেলে।—

সেই মেয়েটি,—শিউলি গাছের তলায় ভাঙা পুতুলের উপব জননীর করুণ দৃষ্টি মেলিয়া যে দাঁড়াইয়াছিল—মায়েব গঞ্জনাব ভয়ে বাপকে যে ছেলের মতোই আড়াল করিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল—শ্বশুববাড়ির সওগাৎ বিলাইয়া বাপ যাহাব অনুকম্পায়-ভরা চোখ দু'টিব উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"তুই-ই বল না গিরি, আনতে পারতিস্ চিঁড়েগুনো বয়ে তাঁদের মাঝখান দিয়ে?"....

গিরিবালার মুখটি ভালো করিয়া মুছানো, কপালে কাচপোকার টিপ, মাথায় বেড়া-বেণীর খোঁপা টান করিয়া সযত্নে বাঁধা। পরনে ডুরে শাড়ি, গায়ে একটি খাটো সাটিনের জামা—বোধ হয় বছর দু'এক আগে কেনা। কাঁধে পাট-করা একটি রাঙা গাঁতি।

পাশে বাপ।—গৌরকান্তি, দীর্ঘ সুঠাম বত্রিশ বৎসরের যুবা পুরুষ। প্রসন্ন দৃষ্টি, সর্বব্যাপী কারুণ্য, আর, একটা আত্মভোলা ভাবের জন্য যৌবনের সঙ্গে যেন একদিক দিয়া শৈশব, আর একদিক দিয়া পবিত্র বার্ধক্য আসিয়া মিশিয়াছে। পোষাক একটু বেশী পরিচ্ছন্ন।

পিছনে হারাণ। মাথায় একটা বেতের ঝুড়ি, তাহার একদিকে দুইটা লাউ, গোটা কতক চালদা আর কিছু করমচা ; অন্য পাশে একটা নেকড়ায়-বাঁধা কয়েক রকম বড়ি, কিছু পাঁপড় আর খানিকটা নূতন গুড়। অন্য একটি পুঁটুলিতে কিছু কদমা আর নূতন গুড়ের মুড়কি। হারাণের ভাবটা বেশ প্রসন্ন নয়। যেন কতকটা জাতিচ্যুত,—তাহার মাথায় বহিবার উপযুক্ত জিনিস ঔষধের বাক্সটা ; সে তখন পা ফেলে কম্পাউণ্ডারের দর্পে। অন্ততঃ তাড়াতাড়ি গ্রামটা ছাড়াইয়া গেলে যেন এই লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পায়—ভাবটা কতকটা এই রকম।

কাল সন্ধ্যার সময় হঠাৎ দাদা-বৌদিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাদা চার দিন ছিলেন না, আজ ডাল বাড়ন্ত গেছে, কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আরও কত কি যে 'বাড়ন্তের' খবর পাওয়া যাইবে বলা যায় না। এই চারটে দিনের উপার্জনের হিসাব দাদাকে দিতে হইবে—আর বিপদ এই যে, বহুদিন পরে কপাল দোষে এই চারিটা দিনেই বেশি উপার্জন হইয়াছে। কিন্তু একটি পয়সা বাড়িতে আসে নাই।

এ-অবস্থায় মানে মানে সরিয়া পড়াই ভালো। রসিকলাল কন্যাকে সামনে আগাইয়া দিলেন, বলিলেন—"গিরি, তোর জেঠামশায়কে বল সিমুরে যাওয়ার কথা, রাস ফুরিয়ে গেলে আর যাবি কবে? বলবি বড় দিদিমা মাথার দিব্যি দিয়ে বলে পাঠিয়েছে বাবাকে দিয়ে ; আর সত্যি দিয়েছিল মাথার দিব্যি, কাজের চাপে ভুলে গিয়েছিলাম, এই এক্ষুণি আমার হঠাৎ মনে পড়ল। আমায় জিগ্যেস করলে আমিও বলব ; যা, রাজি কর গিয়ে।"

রাত্রিটা খানিকটা চিনিবাস সেকরার দোকান, খানিকটা ভবনাথের

বৈঠকখানা এই করিয়া কাটাইয়া দিলেন। ভাই ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, সকাল সকাল আহার করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলে রসিকলাল সন্তর্পণে আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরিবালা জাগিয়া ছিল, চুপি চুপি খবর দিল—"রাজি করেছি বাবা জেঠামশাইকে, কাল বিকেলে যাব আমরা। সাতু যেতে পারবে না বাবা, নতুন জুতোতে সমস্ত পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, আহা।"

একটু থামিয়া অল্প একটু ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"দেখলে তো বাবা? আমাদের পুতুরাণীর এবারও আসা হ'ল না! এলে তো যেতে পারতো?"

রসিকলালের আজ পুতির সম্বন্ধে মেয়ের চিরন্তন নালিশের দিকে মন ছিল না, প্রশ্ন করিলেন "তোর জেঠাইমা কোথায়? দাদা ঘুমিয়েছেন?"

গিরিবালা বলিল—জেঠামশাইকে তো আমিই মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এলাম। জেঠাইমা খোকার কাথায় ফুল তুলছেন রান্না ঘরে বসে, মা রাঁধছেন।"

"ডেকে আনতে পারিস্ তোর জেঠাইমাকে?"

গিরিবালা উঠিয়া দুয়ার পর্যন্ত যাইলে বলিলেন—"আর শোন গিরি, তুই তোর গর্ভধারিণীর কাছে একটু বসবি ততক্ষণ রান্নাঘরে,—ভয়-তরাসে মানুষ, তায় অন্ধকাব রাত্তির...."

ভাজ বসন্তকুমারী আসিয়া কহিলেন—"কোথায় ছিলে গো ঠাকুর? উনি যে ক'বার খোঁজ করলেন....হ্যাঁগা ঠাকুরপো, দু'টো দিন মানুষটা ছিল না, একেবারে শিবের সংসার ক'রে রেখেছ? কিছু পাও-টাও নি এ ক'টা দিন?"

"না, তা কি আর পেয়েছি? একটু ফুরসৎ ক'রে যে একবার বাজারটা ক'রে আনব তার উপায় ছিল না, এমনি কলের হিড়িক;

মাংনাতেই বুঝি ঘুরে বেড়িয়েছি। ছোটবৌ বুঝি পাঁচখানা ক'রে লাগিয়েছে তোমার কাছে?....হ্যাঁ, তোমায় যে কেন ডাকলাম....মনে পড়েছে—পাচটা টাকা হাওলাত দিতে পারো?"

বসন্তকুমারী ঠোঁটটা উল্টাইয়া বলিলেন—"কি যে বলে, তাই,—খুব মহাজন ধরেছ! আর এত রাত্তিরে হঠাৎ টাকা?"

"ঠাট্টা নয়, দরকার। মোটা সুদ পাবে, দাও দিয়ে আসি, ভবদাদার বৈঠকখানায় বসে আছে।"

"লোকটা কে?"

দেবর একটু রাগিয়াই বলিল—"ঐ তোমাদের মেয়েমানুষদের কেমন একটা রোগ। যদি নামই বলবে তো এক পহর রাত করে গা ঢাকা দিয়ে আসবে কেন? দাও, তোমার টাকা মারা যাবে না, আমি জামিন রইলাম।"

অনেক করিয়া তিনটি টাকা পাওয়া গেল, আর ছিল না। পরের দিন রসিকলাল দাদা উঠিবার পূর্বেই "কল"-এ বাহির হইয়া গেলেন। সিমুরে যাওয়া ঠিক হইয়াছে, একটু সকাল সকালই ফিরিলেন। আরও তিনটি টাকার সংস্থান হইয়াছে,—দুইটি উপার্জন, একটি কর্জ। রাত্রের টাকার সঙ্গে মিলাইয়া দাদার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন—"গিরি বলছিল ওকে নিয়ে নাকি সিমুরে যেতে বলেছ তুমি?"

বড় ভাই অন্নদাচরণ একটু রুক্ষ প্রকৃতির লোক—অন্তত বাহিরে তো নিশ্চয়ই। তেল মাখিয়া তামাক খাইতেছিলেন, মাথায় একটা লঘু ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—"হবে না যেতে? মাস-শাশুড়ি না মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছে?"

রসিকলাল বলিলেন—"মাথার দিব্যি ওঁদের কথার মাত্রা একটা। কথা হচ্ছে, কতকগুলো কেস হাতে রয়েছে, এই সময় চলে যাওয়া...."

ভাইয়ের সাক্ষাৎ পান নাই বলিয়া কাল রাত্রি থেকে কথাগুলো জমিয়া আছে, অন্নদাচরণ রাগের চোটে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"তোকে যেতে হবে। তিনি যখন দেখতে চেয়েছেন গিরিকে, তখন যেতে হবে তোকে, এই আমার কথা। কেস্!—এক ঢঙের কথা শিখেছিস—কি যে হচ্ছে কেসে তাতো দেখি না, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো! দুটো দিন ছিলাম না, ঘর একেবারে....."

রসিকলাল রাগের ভান করিয়া বলিলেন—"বেশ, যাব, আমার আর কি? পাচ্ছিলাম এই সময়টা কিছু, ইনফ্লুয়েঞ্জাটা নেমেছে একটু, গুটি ছয়েক টাকা জমেছিল, রাত্তিরে এসে দেখি তুমি ঘুমুচ্ছ, দিতে পারিনি, এই গোটাচারেক নাও; দুটো আমি হাতে রাখলাম, যেতেই যখন হবে বলছ।"

যাত্রার গোছগাছের মধ্যে বসন্তকুমারী একটু চাপা গলায়ই অনুরোধ করিলেন—"টাকা তিনটে দিয়ে দিও ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি, এই যা হাতে ছিল—আসবার সময় মেজকাকা দিয়েছিলেন। আর ও-তিনটেও হাওলাত নাকি? নাঃ, তোমার যে কি হবে, ভেবেই পাই না।"

তিনজনে চলিয়াছে। বাড়ি থেকে প্রায় পো-তিনেকের মাথায় কানানদী, তাহাতে বড-নদী অর্থাৎ দামোদরের জল নামিয়াছে, ওপারে গিয়া গরুর গাড়িতে উঠিতে হইবে। ক্রোশ তিনেক পথ বাহিয়া বড়-নদী, তাহার তীরে গাড়ি ছাড়িয়া দিয়া নৌকায় পার হওয়া। আবার প্রায় আধ ক্রোশ হাঁটা। তারপর সিমুর।

বেলা প্রায় দুপুর। কার্তিক মাস, নূতন শীতের হাওয়ার সঙ্গে আতপ্ত রৌদ্র মিশিয়া বেশ একটি মিঠা আমেজের সৃষ্টি করিয়াছে। বাপের দীর্ঘ

মন্থর পদক্ষেপের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিরিবালা খুর-খুর করিয়া দ্রুত চরণক্ষেপে চলিয়াছে, পথের মাটির গায়ে চঞ্চল আলতার রেখা চিকচিক করিতেছে। বাপে মেয়েতে কি সব কথা হইতেছে, গিরিবালা এক একবার মুখ তুলিতেছে, নাকের নোলকটি গড়াইয়া পড়িতেছে, আবার মুখ নত করিতে ঢুলঢুল করিতেছে।

এদিকে সিংহবাহিনীর মন্দির। দুইজনে সিংহবাহিনীকে প্রণাম করিলেন। প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের নিচে রথতলা। মেয়ে আবার বেশি ভক্তিমতী, রথে মাথাটা ঠেকাইয়া আসিতে গেল! রসিকলাল বলিয়া দিলেন—"শাগগির আসবি, ওদিকে আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে "

সমবয়সি ছেলেমেয়েরা জুটিয়াছে, প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাচ্ছিস্ রে গিরি?"

গিরিবালার পায়া ভারি এখন, বিশেষ কাহারও দিকে না চাহিয়া চলিতে চলিতেই বলিল—"শিমুরে,—মামারবাড়ি।"

"কবে ফিরবি?"

"দেরি হবে, দিদিমা ছাড়বে তবে তো! চৌধুরীবাড়ি রাস আছে, যাত্রা আছে।"

"হেঁটে যাবি?"

"হেঁটে নাকি মামারবাড়ি যাওয়া যায়? এপাড়া-ওপাড়া কিনা!"

মুখটা খুব ভারিক্কে করিয়া আবার আসিয়া বাপের সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গীরা খানিকক্ষণ এই নবসৌভাগ্যশালিনীর পানে চাহিয়া রহিল, কি বলাবলিও হইল একটু। দু'একটি মেয়ে ঠোঁট দুইটি চাপিয়া একটু উল্টাইয়া লইল—সম্ভবত গিরিবালার দেমাক লইয়া মন্তব্য হিসাবে।

রথতলার পর রাস্তাটা আঁকিয়া বাঁকিয়া উত্তর হইয়া পশ্চিম দিকে

চলিয়া গিয়াছে। দুইদিকে পানায়-ভরা ডোবা, বাগান, মাঝে মাঝে ছাড়াছাড়া বাড়ি। পাড়াগাঁয়ে সাজিয়া-গুজিয়া পথচলা যে নিত্যকার ব্যাপার এমন নয়, নানারকম প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে তিনজনে অগ্রসর হইতে লাগিল।—

"বাঁড়ুজ্জে মশাই, পেন্নাম হই। দূরের পাড়ি যেন?"

"কল্যাণ হোক। দূরেই যাব একটু, সিমুরে।"

"ও, তাই বলছিলাম, বাঁড়ুজ্জে মশাই যেন গাঁয়ের বাইরে যাচ্ছেন বলে মনে হ'চ্ছে।"

"কম্পাউণ্ডার সায়েবের মাথায় ঝুড়ি কেন? গিরিমায়ের সেজে গুজে বাপের সঙ্গে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?···কোথায় গো রসিক?"

"একটু সিমুর যাব, ঠাকুরদা"

"নাৎবৌ কোথায়?"

"সে তো এখানেই।"

"তবে আর সিমুরে কি রইল?—আঁটিসার আমটা,—হাঃ—হা—হা।···তা যাও, মাঝে মাঝে একটু অদর্শন ভালো। নতুন বৌ জিগ্যেস করছে—

বিরহ—সে কেমন, হ্যাঁ গা?—
না, পিরিত-সোনার সেই সোহাগা।

ভালো কথা মনে পড়ে গেল। সিমুরের খাম্বিরে ডাকসাইটে, সেই কবে তোর বিয়ের সময় খেয়েছিলাম, এখনও মুখে তার লেগে আছে, আনবি খানিকটা। ভুললে অনর্থ করব।····গিরি-মা, মনে করিয়ে দেবে, দেবে তো?····হ্যাঁ, ভোলো, আমার ক্ষতি নেই, মা'টি বেহাত

হবে।—আমার সেই—নাকের বদলে নরুণ পোলাম, ড্যাং—ড্যাঙা—ড্যাং—ড্যাং···হাঃ—হা—হা।”

গিরিবালা কাপড় ধরিয়া প্রচ্ছন্নভাবে টান দিতেছে, হারাণের তো তাড়া আছেই, দুইবার গলা-খাঁখারি দিল, তবুও একটু দেরি হইয়াই গেল।

হারাণের পাশে জুটিয়া গেল বাউরিদের রতন। গল্পের জন্য হারাণ উহারই মধ্যে গতি একটু মন্দীভূত করিয়া খানিকটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া লইল।

রতন ছেলেটা বেশ একটু অনুগত, হারাণের বক্তব্যগুলা নির্বিচারে শুনিয়া যায় এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাস করে। পেয়ারা খাইতেছিল, চলিতে চলিতে কোঁচড় থেকে গোটা তিন বাহির করিয়া সবচেয়ে ভালোটা হারাণের হাতে দিয়া বলিল—“স্যানেদের গাছের।···বামুন-ডাক্তার কোথায় যাচ্ছে গা হারাণদা?···তোমার ওষুধের বাক্সটা দেখছি না যে?”

হারাণ পেয়ারায় একটা কামড় দিয়া বলিল—“মিষ্টি আছে, পিরাণের পকেটে আর দুটো রেখে দে তো।···বাক্স আছে—ঝুড়ির মধ্যে; তুই দেড় হাতের মানুষ, দেখবি কন্থে?”

রতন খানিকটা চুপচাপ করিয়া চলিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—“বামুন-ডাক্তার যাচ্ছে কনে তাই জিগুচ্ছিনু।”

“জনাই। বাবুদের বাড়ি থেকে ডাক এয়েচে।”

ও-অঞ্চলের ছেলেদের কল্পনায় কলিকাতার পরেই জনাই এবং লাট সাহেবের পরেই জনাইয়ের বাবুরা। রতন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—“জনাইয়ের বাবুদের বাড়ি ডাক হয়েচে? উরে ব্বাবা!···বামুনডাক্তার কেও-কেটা নয় বলো হারাণদা!”

"কেও-কেটা হ'লে হারাণ পরামাণিক এমন কামড়ে পড়ে থাকত না। বাবুরা কলকাতার ডাক্তারও আন্নেছেলো ; অসুখের বহর দেখে ন্যাজ মুখে করে পাইলেচে। তখন ডাক্ বেলে-তেজপুরের রসিক বাঁড়ুজ্জেকে।"

"অসুখটা কি গা ?"

হারাণ পেয়ারার একটা বড় গ্রাস কাটিয়া লইয়া খানিকক্ষণ চিবাইতে চিবাইতে একটা লাট-বেলাটের উপযোগী সম্ভ্রমযোগ্য রোগের নাম মনে করিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর তাহার মনটা ঔষধের বাক্সর মধ্যে প্রবেশ করিল ; হারাণ বলিল—"নক্স্ ভোমিকা।"

কক্ষণও শোনে নাই এ নাম ; রতন স্তম্ভিত হইয়া বলিল—"ব্বাস্‌রে ! বাঁচবে ?"

"বাঁচবে না তো যাচ্ছি কেন আমরা ?"

রতন আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভয়ঙ্কর এই অজানা রোগের স্বরূপটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল—"কেবলই নাক দিয়ে বমি করচে বুঝি ?"

হারাণ একটু রাগিল, বলিল—"যা জানিস না বুঝিস না তাতে দখল দিতে যাসনে রতনা। বমি করে মরবি তোরা—বাউরি, দুলে, তাঁতিরা। জনাইয়ের বাবুদের অমন হেঁজিপেঁজি রোগ হয় না।....ডাক্তাররাও অমন হেঁজিপেঁজি রোগের জন্যে কম্পুণ্ডার সুদ্দু হাজরে দেয় না !"

এইবার বোধ হয় প্রশ্ন হবে বামুনদিদি যায় কেন। হারাণ অবশ্য উত্তর দিবেই, তবে একটু ভাবিতে হইবে। তা ভিন্ন বাবাঠাকুর অনেকটা আগাইয়া গেছে। হারাণ বাঁ হাতে ঝুড়িটা ধরিয়া ডান হাতে একমুঠা বড়ি আর একগোছা পাঁপর বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি রতনের কোঁচড়ে পুরিয়া দিয়া বলিল—"যা, ভেজে খাস্, বুঝবি কি রকম পথ্যি যাচ্ছে জনাইয়ের বাবুর রোগের জন্যে। খেতে বড়ি আর পাঁপড়ের চেয়ে যদি

একচুল এদিক-ওদিক হয় তো হারাণের নামে কুকুর পুষিস্ তখন। যা, পথ্যি তৈরির কেরামতিটা দেখগে পরখ করে।"

ওদিকে মায়ে-পোয়ে জোর গল্প চলিয়াছে, মুক্ত আকাশের নিচে গতির আনন্দে কল্পনাব কোন জড়তাই নাই। পাশে কাহাদের পুকুরে একরাশ রাঙা শালুক ফুটিয়াছে। একটু না দাঁড়াইয়া যেন পাবিল না—বাপ-মেয়ে উভয়েই। মেয়ে বলিল—হারাণে পেছিয়ে গেছে বাবা, আস্থক না।"

একটু আবদারের স্থরে বলিল—"দুটো তুলে নিয়ে আস্থক বাবা, হুঁ; নিয়ে যাব মামারবাড়ি।"

"তা নিয়ে আস্থক দু'টো।....তুই বড হলে আমি যে পদ্যগুলো লিখেছি তোকে শোনাব গিরি; আর দ'টো বচ্ছর বাদেই তুই বুঝতে পারবি, তাতে এই রাঙা শালুকের কথা লিখেছি। তুই যে মেয়ে, নইলে তোকেও শেখাতুম পদ্য লিখতে। হকুটাকে শেখাব।....আমার নিজের আর হ'ল না....নাঃ, আর উপায় দেখি না হবার, যা সংসারের দুশ্চিন্তে!"

হারাণ ঝুড়ি রাখিয়া একটু জলে নামিয়া একটা আঁকশি করিয়া ফুল তুলিতেছে। রসিকলাল একটু আত্মস্থভাবেই বলিলেন—"মেয়েছেলেতেও শেখে পদ্য লেখা, না শেখে যে এমন নয়। এই তো মানকুমারী লিখছে। তা তুই না লিখলি—তোর ছেলে নাতি-নাতকুড় কেউ না কেউ লিখবেই গিরি—বাপের গুণ কোথাও না কোথাও বর্তাবেই।....হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়ে গেল—রোজ শিবপূজো করিস তো, যেমন বলে দিয়েছিলাম?"

গিরিবালা একটু লজ্জিতভাবে রাগের সহিত বলিল—"হ্যাঁ, রোজ সময় পাই কিনা...."

"সময় করে নিতে হবে, আমি গিরিবালা নাম দিয়েছি এমনি নয়—আমার কথা ফলবেই ফলবে....করে নিতে হবে সময়।"

"কিগো রসিক যে, কোথায় ?"

রসিকলাল ফিরিয়াই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"পণ্ডিতমশাই !"

সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেন একটা নির্মল আনন্দের জোয়ার খেলিয়া গেল। রসিকলাল অভিভূতভাবে নবাগতের মুখের পানে চাহিয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর একবার বলিলেন—"পণ্ডিত-মশাই দেখি যে !"

তাহার পর যেন দেবতার চরণে নতি করিতেছেন এইভাবে মাথা প্রায় মাটি পর্যন্ত নামাইয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

খানিকক্ষণ পর্যন্ত আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার বা বলিবার অবসর পাওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠিল রসিকলালের। পণ্ডিতমশাই বলিয়া চলিলেন—

"আমি ঠিক দূর থেকে আন্দাজ করেছি—ভুল হ'তেই পারে না.... থাক্, থাক্, হ'য়েছে, দীর্ঘজীবী হও....ভুল হ'তেই পারে না। বয়েস হ'য়েছে, খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে ; কিন্তু মানুষটা তো আর বদলাবে না ?—সেই "শালপ্রাংশু মহাভুজ"—ইস্কুলে তোমায় দেখে বলতাম না ?—মনে আছে ?....শালগাছটা না হয় আর একটু বেড়েছে। বাঃ, বড় আনন্দ হ'ল তোমায় দেখে রসিক।...দূর থেকেই চিনেছিলাম—তারপর আবার যখন দেখলাম লোকটা দাঁড়িয়ে কহ্লার ফুল তোলাচ্ছে তখন আমার সংশয়মাত্র রইল না।....দুপুরের রোদে ডোবার ধারে

দাঁড়িয়ে কহ্লার ফুল তোলাবে এমন লোক বেলে-তেজপুরে একটি মাত্রই আছে।…

আরে চলো, দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাওয়া হচ্ছে কোথায়? তা যেখানেই যাও, পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়িতে খানিকটা না বসে পাদমপি নড়া চলবে না; এতদিন পরে তোমায় পেয়েছি।…অনেক কথা।… আমার কথা জিগ্যেস ক'র না। সেই এখান থেকে বর্ধমান স্কুলে গেলাম—তোমরা ঘটা ক'রে বিদায় দিলে; নাঃ, দুটি বচ্ছরও টেঁকতে পারলাম না।…বি-এ-তে সংস্কৃতে অনার্স ছিল, আর হেডমাষ্টারের চেয়ারে বসেছে, তাই সে মহাপণ্ডিত? বন্‌ল না—অর্বাচীনের ঔদ্ধত্য সোমেশ পণ্ডিত কখনও সহ্য করতে পারে নি, পারবেও না।…তারপর নবদ্বীপ; মাইনে বেশি নয়, তবে পণ্ডিতের সাহচর্য ছিল। কিন্তু ঐ স্কুলের চাকরি—ঐ হ'য়েছে কাল্ জীবনে, টেঁকতে পারি না,—কী নীরস, রুক্ষ পঠন-পাঠনের ধারা!—শুধু পাস করাও, নোট দাও, সংক্ষিপ্ত করো, খর্ব করো—এ যে কী যন্ত্রণা!…কি পাপ যে করেছিলাম এ লাইনে এসে! —তোমরা লাইনই বল না?—তা অবিকল লাইন, একটু এদিক ওদিক হ'বার যো নেই, তাহলেই সব ভূমিসাৎ!…যাক্, নবদ্বীপ ছেড়ে বছর খানেকের জন্যে এখানে এসে বসি। তুমি তখন ডাক্তারি পড়তে গেছ, দেখা হ'ল না। ঠিক করলাম আর বেরুব না, যজন-যাজনের দ্বারা যা হয় করে চালাব, আর, একটা টোল খুলে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে অধ্যাপনা করব শেষ জীবনটা। পারলাম না প্রতিজ্ঞা রাখতে; কেন, আন্দাজ করো ত?"

কাছেই বাড়ি, রাস্তার ধারে। গুরু-শিষ্যে আসিয়া বাহিরে দুইটি সিমেণ্ট-বাঁধান বেঞ্চে মুখোমুখি হইয়া অধিবেশন করিলেন। গিরিবালা পুষ্পসঞ্চয়ে পিছনেই রহিল।

পণ্ডিতমশাইয়ের মুখটি একটি অনাবিল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বসিয়া, কি যেন একটা মস্তবড় সম্পদ লাভ হইয়াছে এই ভাবের তৃপ্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আর একবার প্রশ্ন করিলেন—"কেন রাখতে পারলাম না প্রতিজ্ঞা, আন্দাজ করো দিকিন...."

তাহার পর সেটা অসম্ভব জানিয়া নিজেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। উজ্জ্বল মুখটা হঠাৎ যেন আরও চতুর্গুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—"উজ্জয়িনী টানলে। মেঘদূতের সেই অবন্তীপুর। মনে আছে তো?—

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধান্
পূর্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাং।
স্বল্পীভূতে সুচরিত ফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকং॥

তাহার পরেই কিন্তু তাঁহার মুখটা একটু একটু করিয়া দ্রুত নিষ্প্রভ হইয়া গেল। বলিলেন—"কিন্তু না গেলেই ভালো ছিল রসিক! এক বছর ছিলাম, শুধু পেটের দায়ে! না হ'লে যেদিন স্বপ্ন ভাঙল সেই দিনই চলে আসতাম, অর্থাৎ যাকে বলে ধুলো পায়েই।"

পণ্ডিতমশাই একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন, কল্পনার উজ্জয়িনী থেকে তাঁহার দৃষ্টি রূঢ়, বাস্তব উজ্জয়িনীতে আসিয়া যেন নিবদ্ধ হইয়া গেছে।

একটু পরে সমস্ত ব্যাপারটা মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই দেখো, নিজের কথাই পাঁচ-কাহন করছি। তারপর, তোমার খবর কি? আমি মোটে এই কাল এসেছি—আরও কয়েক জায়গায় ঘুরে ঘুরে বাইরে বাইরেই জীবনের প্রায় সমস্তটা কাটিয়ে।.... হ্যাঁ, ভালো কথা, কাব্যচর্চাটা রেখে গেছ নিশ্চয় রসিক?—মানে, পদ্য

লেখার অভ্যাসটা ত্যাগ করনি তো ?....বড় আনন্দ হ'ল যখন দেখলাম তুমি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কহ্লার পুষ্প সংগ্রহ করছ....বই কিছু প্রকাশিত করলে ?"

রসিকলাল বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার পণ্ডিতমশাইয়ের পানে চাহিলেন। এই একটি মাত্র মানুষের কাছে এক সময় উৎসাহ আর প্রেরণা পাইয়াছিলেন। নৈরাশ্যের কথাটা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিলেন না।

পণ্ডিতমশাই বুঝিলেন এবং আর একবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, মাঝে শুধু বলিলেন—"সংসার! সংসার!—তোমাকেও শেষ করলে ?"

খানিকটা গেল। তারপর পণ্ডিতমশাই আবার সমস্তটা মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিলেন—এবার একেবারে নিঃশেষভাবে। বলিলেন—"না, শোক ক'র না রসিক, আমি এসেছি, তুমি আছ, আবার সব ঠিক করে নিতে হবে। ভাবনা কিসের ?...তোমার সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল না ? দেখো, মনেই ছিল না।"

বাড়ির সামনে লতাপাতায় ঢাকা একটা উঁচু বেড়া ছিল ; সেইটার অন্তরাল হইতে গিরিবালা আর হারাণ সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল, একরাশ ফুল, কতকগুলা গিরিবালার হাতে ; কতকগুলা হারাণের ঝুড়িতে।

পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"এই যে, বাঃ, দিব্যি মেয়েটি! কার মেয়ে ?...তোমার ? বাঃ...দিব্যি ফুটফুটে নাতনি পাওয়া গেছে তো ? এসো তো দিদি।"

রসিকলাল কন্যাকে আদেশ করিলেন—"প্রণাম করো ঠাকুর-দাদাকে।"

গিরিবালা সঙ্কুচিতভাবে গিয়া পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। পণ্ডিত-

মশাই কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"রাজরাজেশ্বরী হও। কি নাম দিয়েছে বাবা ?"

গিরিবালা নাম বলিল।

"বাঃ, গিরিবালা দেবী? তবে আর তোমায় আশীর্বাদ করব কি? বাপ এক নামেই তো সব আশীবাদ জড়ো করে রেখেছে। বড় চমৎকার মেয়ে, বাঃ। তা হবে না? হবে বৈ কি! তোমার বাবার মতো একটা চেহারা দেখাক্ না গ্রামের মধ্যে কে পারে। আমার পোড়া কপাল দেখো না—গ্রামের মধ্যেই দেব কন্যার মতো আমার এই সঙ্গিনী করে দিয়েছে রসিক আব আমি অঙ্গাবসাব উজ্জয়িনীব জন্য চোখের জল ফেলে বেডাচ্ছি! কত বয়স হ'ল নাতনিব রসিক?"

প্রাণতুল্যা কন্যার এত ঢালা প্রশংসা শুনিবাব অদৃষ্ট হয় না বড একটা, রসিকলালের মনেব কবাট যেন ধীরে খুলিয়া যাইতেছিল, স্নেহেব দুর্বলতায় যত সব অসম্ভব সংকল্প মনে জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন, মর্মগ্রাহী গুরুর সামনে একে একে প্রকাশ করিতে লাগিলেন—

"বয়স....এই আটে পডবে। মনে করছি পণ্ডিতমশাই, গৌরীদান করব, কিন্তু..."

পণ্ডিতমশাই একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আবার 'কিন্তু' কি এর মধ্যে? গৌরীদানের মেয়েই তো... দেখাশুনা লাগিয়েছ? আমিও ঘটকালিতে নামব এবার, দাড়ি-টাডি রেখে নারদের মত চেহারাও করে রেখেছি, দেখনা।"

দীর্ঘ শ্মশ্রুতে একবার হাত বুলাইয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

গিরিবালা কোলের মধ্যে গুটাইয়া যাইতেছিল। রসিকলাল বলিলেন—"তাহলে আরও বলি পণ্ডিতমশাই। অন্য কাউকে বলিনি—

বললে ভাববে পাগল ; ওর নামটা আমি স্বপ্নে পেয়েছিলাম, আর ও জন্মেও ছিল বাবা তারকেশ্বরের দোর ধ'রে···মানে····"

উচ্চাশা যে কতদূর তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলেন না। পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"বুঝেছি, দাও তো দিদি বাঁ হাতটা একবার····ও আমি মুখের লক্ষণ দেখেই ধরেছি, তবুও একবার দেখি রেখাগুলো মিলিয়ে····"

বাঁ হাতটা তুলিযা লইয়া পণ্ডিতমশাই করাঙ্ক-বিচার করিতে লাগিলেন। ক্রমেই তাঁহার মুখে একটা বিস্ময আব আনন্দেব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। হাতটা ঘুবাইয়া ফিরাইয়া অতৃপ্ত আগ্রহেই অনেকক্ষণ দেখিলেন, তাহার পর ধীবে ধীরে রাখিযা দিয়া আবিষ্টভাবে স্মিতহাস্যের সহিত রসিকলালেব মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। রসিকলাল উদ্বেগটা চাপিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেমন দেখলেন পণ্ডিতমশাই ?"

পণ্ডিতমশাই উত্তর না দিয়া ভিতরের পানে চাহিয়া ডাকিলেন—"কৈ গো, কেমন নাতনি এসেছে, ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটু আলাপ-পরিচয় করো।···দেখেছেন নিশ্চয় আড়াল থেকে, নাতনির রূপ দেখে হিংসেয় আব পা বাড়াতে পাচ্ছেন না বোধ হয়।·· হাঃ—হা—হা···"

একজন নথ, শাখা আর চওড়া রাঙা পাড়ের শাড়ি-পরা বর্ষীয়সী বাহির হইয়া আসিলেন। পণ্ডিতমশাই গিরিবালার মাথায় হাতটা একবার বুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কার মেয়ে বলো দিকিন ?"

রসিক অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইয়া বলিলেন—"আমি রসিক, মা ; চিনতে পারছেন না বোধ হয় ?"

বর্ষীয়সী রসিকের চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলী চারিটি জিহ্বায় ঠেকাইলেন ; বলিলেন—"ওমা, অমন কথা বল'না ; চিন্‌তে পারব না

কি ! ভীমরতি হয়েছে নাকি ?...তোমার মেয়ে ? চমৎকারটি 'হয়েছে তো !—বাপমুখী মেয়ে, পয় ভাল। এসো তো দিদি, ভেতরে চলো, রোদে তেতে মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছে।....আর কি ছেলেপুলে রসিকের ? কাল মোটে এলাম, এখনও খোঁজখবর নেওয়া হয়নি কাউরি।”

রসিকলাল লজ্জিতভাবে বলিলেন—“ওর দু'টি ভাই আছে, দু'টিই ওর নিচে। একবার যাবেন মা আমাদের ওখানে।”

“মেয়েই তাহলে পেরথোম ?—ভালো ; পেরথোম মেয়ে আবার বাপের ভাগ্যি নিয়ে আসে, আশীর্ব্বাদ করি সব বেঁচে-বর্তে থাক।...ওমা ; যাব বৈকি, যাব না ? আগে যাব,—গেরস্থালীটা একটু গুছিয়ে নিয়েই। ...যেখানেই থাকুন, হেন দিন যায়নি যেদিন একবার না একবার রসিকের নাম না করেছেন। যাব বৈকি।”

স্ত্রী গিরিবালাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলে পণ্ডিতমশাই আবার স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে রসিকলালের মুখের দিকে চাহিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—“দিদিকে আমার সরিয়ে দিলাম রসিক, লজ্জিতা হয়ে পড়েছিল, তা ভিন্ন—তা ভিন্ন....”

দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা কাটাইয়া বলিলেন—“তা ভিন্ন, দেব-অংশে জন্ম এ-মেয়ের, নিজের কথা যত কম শোনে ততই ভালো, জাতিস্মর হয়ে উঠলে—মানে নিজেকে চিনে ফেললে আর এরা থাকতে চায় না সংসারে।...বড় সুলক্ষণা মেয়ে রসিক ; পিতৃকুল, শ্বশুরকুল দুই কুলকেই ধন্য করবে এ-মেয়ে।”

পণ্ডিতমশাই তারপর ধীর-সঞ্চারে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—“কিন্তু কাছে রাখতে পারবে না...না। এর বিবাহ বহুদূরে হিম-চক্রের মধ্যে—হিম-চক্রটা হল হিমালয়ের পঞ্চাশৎ ক্রোশ পর্যন্ত স্থানটা।.. হুট্ করতেই যে ওপাড়ায় গিয়ে মেয়েকে দেখে আসবে সেটি

হবার জো নেই। উঁহু...আর একটা কথা, তবে সেটা তেমন বিশেষ কিছু নয়...”

শেষের কথাটুকু পণ্ডিতমশাই যেন একটু চিন্তিত ভাবেই বলিলেন। রসিকলাল উৎসুককণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—“কি পণ্ডিতমশাই ?”

পণ্ডিতমশাই তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন—“নাঃ, সে কিছু নয়, মানে, বিয়েতে একটু সঙ্কট আছে, তা সে সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাবে! মেয়ে থাকলেই পাঁচটা ভালোমন্দ সম্বন্ধ আসে, সাবিত্রীরও পাঁচ জায়গায় সম্বন্ধ খুঁজতে হয়েছিল! যদি হয়ই একটু গোলমাল তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই। বিবাহ আমার দিদির যথাস্থানেই ঠিক হয়ে আছে, খুঁজে নিয়ে যাবে।”

রসিকলালের স্বপ্ন যেন পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। কী যে বলিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। চোখ দুইটি ভাবাবেগে ছলছল করিয়া উঠিয়াছে ; মুখখানায় কিসের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। একটু আবিষ্টভাবে থাকিয়া অবশেষে বলিলেন—“যেখানে থাকে ভালো থাক্ পণ্ডিতমশাই। ওর যার অংশে জন্ম সে বাপমাকে খুবই কাঁদিয়েছিল—শ্বশুরঘর যাওয়ার পর থেকে,—তার জন্যে আমাদের দুঃখ নেই কোন। আর কারুর কাছে বলি না ওর কথা, ভাববে পাগল। ওকে শুধু বলি নিত্য শিবপূজোটা করে যাস্।—তারই কি সময় পায় ঠিকমত ? যা ঘরে এসে জন্ম নিয়েছে !”

বহুদিন—বহুদিন পরে একটি মনের পরশ পাইয়াছেন যে তাঁহাকে চেনে, বোঝে, তাঁহার গূঢ়তম বিশ্বাসকে বাতুলতা বলিয়া বিদ্রূপ করে না, এমন একটি মন যাহাতে নিজের স্বরূপটিকে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখা যায়।....রসিকলালের অশ্রু উদ্গত হইয়া গড়াইয়া পড়িল, একটু লজ্জিতভাবেই কোঁচার খুঁটে মুছিয়া লইলেন।

বিষয়ান্তর আনিয়া ফেলিবার জন্যই পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"তা আসল কথাই তো জিজ্ঞাসা করা হ'ল না,—চলেছ কোথায়? সঙ্গে বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে লোকও চলেছে দেখছি...."

রসিকলাল বলিলেন—"যেতে হবে একবার সিমুরে।"

"অর্থাৎ?"

"ইয়ে—গিরির মামারবাড়ি।"

"ঠিকই তো, মনে ছিল না। সিমুরেই তো তোমাব বিবাহ হয়। ফিরছ কবে?....অনেকদিন পবে দেশে ফিরলাম, অনেক কথা বাকি। শীগ্‌গির আসবে। শাশুড়ির মোহে যেন আটকে যেওনা বাপু।"

ঘরোয়া বসিকতাটুকু করিয়া পণ্ডিতমশাই হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তা করব বৈকি ঠাট্টা, আমার তো আব পুত্রসন্তান নেই, পুত্র বলো, শিষ্য বলো—সব তোমরাই।"

রসিকলাল লজ্জিতভাবে মাথাটা নিচু করিয়া ছিলেন, তুলিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, আপনাকে পেয়ে আমার তো মন সরছে না যেতে আর, নেহাৎ মেয়েটাকে দেখতে চেয়েছেন সবাই সেখানে...."

পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"এ কথা আমি বিশ্বাস করি বসিক, আমি এসে পড়েছি, আর যে তুমি কোথাও যেতে চাইবে না—এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—"

একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"তা'হলে কিন্তু তোমায় উঠতে হয়। অনেকটা পথ তো? আমিও খানিকটা দেবি করিয়ে দিলাম।....ওগো, নিয়ে এসো নাতনিকে, তুমি যে ঘরের-লোক করিয়ে দিলে!—ওকে অনেক দূর যেতে হবে।"

স্ত্রী গিরিবালাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন, হাতে একটি রেকাবিতে গুটি কয়েক মুকুন্দ-মোয়া আর এক গ্লাস জল। বলিলেন—"তা সত্যি

ঘরের-লোক ক'রে রাখতেই ইচ্ছা করে। কী চমৎকারটি বাপু! কী গিন্নিবান্নির মতো কথার ছাঁদ এতটুকু মেয়ের, আর কী নরম স্বভাব!"

রসিকলাল বলিলেন—"এই মাত্র খেয়ে বেরিয়েছি মা, তা ভিন্ন অনেকটা পথ যেতে হবে, সময় অল্প...."

গুরুপত্নী অনুযোগের স্বরে বলিলেন—"ওমা, তা কি হয়! হোক্ অনেক দূর। বুঝলাম শ্বশুরবাড়ির আদর-যত্ন, আমার গরীবের এই দু'টি মোয়ার মর্যেদা কিন্তু ঢের বেশি বাবা।....কি গো, তুমি কথা কইছ না কেন?"

শেষের কথাগুলি পণ্ডিতমশাইকে উদ্দেশ করিয়া। পণ্ডিতমশাই প্রসন্ন গাম্ভীর্যে দাড়ির উপর হাতের একটা দীর্ঘ টান দিয়া বলিলেন—"তা কি ও-ই অস্বীকার করতে পারে? পারে কি কখনও?....নাও হে রসিক, চলবে না ওজর।"

গিরিবালাকে আবার কাছে ডাকিয়া লইলেন। বুকের কাছটিতে দাঁড় করাইয়া কী যেন এক পবিত্র অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া গেছেন! মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"শিব পূজো করিস তো নিত্য?...না, ছুতোনাতা শোনা হবে না। ইস্, বিনি তপস্যাতেই ইনি কেল্লা ফতে করবেন ভেবেছেন! স্বয়ং উমাই বড় রেহাই পেয়েছিলেন! শোন্ তবে—

স্বয়ংবিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা
পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া-পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ॥

মানে শুনবি?—

পর্ণ কিনা পাতা শুকিয়ে নিজে গাছ থেকে পড়বে, তাই খেয়ে থাকতে

পারলে তবে সেই হ'ল তপস্যা ; উমা তাও খাওয়া ছেড়ে দিয়ে অপর্ণা নাম নিলেন,—তবে গিয়ে মহাদেবকে…”

স্ত্রী ভিতর থেকে রসিকের জন্য পান সাজিয়া আনিলেন, হাতে আরও দুইটি মোয়া ;—হারাণকে ডাকিয়া দিয়া স্বামীকে বলিলেন—“করুক তপিস্যে, মানা করিনে, কিন্তু যার জন্যে তপিস্যে তাকেও ওদিকে তপিস্যে করতে হবে না ? ইস্‌, ওমনি !”

উঠিবার সময় রসিকলাল একগোছা শালুক পাশটিতে রাখিয়া দিয়া বলিলেন—“আমার প্রণামি, পণ্ডিতমশাই।”

প্রণাম করিয়া কন্যার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। খানিকটা যখন গেছেন, পণ্ডিতমশাই রাস্তায় নামিয়া আসিয়া একটু হাঁকিয়া বলিলেন—“বাপ, মা, আর গুরুতে পেছনে ডাকলে দোষ হয় না।—বলছিলাম—শীগ্‌গির আসবে ফিরে রসিক, কালিদাসের গ্রন্থগুলো একবার দু'জনে ভালো করে পড়তে হবে।”

রসিকলাল একটু হাসিয়া কহিলেন—“বললাম তো পণ্ডিতমশাই, আমার পা উঠছে না যেতে।”

কী যে একটি আনন্দস্রোত বহিতেছে মনে,—রসিকলালের সবই যেন লঘু, অকিঞ্চিৎকর মনে হইতেছে। নিজেকে, গিরিবালাকে যেন নূতন করিয়া পাওয়া গেল আজ, যেন গুরুগৃহে নূতন এক জীবনের অভিষেকের পর তীর্থযাত্রা আরম্ভ হইল! শ্বশুরবাড়ির কথা লুপ্ত হইয়া গেছে, শুধু চলার আনন্দে, পাওয়ার আনন্দে, দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মনটা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তৃপ্তি-অতৃপ্তিতে মেশান কী একটা অনুভূতি—স্কুলের সেই হারানো দিনগুলির টুকরাটাকরা কোথা হইতে যেন ভাসিয়া আসিয়াছে…. গিরি—গিরি—আমার গিরি—নামটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়া সমস্ত মনটিতে একটা অপূর্ব মধুর রসে যেন মাখাইয়া লইতেছেন। কবির

মনই, কিন্তু আজ হঠাৎ আকাশ, বাতাস, চারিদিকের গাছগাছড়া, পূর্বাপর সব কিছু কি করিয়া শতগুণ সুন্দর হইয়া গেছে।....মনে একটি মাত্র ধ্বনি উঠিতেছে—'আমার গিরি—আমার গিরি—গিরিবালা—পার্বতী—উমা'।

গিরিবালা বলিল—"শীগগির চলো বাবা, রাত করে ফেলবে। এরা কারা বাবা ?"

"ঐ দেখলি তো গিরি? উনিও তোকে শিবপূজো করতে বললেন।....কি জিগ্যেস করছিলি? ও! উনি পণ্ডিতমশাই, আমাদের স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন। অমন মানুষ হয় না।....শিবপূজো করবি গিরি; বুঝলি ?"

গিরিবালা গুরু-শিষ্যের কাছে এই আধঘণ্টার মধ্যে এই লইয়া এত তাগাদা খাইয়াছে যে আর ধৈর্য রাখিতে পারিল না, মুখঝামটায় নোলকটা একটু জোরে দুলাইয়া বলিল—"খালি শিবপূজো, খালি শিবপূজো!....বলছি তো করব। খোকাকে নিয়ে আর ছিষ্টির পাট করে সময় হ'লে তো ?"

ভাবের ঘোরে ধমকটা খাইয়া রসিকলাল একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"নারে পাগলি, বুঝিস্ না। দু'টো ধুতরো আর বিল্বপত্র দিয়ে ও বুড়োর কাছে কী-ই বা আদায় না করা যায় ?"

বাগ্দিপাড়া আসিয়া গেল। দুলাল বাগ্দি রোদে পিঠ দিয়া পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল, জুতার শব্দে ফিরিয়া চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"পেন্নাম হই বাবাঠাকুর; কদ্দূর যাওয়া হচ্ছেন ?"

একটু দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। কাল এই দুলালই স্ত্রীকে প্রহার দিতেছিল, রসিকলাল দুইটা চাপড় দিয়া নিরস্ত করিবার সময় টের

পাইয়াছিলেন যে এর অসুখ। কহিলেন—"যাচ্ছি সিমুর; আছিস কেমন হুলু? কাল যেন বললি জ্বর আছে?"

"জ্বরের ওপর ঠেঙানি দিলে কি জ্বর ছেড়ে যায়? ভূত নয় তো বাবাঠাকুর।"—কথাটা বলিয়াই আবার হাসিয়া বলিল—"না, আজ আছি ভালোই। থাক্‌ব কিনা, পালা জ্বর, দু'দিন বাদ দিয়ে দিয়ে এসে।"

"পালা জ্বর? তা গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসিস'খন। সিমুর থেকে ফিরি। কি খাচ্ছিস?"

"ডোবার জল আর হাওয়া। একলার পেট চলে না বাবাঠাকুর, তার ওপর বিধেতাপুরুষ বছর বছর একটি করে ভাগিদার পাঠাচ্ছে। আজ দিন-দশ থেকে আমার এই দশা। ঘোষালদের ওপরে দু'টো ঘর হচ্ছে—মাগি গতর খাটিয়ে গণ্ডা দু'এক ক'রে পাচ্ছেল—মুড়িটা-আসটা কিনে কোন গতিকে চলে যাচ্ছেল। পরশু থেকে কোলের মেয়েটার কি হয়েছে; ও-ও আর বেরুতে পারে না।....কাল তুমি বিধেতাপুরুষ হয়ে চিঁড়ে ক'টা দিয়েছিলে—তাও ক'দণ্ড বাড়িতে রইল?—নক্ষীর মা নারাণীর কাছে কর্জ নিয়েছেল, সে খবর পেয়ে আদ্দেকটা নিয়ে গেল। আজ আর... তোমার তো সেই বড়নদী পেইরে?—তা যাও, শুনে কি ফুরুতে পারবে?"

একটি আট-নয় বছরের চিরকুট-পরা মেয়ে ওদিক-কোথায় থেকে আসিয়া একটু তফাতে দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া ভিতরে গিয়া বলিল—"মা, বামুন-ডাক্তার এয়েছে—খুকিকে দেখাবি বললি না ত্যাখন?"

একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের বৌ ছেঁড়া কাঁথায় আর ন্যাকড়ায় জড়ানো বছরখানেকের একটি শিশুকে বুকে করিয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইল, একটু যেন কি ভাবিল, তাহার পর হঠাৎ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দ্রুতপদেই নামিয়া আসিল, এবং রসিকলাল ব্যাপারটা ঠাহর

করিবার পূর্বেই শিশুটিকে একেবারে তাঁহার পায়ের কাছে নামাইয়া চাপা গলায় কাঁদিয়া উঠিল—"এই রইল ছিচরণে গো বাবাঠাকুর ; ও বাঁচবে নি—আজ তিন দিন মুখে রা নেই—কেন যে এসে সব দগ্ধাতে !...."

হঠাৎ যেন একটা কি হইয়া গেল। গিরিবালা একবার শিশুটির, একবার তাহার মায়ের, একবার রসিকলালের মুখের পানে চাহিয়া ভ্যাবাচাকা খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রসিকলালের অবস্থা ততোধিক খারাপ। একবার কি বলিবার চেষ্টা করিয়া নির্বাক হইয়া বিপর্যস্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় দুলাল হঠাৎ উঠিয়া মারমুখো হইয়া বধূর পানে আগাইয়া আসিল। শিশুটির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিল—"তোল্ শাগগির ; তোল্, নৈলে দোব তোর মেয়ের ওপর একটা লাথি বসিয়ে, একেবারে মরা মেয়ে তুলতে হবে।....পাড়া দিয়ে যাত্রা ক'রে কারুর ভালোমন্দ জায়গায় যাবার জো নেই, অমুঙ্গুলের দল পথ এগলে দাঁড়াবে ! শুনবি নি কথা হারামজাদি ? তুলবি নি ?...."

ঘুসি তুলিয়া অগ্রসর হইতে রসিকলালের যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"থাম্ বলছি দুলো, নইলে কাল আর তোর কী হয়েছে ?—আজ আস্ত রাখব না।"

দুলুর স্ত্রীকে বলিলেন—"তোল্ মেয়েটাকে।"

তুলিলে, একবার একটু কুণ্ঠার সহিত ক্ষণমাত্র কন্যার পানে চাহিয়া শিশুটিকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিলেন, হোমিওপ্যাথি প্রথায় প্রসূতিকে একরাশ প্রশ্ন করিলেন, তাহার পর বলিলেন—"একটু কাগজ আর দোয়াতকলম চাই তো ?"

পাইবার কোনও আশা নাই জানিয়া নিজের পকেটগুলায় একবার হাত দিলেন, একটা ছোট পেন্সিল পাওয়া গেল। দুলালের মেয়েটি একটু তৎপর ; দরজার কাছে তাহার আরও তিনটি ছেলেমেয়ে দাঁড়াইয়া

ছিল, তাহাদের সরাইয়া ভিতর থেকে বোধ হয় সাগু কি ঐরকম একটা কিছুর মোড়ক খুলিয়া খানিকটা কাগজ সংগ্রহ করিল, হাতের তেলোয় তাহার কুঞ্চন যথাসাধ্য মিলাইয়া দিয়া রসিকলালের হাতে তুলিয়া দিল। রসিকলাল একটি ঔষধের নাম লিখিয়া দিয়া দুলালের পরিবারকে বলিলেন—“আমার বাড়ি থেকে ওষুধ নিয়ে আসবি।....শোন্, আর কারুর হাতে দিস্‌নি, বড়বৌয়ের হাতে দিবি। তুই নিজে যাস্। চল গিরি, গাড়োয়ানটা উদিকে হা-পিত্তেশ করে দাঁড়িয়ে আছে।”

বেশ খানিকটা দূরে একটা অশ্বত্থ গাছের শানবাঁধান চাতালে হারাণ পেতে নামাইয়া বসিয়াছিল। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ঘিরিয়া বসিয়াছে, সে হাতমুখ নাড়িয়া কি সব মন্তব্য করিতেছে। রসিকলাল বলিলেন—“তুই খুব বসে বসে মাতব্বরি কর হারাণে, চার কোশ পথ ভেঙে যেতে হবে সেটা হুঁস আছে?”

দুই পা অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দুলালের স্ত্রীকে বলিলেন—“একটু দুধ দিতে হবে মেয়েটাকে।”

দুলালের স্ত্রী একটু স্থির হইয়া রহিল।

“শুনলি? একটু দুধ চাই, ওষুধ তো আর খোরাকের কাজ করবে না? দুধ একটু দিতে হবে!”

দুলালের স্ত্রী এবার মাথা নাড়িল।

মেয়েটা দাঁড়াইয়া ছিল। রসিকলাল বলিলেন—“ডাক্ তো দোলুকে, সে-হারামজাদা বুঝি ঘরে গিয়ে সেঁদুল?”

দুলাল আসিলে বলিলেন—“বউকে সামনে এগিয়ে দিয়ে তুই যে ঘরে গিয়ে বসলি? খালি বুঝি ঠেঙাবার গোঁসাই? ওকে তো দুধ এনে দিতে বললেও মাথা নাড়ছে, যদি বলি বেদানা আঙুর এনে দিতে হবে, তাতেও মাথা নাড়বে। পাবে কোথায় একবার ভেবে দেখেছিস?”

ছুলাল বিরক্তভাবেই বলিল—"আমার কিছু ভেবে দেখবার খ্যামতা নেই বাবাঠাকুর, ওরা সব বাঁচবার জন্য এসে নি, মিচে বামুনের যাত্রা নষ্ট ক'রে শাপ-মণ্যি কুড়ুনো....ছুধ এনে খাওয়াবে !"

রসিকলাল একটু দ্বিধাভরে কি ভাবিলেন, তাহার পর পকেট থেকে ব্যাগ বাহির করিয়া একটা আধুলি লইয়া ছুলালের গায়ে ফেলিয়া দিলেন।—বলিলেন অনেক ফি জমছে আমার, সঙ্গে এটাও দিয়ে দিবি, ফাঁকি দিস নি যেন, তোরা সব পারিস।"

যাইতে যাইতে গিরিবালা বলিল—"বাবা যেন কা !"

যাত্রাপথে বাগ্দি ছোঁওয়ার জন্য আর আট-আনিটার জন্য রসিকলাল শঙ্কিতই ছিলেন মেয়ের কাছে, বলিলেন—"ওকে ছুলুম ?—সে আমি ঠিক করে রেখেছি,—রাস্তায় নবীনের বাড়ি পড়বে, একটু গঙ্গাজল চেয়ে নিয়ে মাথায়...."

"সে নিও, সে কথা হচ্ছে না। ও গরীব, কোথা থেকে ফিরুবে আট-আনিটা ?—আবার ফি ও দেবে !"

রসিকলাল হঠাৎ রাগিয়া উঠিলেন, যেন ছুলাল সামনেই আছে এই ভাবেই বলিলেন—"দিতে হবে ওকে, ফি আমি এক পয়সাও ছাড়ব না, যেমন করে পারি আদায় করব। ফি হল ডাক্তারের লক্ষ্মী, বাঃ! গরীব তো নিজের ঘরেই গরীব আছে... বাঃ !"

চুপচাপ চলিয়াছেন ছুইজনে। আর একটু গিয়া গিরিবালা বলিল—"বাবা !"

এবার স্বরটা একটু দ্রব। রসিকলাল প্রশ্ন করিলেন—"কি গা, কি বলবি ?"

"কিছু নেই ওদের খাবার, আহা। বলছিলাম—মুড়কিগুলো দিয়ে আসুক না গিয়ে হারাণে। বাড়িতে না বললেই হবে।"

মেয়ের নিকট হইতে ভয় করিবার কিছু নাই তাহা হইলে;—রসিকলালের বুক হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। তবু কতকটা অভিভাবকের কণ্ঠেই বলিলেন—"হ্যাঁ, ওদের খাঁই মেটানো চাড্ডিখানি কথা!....তবে তুই যখন বলছিস, দিয়ে আসুক না হয়। ভারী তো নতুন গুড়ের মুড়কি!—মস্তবড় বয়ে নিয়ে যাওয়ার জিনিস কুটুমবাড়ি!"

পরিপূর্ণ আনন্দে নির্বাক হইয়া চলিয়াছেন।....কৈলাস-দুহিতা উমা-পার্বতী যে!—কেমন করিয়া সহ্য করিবে সে এই অসহ দুঃখ? পারে কখন?

আরও খানিকটা গিয়া গিরিবালা ডাকিল—"বাবা!"

স্বর আরও করুণ, তবে যেন একটু দ্বিধাজড়িত। রসিকলাল স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কি গা গিরি?"

"নাঃ, এমনি ডাকছিলাম।"

আর একটু পরে,—

"বাবা!....আচ্ছা বাবা, মায়ের বেশি কষ্ট, না বাপের?"

অদ্ভুত প্রশ্ন মেয়ের। রসিকলাল হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"শোন' গিরির কথা! তুই-ই বল না—তোর গর্ভধারিণী বেশি ভালোবাসে তোকে, না, তোর বাবা? যে বেশি ভালোবাসে তারই তো লাগে বেশি।"

৬

ওপারে গিয়া দেখা গেল গাড়ি নাই। গিরীশ হাজরার গাড়ি ঠিক হইয়াছিল, এত দেরি দেখিয়া সে ভাবিল—এরা আজ আসিল না।

খুব চটিলে হারাণের মুখে আড় থাকে না, বলিল—"এ আমার জানাই ছেল; সেই তিন পহর রাত্তিরে সেখানে উঠতে গিয়ে চোর-তাড়ানি না খেতে হয় সবাইকে তো....ত্যাখন তুলুবাগ্দি ঠ্যাকাবে'খন—তার ঐ গোরা-পল্টন তুলে নিয়ে এসে!"

কার্তিকের দিন—বাড়ি পৌঁছাতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। গিরিবালার মামি আঁচলের আড়াল দিয়া তুলসী-মঞ্চে প্রদীপ দিতে যাইতেছিলেন, একেবারে উঠানের মধ্যে নূতন লোক দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গেই চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওমা, কী ভাগ্যি! ঠাকুরজামাই যে! সঙ্গে কে—গিরি না?...এসো ভাই, একটু বোস, তুলসীতলায় পিদ্দিমটা দিয়ে দিই।....ও মেজঠাকুরঝি! দেখ'সে কে এসেছে।"

প্রদীপটি মঞ্চে রাখিয়া তাডাতাড়ি একটা প্রণাম করিয়া সামনে আসিলেন। গিরিবালাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, তাহার মুখটি একটু সরাইয়া ধরিয়া বলিলেন—"ওমা, কী চমৎকারটি হ'য়েছে গো গিরিটা! কি লো, মামিকে পারিস্ চিনতে?"

"কে লা বৌ?"—বলিয়া রসিকলালের মেজ শ্যালী কাত্যায়নী ঘরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। আবছা আলোয় রসিকলালকে চিনিয়া বলিলেন—"বাঁড়ুজ্জে!—তাইতো বলি, বৌ কাকে পেয়ে এমন হঠাৎ উৎলে উঠল!....তা উঠে এসো, উঠোনে দাঁড়িয়ে কেন?"

বলিতে বলিতেই নিজেও নামিয়া আসিয়াছেন। রসিক প্রণাম করিলেন, মেয়েকেও কহিলেন—"নেমে মেজমাসিমাকে আর মামিমাকে প্রণাম কর। মামির কোল দখল করে রইল বোকা মেয়ে!"

গিরিবালা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলই, লজ্জিতভাবে নামিবার জন্য অঙ্গ মোড়া দিল। মাসি তাহাকে চুম্বন করিয়া ননদকে বলিল—"আমি

যার জন্যে উৎলে উঠেছি তাকে এই দেখো। কী চমৎকার হয়ে উঠেছে দিদি, গিরি এই ক'টা দিনে।"

"ও তো হবেই সুন্দর, মায়ের চোখ মুখ, বাপের রং পেয়েছে, সুন্দর তো হবেই। আর এসেছিল সে কি 'কটা' দিন হোল?—নেত্যর সাধের সময়; সে প্রায় বছর ঘুরতে চলল। কতদিন বলেছি বাঁড়ুজ্জেকে নিয়ে এসো ওদের একবার; তা অ্যাদ্দিনে বার হোল। দেখতে সাধ হয় না? তা নিয়েও এলেন তো একটিকে বাদ দিয়ে এলেন।"

কোট আলোয়ান নামাইতে নামাইতে রসিকলাল বলিলেন—"তোমারই জিনিস, দিদি, নিয়ে আসব তাতে আর হয়েছে কি? সে কথা নয়।—সেবার বাড়ি ফিরে গিয়ে গিরি পা ফুলে, জ্বর হয়ে তিন দিন বিছানায় পড়ে রইল। হরুটাকে ঐজন্যেই নিয়ে আসতে সাহস করলাম না।....বাপের রং পেয়েছে তো কি বাহাদুরি হয়েছে? চলাটা পাক্ দিকিন,—ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত হেঁটে পা ফোলানো কাকে বলে জানিনে ..."

শ্যালিকা হাসিয়া বলিলেন—"তা কি হয়?—তুমি যদি এখন লঙ্কা ডিঙোও, ওদের তাই পারতে হবে?"

তিনজনেই একটু হাসিয়া উঠিলেন।

গিরিবালাকে কাছে টানিয়া লইয়া, দুই হাতের তেলোয় তাহার মুখটা তুলিয়া ধরিয়া কাত্যায়নী প্রশ্ন করিলেন—"মা, জেঠাইমা, জেঠামশাই, সাতু, হরু, পুতী, খোকা—সবাই কেমন আছে লো? বাপ কাল গুমোর করে গেল—বড় গিন্নি হয়েছিস—কৈ, চুপ করে রইলি যে?—বল সব খুঁটিয়ে, শুনি—তবে তো গিন্নি।....জেঠাইমা কি পাঠালে আমাদের জন্যে?"

গিরিবালা জড়িমার মধ্যে বলিয়া ফেলিল—"মুড়কি...."

তাহার পর মনে পড়িয়া যাওয়ায় একেবারে চুপ করিয়া গেল।

রসিকলালের জুতার ফিতায় একটা গ্রন্থি পড়িয়া গিয়াছিল, অনেকটা ঠিক করিয়া আনিয়াছিলেন, হঠাৎ আরও জটিল হইয়া গেল।

বাহিরের দাওয়ায় একটা খুট্‌খাট শব্দ হইতেছিল—হারাণের তবলা—সেটাও হঠাৎ থামিয়া গেল।

কাত্যায়নী বলিলেন—"শুধু মুড়কি? কাল বাঁড়ুজ্জেকে যে চালতার কথা বলে দিয়েছিলাম।....তা' কৈ, মুড়কিই দেখি।....বৌ নিশ্চয় বলছে—সেজদিদির নোলা দেখো।—তা, বরদার ঘরের জিনিসে আমার একটু লোভ আছে বাপু,—ওর মিষ্টি হাতটি যেন মাখানো থাকে।....কৈরে?—তোমার সেই বাজনদার নফরটি বুঝি?"

হারাণ পেতেটা লইয়া ভিতরে প্রবেশ কবিল।....রসিকলালের গ্রন্থি আরও উৎকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"ওমা, করেছে কি কাণ্ড!—লাউ—আব এই যে আমার চালতা,—বাঁড়ুজ্জে কি এত নেমকহারামি করতে পারে?....করমচা—পাঁপর—কত রকম বড়ি।....নতুন পোয়াতি—এইসব করেছে রোদে পিঠ পুড়িয়ে? মুকুন্দমোয়া—তা ভালো করেছে—অখিল বড্ড ভালোবাসে বেলেতেজ-পুরের মুকুন্দমোয়া।"

ঝুড়িটা সরাইয়া দিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—"বলি, হ্যাঁ—মুড়কি কোথায়? গিরি মুড়কির কথা বললি যেন—বাবা পথে খেতে খেতে এসেছে নাকি?"

রসিকলালের মুখের পানে চাহিলেন, দেখা গেল না, দৃষ্টি তখন গ্রন্থি-নিবদ্ধ। হারাণ নাপিতের সন্তান, ধূর্ত, পেতেটা রাখিয়াই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। কাত্যায়নী হাসিয়া বলিলেন—"বলি, ও বাঁড়ুজ্জে, মেয়ে যে বললে...."

গিরিবালা হঠাৎ ঘুরিয়া দুইবার ফোঁপাইয়া কাত্যায়নীর কোলেই মুখ

ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাত্যায়নী আর তাহার ভাজ, দু'জনেই অপ্রতিভ হইয়া কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, বিশেষ করিয়া কাত্যায়নী,—তিনি আত্মীয়তা আর আনন্দের আতিশয্যে কুণ্ঠার গণ্ডিটা পর্যন্ত ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন—বোনের ওখানে সওগাত সম্বন্ধে নারীসুলভ কৌতূহলটিকে ভগ্নীপতির সামনেই মুক্তি দিয়া।....একবার ভাজের মুখের পানে চাহিলেন—নিজের অপ্রতিভ মুখেরই যেন প্রতিবিম্ব, তাহারপর উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়া গিরিবালাকে বুকে চাপিয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন—

"কি হোল রে?—কাঁদিস কেন গিরি? চাকরটা ফেলেটেলে দিয়েছে?....বরুই দিতে ভুলে গেছে শেষ পর্যন্ত?—তাই হবে, এর জন্যে কান্না কেন?... দেখোতো।....তোর বাপ কি সত্যিই খেতে খেতে আসতে পারে?....ঠাট্টার স্বাদ, ঠাট্টা করব না? চুপ কর, চুপ কর গিরি, লক্ষ্মীটি....হ্যাঁ বাঁড়ুজ্জে, তুমিও যে কথা কও না!.... দেখোতো!"....

নিতান্ত একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। গিরিবালার কান্না কমিবে কি, আরও বাড়িয়াই যাইতেছে। ওদিকে রাজ্যের সমস্যা আসিয়া রসিকলালের ফিতায় জড়ো হইয়াছে। কাত্যায়নী বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়া কী যে করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। হঠাৎ অতটা উৎসাহের মাথায় ধাক্কাটা খাইয়া তাঁহারও কণ্ঠে যেন কি একটা ঠেলিয়া উঠিতেছে। অসহায়ভাবে একবার ভাজের পানে চাহিয়া বলিলেন—"এমন কিছু বলে ফেলেছি বৌ?"

তিনি ভীতভাবে মগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"কৈ, এমন তো কিছু..."

কাত্যায়নীর আর সহ্য হইতেছিল না অবস্থাটা,—"ভাই, যদি কিছু বলে থাকি ভুলে"—বলিয়া অভিমানভরে রসিকলালের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা

করিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময় হারাণের দুর্বুদ্ধিই হোক, কি সুবুদ্ধিই হোক—আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আসল কথাটা ফাঁস করিয়া দিল—

"ঐ লাউ-চালতা ক'টা আব বড়িগুলো যে ফাঁড়া কাটিয়ে পৌছুতে পেরেছে ছিচরণে এইটেই পোড়াকপালের খুশ্‌নসিব বলে ধরে নেবেন দিদিঠাকরুণ। পিরথিমিতে উপোস করবার লোকের অভাব রাখেন নি বিধেতাপুরুষ। তাদের কাটিয়ে এমনই গেরস্তমানুষের পথ চলা দায়, তার ওপর যদি কেউ দাতাকল্প হয়ে বাড়ি বয়ে তাদের খোরাক পৌছুবার দায় উঠোয় তো তুচ্ছ মুড়কি কেন, কুবেরের ভাড়ারও…"

গিরিবালা হঠাৎ চুপ করিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেছে। রসিকলাল অসহায় ভাবে শুনিয়া গেলেন খানিকটা, তাহার পর মুখটা নিচুভাবেই ঘুরাইয়া উগ্র দৃষ্টিতে হারাণের পানে চাহিলেন।

হারাণ আড়ালে সরিয়া গেল, সেইখান থেকেই বলিল—"আমার কি?—ঢাকি সুদ্দ্‌ বিসর্জ্জন দিতে বললে আরও ভালোই হোত, অমন লতুন গুড়ের মুড়কি বিলিয়ে কুটুম বাড়িতে শুধু লাউ-চালতা বইতে হোত না….বলতুম নি,—কি দরকার পড়েছে আমার?—খাই দাই গাজন গাই….তবে কইতে হোল কথা….নেহাত নাকি মুড়কির আপশোষে দিদি-ঠাকরুণের কোমল অন্তরীক্ষে…."

কাত্যায়নী খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তুই থাম, বুঝিছি। মুড়কির জন্যে আমার 'কোমল অন্তরীক্ষে' ব্যথা লাগে নি;—কি গেরোতেই পড়া গেল দেখো দিকিন!….বাঁড়ুজ্জের সেই খয়রাৎ?—তা বেশ করেছে। গরীব মানুষকে দিয়েছে—এ আর কি অন্যায়টা করেছে? গিরি তুই এই জন্যে কেঁদে সারা হচ্ছিলি? আমি বলি, না-জানি কি এমন বেফাঁস বলে ফেললাম—কুটুম বাড়িতে পা দেওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে....ভয়ে তো আমার পেটে হাতপা সেঁদিয়ে গিয়েছিল,—পিসিমা কি বলবেন, মা এসেই বা কি বলবেন?"

ভাজ বলিলেন—"আর ঠাকুরজামাইও যে ঘাড় হেঁট করে রইলেন, ভয় হ'ল কী অপরাধ করে ফেলেছি আমরা....নাও, জল গামছা দি, হাত পা ধুয়ে নাও।....চল্ গিরি, রাঙাদিদিমার কাছে;—এখনও খবর দেওয়া হ'ল না পিসিমাকে।"

একটা বাধা পাইয়া আদর যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, একটুর মধ্যে গিরিবালা সবার সঙ্গে বেশ মিশিয়া গেল, আদরের উত্তাপে তাহার মনের দলগুলা একটি একটি করিয়া যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আদর বাড়িতেও আছে, বাবার ও জেঠামশায়ের তো নয়নের পুতুলি বলিলেই চলে; মা জেঠাইমার কাছে মাঝে মাঝে ধমকটা আসটা খাইতে হয়, তবুও আতপ্ত বালির একটু নিচেই যে স্নিগ্ধ জলধারা বহিতেছে—এ সন্ধান ভালো রকমেই পাওয়া যায়। তবে এখানকার ভালোবাসাটা একটু অন্য ধরণের। ওখানে সংসার চলে অন্য কি-সবকে কেন্দ্র করিয়া, এখানে সব কিছুই যেন তাহাকে ঘিরিয়াই মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে....সবার সাধ, চিন্তা, কল্পনা।....রাঙাদিদিমার সঙ্গে একচোট জলযোগ হইল। আহারের পর খানিকটা ক্ষীর সরাইয়া রাখিলেন—"এইটুকু তুলে রাখো বউমা, কাল সকালে গিরি খাবে।"...."তুমি খাওনা পিসিমা, ওর জন্যে তো খাবার থাকবেই তোলা।"...."সে কি হয় বাছা? তোরা বুঝিস নে।....আয় লো গিরি, গপ্প শুনবি তো আয়।....একটু হাত চালিয়ে নিস তোরা গো, কচি মেয়ে এতটা পথ এসেছে, হাক্লান্ত হ'য়ে আছে।"

ভাইঝি বলে—"গিরি শোবে কিন্তু আমার কাছে পিসিমা, এসেই আমার কোলে মুখ দিয়ে নাহক অতখানি কাঁদলে গা! কি পোড়াকপাল বলো দিকিন আমার! অন্য দিন যা হয় হবে, আজ আমার কাছে শুক্

বাপু, বুকটা যেন ভার হ'য়ে আছে—এখন তবু অন্যমনস্ক আছি, বিছানায় উঠলেই ঐ কথা মনে হবে, ঘুম হবে না।....আমার কাছেই শুবি গিরি বুঝলি?"

হ্যাঁ, শোব। রাঙাদিদিমার কাছে গল্পটা শুনে নি...."

মাসি ঈষৎ হাসিয়া বলে—"আমার কাছেও গল্প আছে, পিসিমা একচেটে ক'রে নেন নি।"

পিসিমা লেপের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে হাসিয়া বলেন—"গিরি বল,—সে সব তো বাসি গল্প—যখন আমার মতনটিই ছিলে, রাঙাদিদিমার কাছেই শুনেছিলে।"

—গিরিকে লইয়া যেন কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে।

রাঁধিতে রাঁধিতে মামি উঠিয়া আসে।—"সাধন বেশ মাছটি ধরেছে, ঝোল ভালোবাসিস না ডালনা রে গিরি? তোর বাপের তো মুখে স্বাদ নেই, যা ধরে দোব তাইতেই খুশী।"

আশ্চর্য বোধ হইতেছে গিরিবালার—এত বড় প্রশ্ন তাহাকেও জিজ্ঞাসা করে মানুষে। দিদিমার গল্পের আঠার দাসীর সেবায় লালিত রাজকন্যার চেয়ে নিজেকে যেন এতটুকুও কম বলিয়া বোধ হয় না।

মামির নিশ্চয় প্রশ্নের চেয়ে একবার দেখিয়া যাইবার, কথা কহিবার আকাঙ্ক্ষাটাই বেশি প্রবল। বলেন—"দু'ই করব'খন, দু'টো উনুনেই আঁচ দিয়েছি; তুই কিন্তু ঘুমুসনি মা গিরি, ঘুমের ঘোরে স্বাদ পাবিনি, মাঝখান থেকে আমার মনটায় একটা কষ্ট থেকে যাবে। সমস্ত রাত ছট্‌ফট্‌ করব।"

অখিলমামা রাত করিয়া ফিরিলেন। ভগিনীপতিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন, বলিলেন—"কৈ, কাল তো বললে না আজ আসবে, তা হলে কি এত রাত করি?—গিরিকে এনেছ?...তোমার সুবুদ্ধি সম্বন্ধে

নিরাশ হ'য়ে পড়েছিলাম, আবার আশা হ'ল। ঘুমিয়ে পড়ে নি তো? দাঁড়াও, বেটিকে ধরে নিয়ে আসি। বহুদিন দেখি নি হে!"

বাড়ির চেয়ে আরও তফাৎ এইখানে যে, আদরের পাশে পাশে আবার প্রশংসার স্রোত চলিয়াছে—

"তুমি ভালো দেখতে পাচ্ছ না পিসিমা, সকালে দেখো কী চমৎকারটি হয়েছে গিরি!"

"আর, কী বাপ-অন্ত-প্রাণ মেয়ে!—না মেঝঠাকুরঝি?—তখন বাপ অপরুদ্ধ হয়ে গেছে দেখে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেললে গা!—সে কি থামতে চায় পিসিমা?"

পিসি বলেন—"ভালোই, বলে মেয়ের বাপের দিকে টান হ'লে ছেলেপুলের ওপর বাচ্ছিল্যি হয় বেশি। মেয়ে মানুষের পক্ষে বাপ আর ছেলে দুই একই জিনিস কি না—শুধু বয়েসের যা তফাৎ।"

হাজার অভিজ্ঞ হইলেও এঁরা জানেন না নারীত্বের এই মূল তন্ত্রী গিরিবালার অন্তরে কত সুকুমার।—একটু স্পর্শেই রন্‌রনিয়া উঠে। এত সূক্ষ্ম যে, হয় তো বাইরের বায়ুতে বীচিভঙ্গ করে না, তবে তাহার সমস্ত মনটা কান্নায় যেন ভরাট করিয়া তুলে।....লেপের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া গল্প শুনিতেছিল, কেহ টের পায় নাই, আহারের জন্য যখন তাহাকে ডাকিয়া আনা গেল, দেখা গেল মুখটি বিষণ্ণ। মামি প্রশ্ন করিল—"কি গো গিরি, মুখখানি ভার-ভার মনে হচ্ছে যেন?"

গিরির ঠোঁট দুইটি একবার কাঁপিয়া উঠিল।

মামি প্রশ্ন করিল—"বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে নাকি?"

ঠোঁট দুইটি আবার কাঁপিয়া উঠিল, গিরি সামলাইয়া [illegible] মাথা-নাড়িয়া জানাইল, না, মন কেমন করে নাই।

বোনঝির মাথার উপর দিয়া কাত্যায়নী ভাজকে ইসার[illegible]আর এ

প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে মানা করিয়া দিলেন। পিঁড়িটা পাতিয়া দিয়া বলিলেন—"বোস, দে ভাত বৌ,....বয়ে গেছে মন কেমন করতে ওর। কেন, আমরা কি পর?....মা জেঠাইয়ের তো ভারী আদরের ঘটা, তা আবার মন কেমন করতে হবে! গেছি আর কি! মেয়েকে পাঠিয়েছে, না চুল বাঁধবার ছিরি, না কাপড় পরাবার ছিরি!....ও আর যাবেই না সেখানে।....এইখানেই থাকবি আমাদের কাছে, কি বলিস রে গিরি?"

গিরিবালা ঝোঁকটা সামলাইয়া লইয়াছে, বেশ কাত করিয়া ঘাড নাড়িল,—মাসিমার এতগুলো কথার সঙ্গে যাহাতে মানায়। নাড়া পাইয়া দুই বিন্দু অশ্রু গাঁতির উপর ঝরিয়া পড়িল।

নূতন নূতন গল্প সংযোগে মাসিমা নিজের হাতে করিয়া খাওয়াইয়া দিল। কিন্তু যে মেঘখণ্ডটুকু জমিয়াছে তাহা যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ননদ-ভাজে কয়েকবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন—অর্থাৎ আর বুঝি রাখা যায় না। কোন মতে সামলাইয়া লইয়া মাসি বলিলেন—"চল্, তোকে আগে ঘুম পাড়িয়ে আসি গিরি। তারপর ওদের হবে'খন।.... আমি এলে অখিল আর বাঁড়ুজ্জেকে খেতে দিবি বৌ; গপ্প সপ্প করব।"

লেপ ঢাকা দিয়া শুইয়া কাত্যায়নী যে জিনিসটাকে এতক্ষণ এড়াইয়া চলিতেছিলেন নিতান্ত অজান্তে একেবারে তাহারই কাছে আসিয়া পড়িলেন।—নিঃসন্তান বিধবা মানুষ অন্তরের সব দরদ ঢালিয়া বোনঝিকে নাড়া-চাড়া করিতে গিয়া মনের কোথায় কি উথলিয়া উঠিতেছিল কে জানে? লেপের মধ্যে ভালো করিয়া শুইয়া, গিরিবালার চারিদিকে ভালো করিয়া লেপ টানিয়া দিতে দিতে হঠাৎ বুকে চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হ্যালো গিরি, আমি মরে যদি তোর পেটে জন্মাই তো এমনি করে আমায় আদর-যত্ন করবি তো? পিসিমার কাছ থেকে তোকে

যেমন করে কেড়ে নিয়ে এলাম, এমনি করে সবার কাছ থেকে কেড়ে-কুড়ে—নিজের বুকে চেপে রাখবি? নিজের হাতে খাওয়াবি গল্প বলতে বলতে? যখন খুব ছোট—কোলেরটি, তখন টিপ, কাজল পরিয়ে দোলনায় শুইয়ে দোল দিবি? ধুলো লাগলে ঝেড়ে দিবি? রোদে তেতে যখন ঘেমে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, আঁচলে ঘাম মুছিয়ে....”

টানিয়া টানিয়া, বিনাইয়া বিনাইয়া বলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ লেপটা যেন কাঁপিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বোনঝির কান্না যেন কুল ছাপাইয়া উথলাইয়া পড়িল। কাত্যায়নী মুখ থেকে লেপটা সরাইয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন—“ও কি রে, তুই কাঁদছিস গিরি! কান্না কিসের? সত্যি আমি মরে তোর মেয়ে হচ্ছি নাকি? দেখো কাণ্ড বোকা মেয়ের! আর যদি মরিই তো তোর মেয়ে হ’তে সে-ই যার নাম বুড়ো হ’য়ে মরব। কি ক্ষতি? ভালোই তো।

আচ্ছা বেশ, তাও মরব না, বরাবর আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে বেঁচে থাকব। হ’ল তো? নে, চুপ কর....দেখো জ্বালা, তবু চুপ করে না!....”

কোথা দিয়া হঠাৎ কি হইল, কাত্যায়নী বোনঝিকে বুকে আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া নিজেও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আর সান্ত্বনার কথা নাই। মাতৃত্বের দুইটি ধারা নীরব অশ্রুর মধ্যে গলিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল।

একখানি হাত-ভাঙা মাটির পুতুল—ইট তাহার দোলনা—ইট তাহার

শয্যা,—আর সবার পুতুল-শিশুরা জামায়-কাপড়ে জমজম করিতে থাকে —নন্তীর পুতুলের গায়ে পশমের জামা, মাথায় জরির টুপি, লোকে চাহিয়া লইয়া দেখে, প্রশংসা করে,—তাহাদের পাশে সেই অনাদৃত, লাঞ্ছিত, বিকলাঙ্গ শিশু—সবার অবহেলার দৃষ্টি বাঁচাইয়া মাকে বুকের কাছটিতে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হয়।··· মায়ের মনে পড়িল আজ সেও অবহেলার সহিত ফেলিয়া আসিয়াছে সেটিকে ; হরু কি আর যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিবে ? গিয়া দেখিবে হয়তো নাই—আবার গিয়া যখন শিউলি তলাটিতে খেলাঘর গুছাইবে—এই ভাঙা পুতুলটির স্থানটি হয়তো থাকিবে শূন্য···

এই দূরত্ব, হিমরাত্রির এই অন্ধকার—সব যেন এই বিচ্ছেদকে সত্য করিয়া তুলিতেছে····সঙ্গে আসিয়া পড়িতেছে মা, খোকা, হরু,—সবাই, বাবা পর্যন্ত।····ভুল, অনাদর, বিদ্রূপের মধ্যে দিয়া বাবা কেমন করিয়া যেন মাটিতে-গড়ানো, ভাঙা পুতুলটির পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ঐ রকমই অসহায়—কেন যে বাবা সব বিলাইয়া দেন, এমন করিয়া।···· মুখে পণ্ডিতমশাইয়ের ওখানে ছোট ছেলের মতো প্রাণখোলা হাসি, এখানে মুড়কির কথায় মাথা তুলিতে না পারা, মায়ের বকুনির ভয়ে বাড়িতে গুটি-গুটি তাহার পাশে পাশে থাকিয়া প্রবেশ—সব মিলিয়া সত্যই বাবাও যেন একটা ছোট ছেলে—পাশটিতে না থাকিলে—এখন যেমন গিরিবালা নাই—মনটা যেন হাঁপাইয়া ওঠে····

এর পাশেই আর একটি ধারা—যে মা হইতে পারিল না, উৎস যাহার নিরুদ্ধই রহিয়া গেল, হঠাৎ কিসের আবেগে তাহার সেই নিরুদ্ধ উৎসের মুখ খুলিয়া যাওয়া।—কাত্যায়নী নিজের বুকের যে অমৃত দিতে পারিলেন না, পরের বুকে সেই অমৃতের স্বাদ পাইতে চান—দেওয়ায় আর স্বাদ পাওয়ায় কি বেশি তফাৎ ?···বুকের-ধনের রৌদ্র-তপ্ত রাঙা মুখ

মুছাইয়া দেওয়ার সঙ্গে—"গিরি তুই আঁচলে আমার মুখ মুছিয়ে দিস্"—এই যে সাধ, এর কতটুকুই বা প্রভেদ? একদিক দিয়া বিস্তর হইলেও একদিক দিয়া যে নিতান্তই নগণ্য,—প্রভেদ নাই বলিলেই চলে। এযে আরশিতে নিজের প্রতিবিম্ব ফেলা;—কতটুকু থাকে তফাৎ?

ঘুম পাড়াইয়া আসিলে ভাজ বলিলেন—"ওমা, তুমিও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ঠাকুরঝি? চোখ দু'টো ফুলো-ফুলো দেখছি যে?"

"হ্যাঁ, একটু চোখ বুজে এসেছিল, কাল সমস্ত রাত যাত্রা দেখেছি··"

"গলার আওয়াজটাও ভারী-ভারী ঠেকছে। রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে যায়নি তো?"

৭

সকালে বিছানা থেকে নামিয়াই গিরিবালা যেন নূতন জগতে প্রবেশ করিল। কাল সেই আসার কথা ওঠা থেকে নিদ্রাগমের পূর্ব পর্যন্ত মনটা খুব নাড়া খাইয়াছিল,—যাত্রার ঔৎসুক্য, পথের যেই বিচিত্র ঘটনার বিস্ময়, মামার বাড়ির আদর, তাহার পাশেই অশ্রু—সব মিলিয়া তাহার সত্তাটিকে যেন নূতন ভাবে একবার জাগাইয়া দিল।····প্রভাতটি বড় চমৎকার লাগিল। বাবার পূর্ণ মনের সচেতন কবিত্ব কোথায় পাইবে?—তবে নূতন লাগিল, এবং মিষ্ট লাগিল। নিজেকে যেন বেশ একটু বড় বলিয়া বোধ হইল। রাত্রে সেই পুতুলের জন্য কান্নার কথা ভাবিয়া একটু যেন নিজের কাছেই লজ্জা-লজ্জা বোধ হইতে লাগিল—কতকটা

যেন নিজেকে চেনার মতো। অবশ্য আবছায়া ভাবে চেনা, তবে অনুভব করা যে কাল-পরশুকার গিরিবালাটি যেন একটু ছোট—তাহার কথা ভাবিতে আজকের গিরিবালার মনে লজ্জার সঙ্গে একটি করুণার ভাব আসিয়া পড়ে।

আরও নাড়া খাইল মনটা। মাসি সকালে হাল্কা ভাবে সাজাইয়া-গুছাইয়া পাড়ায় লইয়া গেল, এ-বাড়ি, সে-বাড়ি—কোন একটা ছুতা করিয়া—যেন বোনঝি দেখাইতে নয়, পাশে যে একটা নূতন মেয়ে আছে সেদিকে যেন চৈতন্যই নাই।

"কৈ গো খান্ত—রাঙাখুড়ি কোথায়? চানে গেছেন নাকি?"

"এত সকালে চানে গিয়ে মরব? এমনই শীতে হি-হিয়ে দিয়েছে। রাঙাখুড়ি গেলে বাঁচিস, না?—বুড়ি হ'য়ে গেছি তো? সঙ্গে ওটি কে?"

"তুটো পাপর নিয়ে এলাম, কাল বেলে-তেজপুর থেকে এয়েছে, মনে করলাম সকাল সকাল দিয়ে আসিগে যাই, অভয়দার আবার আফিস, বেরিয়ে যাবে।....ধর্ খান্ত, ভেজে দিস্।....ইটি?—ওমা, চিনতে পারলে না? বরদার মেয়ে গো,—গিরি।....যা, দিদিমাকে পেন্নাম করগে।"

"থাক্, থাক্, হয়েছে। দেখি; ওমা তাই তো!....আর মা, আমার কি চোখের দৃষ্টি আছে? দিব্যি মেয়েটি তো হয়েছে বরুর আমাদের—যেন নক্ষ্মী-পিতিমেটি! বরুও ঐ রকমটি ছিল, মনে আছে কিনা; তবে মেয়ের রং যেন আরও মাজা। বেঁচে থাক্, পাকা চুলে সিঁতুর পরুক, আর কি আশীব্বাদ করব?"

"মেয়ের আর এর চেয়ে বড় আশীব্বাদ আছেই বা কি রাঙাখুড়ি?"

"সঙ্গের উটি কে গো কাতু দিদি? যেন নতুন নতুন ঠেকছে?"

"বকুর মেয়ে। কাল বাপ নিয়ে এসেছে। এসেই বেড়াবার শখ হয়েছে মেয়ের ; পাড়া-বেড়ানি কারুর বৌ হবেন বোধ হয়। দেখো না, সক্কাল বেলা টেনে নিয়ে এয়েছে আমায়, মাসির যেন কত ফুরসোং !"

"বল্—'বেশ করেছি—মাসি হওয়া ওমনি নাকি'···নামটি কি তোমার মা ?"

"গিরিবালা।"

"বেশ মিষ্টি নামটি ; দুগ্গার নাম।···আর আমাদের বাড়িতে এক নাম রাখার ঢো হয়েছে !—দাদার অমন চমৎকার মেয়েটির নাম হ'ল তনিমা। ওর মাকে জিগ্যেস করি—'হ্যাঁগা, তনিমা আবার কি জিনিস ?—বেদে-পুরাণে কেউ কখনও শোনেনি !····কে তক্ক করে বলো ইস্কুলে-পড়া মেয়ের সাথে ? বাবাও ঐ দিকে ; বলি—চুপ করে থাকাই ভালো।"

"গিরিবালা নাম রেখেই খালাস হয় তবে তো ? বাপ বলে মেয়ে আমার পাব্বতী-উমা—গৌরী দান করব। ও আজকালকার সব বাপ-মাই সমান ভাই, কি যে এক নতুন হাওয়াই উঠেছে।"

"কে গো, শ্রীমতী কাত্যায়নী না ? হঠাৎ আজ এ-আকাশে যে ! পথ ভুলে ?"

"ভাবলাম—দেখে আসি ঘোষাল-ঠাকুরদাদার আকাশে কোন নতুন তারা উঠল কিনা।"

"ভালো, আড়ি পেতেও যদি এক একবার উদয় হও তো ঠাকুরদাদার খালি আকাশটা মাঝে মাঝে আলো হয়। সঙ্গে কে ও ?"

"আপনার ছোট নাতনির মেয়ে।"

"বন্ধুর মেয়ে? বেশ, বেশ, এস তো মা! বাঃ, দিব্যি মেয়ে, খাসা মা হবে আমার। নামটি কি?"

"গিরিবালা।"

"গিরিবালা দেবী।—তা মা আমার বোধ হয় বলবে 'দেবী'—সে তো আমার চেহারা দেখেই বুঝবে লোকে, নিজের মুখে আর বলতে যাব কেন? তাই নাকি গো?....হাসিটিও বড় মিষ্টি মায়ের। থাকবে এখন কিছু দিন?"

"থামুন্, থাকার কথা আর তুলে কাজ নেই। দেখতে ভালো-মন্দ যাই হোক, অতশত বুঝি না, তবে আদ্ধেকটি সংসার এই এক ফোঁটা মেয়ের ঘাড়ে। মা নতুন পোয়াতি, এক হাঁড়িটা শুধু জেঠাইমার হাতে, বাকি যত কন্না ঐ মেয়ের ওপর; থাকলে চলবে ওর?....কি লো, থাকবি? বেশ তো এমন কোলের ছেলে পেলি!....আসি ঠাকুরদা এখন। এইদিকে একবার এসেছিলাম, মনে করলাম ঠাকুরদার খবরটা একবার নিয়ে যাই। ঠানদি কোথায়?... ভেতরে? যাই, একবার নতুন শাশুড়িকে দেখিয়ে আনিগে, নইলে আবার মুখ-নাড়া খেতে হবে কোন্ দিন...."

সম্পত্তি দেখাইয়া যেন আশ মেটে না আর মাসিমার। অনেকখানি ঘোরা হইল সকাল থেকে, কিন্তু প্রতিপদেই নিজেকে নূতনভাবে অনুভব করার জন্য ঘোরাটা গিরিবালার যেন গায়েই লাগিল না। যেটুকুই বা ক্লান্তি আসিয়াছিল, বাড়িতে আসিয়া তাহাও কোথায় যেন উবিয়া গেল। দিদিমা আসিয়াছেন, আর সঙ্গে আসিয়াছে অখিলমামার ছেলে বিকাশ। বিকাশ একটু বেশি চেনা, অখিলের সঙ্গে প্রায় তেজপুরের বাটীতে যায়। আদরের মধ্যে সখ্যের যে অভাব ছিল, বিকাশ সেটা পূরণ

করিয়া দিল। দিদিমা থেকে ভাই পর্যন্ত সবার স্নেহ যেন একটি নিটোল আঙ্গুরের মতো টলমল করিতে লাগিল।

বিকাশের মনোরঞ্জন করিবার পদ্ধতিটা একটু অন্য ধরণের। স্থানীয় স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ে; নিজের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে একটু বেশি সজাগ। বোনকে প্রশ্ন করিল—"কি পড়ছিস্‌রে তুই গিরি আজকাল?"

গিরিবালা একটু লজ্জিত ভাবে বলিল—"দ্বিতীয়ভাগ।"

"মোটে দ্বিতীয়ভাগ!" ঠোঁট দুইটা গোল করিয়া 'উস্‌' করিয়া এমন খানিকটা বিস্ময়ের হাওয়া পেটে টানিয়া লইল যে যেন গিরিবালার বয়স কুড়ি কি তিরিশ গোছের কিছু একটা। বলিল—"চল্‌ আমার বই দেখবি। তুই তো অজ্ঞানই হয়ে যাবি তা' হলে।"

একটা দেবদারু কাঠের টেবিলে অবিন্যস্ত একরাশ বই-খাতা গিরিবালার বিদ্যার দৌড় ততদূর হইলে বুঝিত তাহাতে কাশীরাম দাসও আছে, অন্নদামঙ্গলও আছে, নূতন পুরাতন পঞ্জিকাও আছে। সে একটু বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু সংখ্যাতেই ভগ্নির মনের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে একবার দেখিয়া লইয়া বিকাশ গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার মতো একখানা, ঘাড়ে-গর্দানে বই তুলিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলে বল্‌ দিকিন এটাকে?"

আকারটা চেনা, গিরিবালা বলিল—"পাঁজি।"

বিকাশ বলিল—"শুধু এক পাঁজিই চিনেছিস্‌ কিনা! ডিক্‌শনারি।—বল্‌ দিকিন মুখে।"

গিরিবালা বলিল—"ডিশ্‌নারি।"

বিকাশ একটু মৃদু হাসিল, বলিল—"ডিক্‌শনারি—সি আর এস্‌ একসঙ্গে—ভারিতো বুঝলি তুই!—ক আর স একসঙ্গে, মাঝখানে কোন ভাউয়েল নেই—মানে স্বরবর্ণ নেই; এইবার বল দিকিন।"

গিরিবালা টীকার চোটে আরও ধাঁধা খাইয়া গেল, এবারে চেষ্টাও করিতে সাহস করিল না।

"এইখানে এসে আমার কাছে তোকে থাকতে হবে, নইলে বেলে-তেজপুরে থাকলে তুই মুখ্যু হয়ে যাবি গিরি। পিসেমশাইকে বলব।"

"তাহারপর ডিক্‌শনারিটা তুলিয়া ধরিয়া হাতটাকে একটু ঘুরাইয়া বলিল—"পৃথিবীর মধ্যে য-ত্তো কথা আছে তুমি এর মধ্যে পাবে। নাম করো—যে কোন কথা।"

গিরিবালা একটু ভাবিল ; সকালে মাসিকে ঘোষালঠাকুরদার ডাকটি বড় মিষ্টি এবং অভিনব লাগিয়াছিল,—যেন কোন যাদুকরকে ঝুলির ভিঁতর হইতে অসম্ভব কোন দ্রব্য বাহির করিতে ফরমাইস করিতেছে, এইভাবে বলিল—"আচ্ছা দেখাও—সীমতী কাত্যায়িনী।"

বিকাশ নিরাশভাবে বইটা রাখিয়া দিল, বলিল—"খালি—পাজি, সীমতী কাত্যায়িনী—এই শিখেছিস কিনা...."

আরও সব বিষয় আছে,—এলজেব্‌রা, জিওমেট্রি, ...অঙ্কের শিক্ষক থার্ডমাষ্টার জগদীশবাবু—বাবাকে পড়াইয়াছেন, দাদাকে পড়াইয়াছেন, হেডমাষ্টারকে পড়াইয়াছেন। হেডমাষ্টারের কানের পিছনে এখন পর্যন্ত একটা কাটা দাগ আছে—গর্বের সহিত দেখাইয়া বলেন—"এই আশীর্বাদের জোরে আজ এখানে হেডমাষ্টারের চেয়ার দখল ক'রে আছি।" আসিয়াই প্রথমে থার্ডমাষ্টারের পদধূলি লন, তাহার পর কাজ আরম্ভ করেন—অত বড় অঙ্ক জানা লোক এ তল্লাটে নাই।....এল্‌জেব্‌রা, জিওমেট্রির পর রয়েল-রীডারের ছবি সব—নেপোলিয়ান আল্প্‌স্‌ অতিক্রম করিতেছেন—তুষার-ঢাকা অলঙ্ঘ্য গিরিবর্ত্ম—নেপোলিয়ান বলিলেন—"দেয়ার শ্যাল বি নো আল্প্‌স্‌! আল্প্‌স্‌ আমার গতিরোধ করে দাঁড়াবে ?—বটে—আল্প্‌স্‌কেই ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হতে হবে—তার মানে, মানুষের

পরাক্রমের সামনে আল্প্‌স্‌কে মাথা নত করতে হবে—তার মানে নেপোলিয়ান নিশ্চয়ই আল্প্‌স্‌ পাহাড় ডিঙোবেন—বরফে ঢাকা আল্প্‌স্‌ পাহাড়—এ পর্যন্ত যা কেউ পেরুতে পারে নি।"

বিকাশ উপযুক্ত শ্রোত্রী পাইয়া নিজের ইস্কুলের ধার-করা লেকচার শুনাইয়া যাইতেছে। গিরিবালা অকৃত্রিম বিস্ময়ে চাহিয়া আছে। কে জগদীশমাষ্টার জানে না, কে নেপোলিয়ান, কোথায়ই বা বরফে ঢাকা আল্প্‌স্‌ পাহাড়?—যে পাহাড ডিঙাইল সে বড, না, যে হেডমাষ্টাবেব কানের পিছনে চিরদিনের জন্য বেতের দাগ রাখিয়া দিতে পারে সেই বড়, কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না, শুধু একদল বিচিত্র-কর্মাদের আশ্চর্য জগতের সামনে মুগ্ধ নেত্রে দাঁডাইয়া থাকে।

তাহারপর বাংলা রীডারের ছবি সব—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর!—ছবি মাত্র,—তবু চোখ দেখিলে চোখ ফিরাইতে পারা যায় না যেন, এমনিই দীর্ঘায়ত আর ভাস্বর!...বিদ্যাসাগর।....বিকাশ বলে—"মাথায় চুল অমন করে কাটা বলে একটা হেঁজিপেঁজি মানুষ মনে করিস নি গিরি—মস্ত বড় লোক। আর জানিস?—মা যদি বললে—'ঈশ্বর'—নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—মা যদি একবার বললে—'ঈশ্বর, তোকে অমুক কাজটা করতে হবে' ব্যস—আর নড়চড় হবার যো নেই, তা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরই আসুন না কেন। খুব বড় চাকরি করতেন, বাড়িতে একটা বিয়ে ছিল, মা আসতে বলে দিয়েছিলেন! ছুটি চাইতে সাহেব বললে, 'না পণ্ডিত, এখন ছুটি অসম্ভব।' বাইরে গিয়ে একটু ভাবলেন, তক্ষুনি ফিরে এসে বললেন—'তাহ'লে রইল সাহেব তোমার চাকরি, মা ডেকেছেন আমাকে যেতেই হবে।'....চটি-পরা বামুনের তেজ দেখে সায়েব ছুটি দিতে পথ পায় না। বাড়ি আসতে রাস্তায় দামোদর—এই যে

দামোদর তুই পেরিয়ে এলি—একুল-ওকুল দেখা যায় না—তার ওপর বর্ষাকাল, ভেবেই দেখ্ নিজের মনে! বিদ্যাসাগর যখন ধারে এসে পৌছুলেন তখন রাত্তির হয়ে গেছে....”

বিকাশ বর্ণনাটাকে আরও জোরাল করিবার জন্য নিজের কল্পনা শক্তির সাহায্য লইল, বলিল—“রাত্তির বারোটা হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘুটঘুট করছে, আকাশে সে কী ভীষণ দুর্যোগ। মাঝি বললে—‘না ঠাকুর, যতই কেন বেশি দাও খেয়ার কড়ি, এমন রেতে নৌকো খুলব না; প্রাণ আগে তবে তো কড়ি!’... কিন্তু, এদিকে যে মায়ের ডাক, বিদ্যাসাগরের নিজের প্রাণ তো তার আগে নয়?....যখন কোন মতেই মাঝিকে রাজি করা গেল না, তখন কি করলেন বল দিকিন গিরি?”

মহিমময় কাহিনীটি বলিতে বলিতে বিকাশের কিশোর বদনে একটা জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, উত্তরের জন্য একটি শান্ত স্মিত হাস্যের সহিত ভগ্নির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। গিরিবালার বোধ হয় এই অবাধ্যতার অন্যায়টুকুর দিকেই মনটা আকৃষ্ট ছিল বেশি, বলিল—“মেরে ফেললেন?”

বিকাশ উত্তরটা শুনিয়া মুহূর্তমাত্র চোখ তুলিয়া যেন একটা কি ভাবিল, বোধ হয় মনে করিল ভগ্নি খুব বেশি ভুল বলে নাই—মারিয়া ফেলিলেও বিশেষ অন্যায় হইত না। মুখে বলিল—“দুৎ, তুই-আমি হ'লে বোধ হয় ফেলতাম মেরে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের যে দয়াও ছিল তেমনি ভয়ঙ্কর!....বিদ্যাসাগর বললেন—‘দেয়ার শ্যাল বি নো দামোদর!’

প্রভাবটা কি রকম হইতেছে দেখিবার জন্য ভগ্নীর বিমুগ্ধ দৃষ্টির উপর চক্ষু রাখিয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল। গিরিবালা প্রশ্ন করিল—“সেই পাহাড় ডিঙোনর লোকটা যা বলেছিল?”

বিকাশের দৃষ্টি প্রশংসায় আয়ত হইয়া উঠিল, বলিল—“তুই শুনছিস

মন দিয়ে তাহ'লে, আছে মনে। হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর অবশ্য ওকথা চেঁচিয়ে বলেন নি, মনে মনেই বলছিলেন।—আমাদের হেডমাষ্টার মশায় আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন—গ্রেট্ মেন্ থিঙ্ক্ এলাইক্…মানে কি বল দিকিন ?"

ভাবের ঘোরে অসম্ভব প্রশ্নটা করিয়া তখনই বলিল—"মানে—সব বড় লোকদের চিন্তার ধারা একই রকম।…এই না মনে করে ঝপ্পাং করে সেই রাক্ষুসির মতো দামোদর-নদীতে দিলেন ঝাঁপ !"

গিরিবালা হঠাৎ যেন ভয়ে সিঁটকাইয়া উঠিল, বলিল—"আহা গো !"

বিকাশের মুখটি শান্ত হইয়া আসিল, ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"তুই ভাবলি বুঝি মরে গেলেন ?…মায়ের আশীর্বাদ, মারে কার সাধ্যি রে ? বিয়ের আগেই মায়ের কাছে গিয়ে হাজির।"

বিকাশ এখানে আর একবার থামিল, তাহার ব্যাখ্যানটার এমন অপ্রত্যাশিত প্রভাব হইতেছে দেখিয়া বোধ হয় একটু লোভ বাড়িল। বলিল—"তারপর মায়ে-ছেলেয় গলাজড়াজড়ি করে সে কী কান্না।"

যে রেটরিক অর্থাৎ অলঙ্কারের জোরে সে এতটা ফল পাইল, তাহাতেই যে কী গুরুতর ভ্রম করিয়া বসিল, বিকাশের তাহা বুঝিবার যেমন বিদ্যাও ছিল না, তেমনি অবসরও ছিল না। ঝোঁকের মাথায় বলিয়াই চলিল, "গলাজড়াজড়ি করে সে কী কান্না !—সে কী কান্না !! কার সাধ্যি থামায় দু'জনকে…ও কি রে গিরি, তুইও যে কেঁদে ফেললি ! দেখো মেয়ের কাণ্ড ! চুপ কর্ !"

ভগ্নীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া প্রবোধ দিতে লাগিল—"চুপ কর গিরি…দেখোতো !—ওরে কাঁদে নি, ওটুকু আমি বাড়িয়ে বলেছি,—অমন তেজী ছেলে কখনও কাঁদে ?…কর চুপ গিরি, লক্ষ্মীটি ; কী ফ্যাসাদে যে ফেললি ! পিসিমা ভাববে তোকে বুঝি মেরেছি আমি‥ "

অনেকক্ষণ পরে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া গিরিবালা থামিলে বলিল—"মেয়েছেলে, এক জাতই তোরা আলাদা, ছোটই হোস্ আব বড়ই হোস্; কার ছেলে কবে কষ্ট করে মেয়ের কাছে এসে গলাজড়িয়ে ধরেছিল তা কানে শুনেও তোর কান্না!"

বিকাশের আরও বলিবার ছিল—একটা ভাবের বান ডাকিয়া গেছে মনে; ভগ্নরি অদ্ভুত আচরণে একটু বাধা পাইয়া খানিকটা চুপ করিয়া এ-বই সে-বই একটু নাড়াচাড়া করিল। তাহারপর সূত্রটা আবার তুলিবার আগে একটু উপক্রমণিকা হিসাবে বলিল—"যা ছিঁচকাঁদুনে তুই, তোকে বলতেই ইচ্ছে করে না; আবার কাঁদবি তো?"

গিরিবালা মাথা নাড়িয়া জানাইল—না, কাঁদিবে না।

বিকাশ আবেগটা সঞ্চিত করিয়া লইবার জন্য আরও একটু থামিল, তাহাবপর বলিল—"নেপোলিয়ানও ঠিক ঐ রকম ছিলেন, মা যদি কোন কথা বললেন তো ঠিক বিদ্যাসাগরের মতন—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এলেও টলাতে পারবে না—অবশ্য ওঁরা খ্রীশ্চান, ওঁদের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর নেই, শুধু যীশু আছে,—কিন্তু প্রতিজ্ঞা টলাতে পারবে না।....তুমি যীশু আছ তো নিজের ঘরে থাকো, মায়ের কথার সামনে তোমার হুকুম চলবে না।....আরও যত সব বড বড লোক হয়ে গেছেন, সব মায়েব ভক্ত,—ওয়াশিংটন বল্, আলেকজেণ্ডার বল্, আমাদের পঞ্চপাণ্ডব বল্, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বল্—কত আর নাম করব?....তোকে একটা কথা বলছি গিরি, বলিস নি কাউকে।"

গিরিবালা কুতূহলী হইয়া মুখের পানে চাহিতে বলিল—"আমিও মাকে খু—ব ভক্তি করতে আরম্ভ করেছি গিরি; মিলিয়ে দেখবি সব কাজ ছেড়ে আগে মায়ের হুকুম তামিল করি। এবারে ক্লাসে ফাস্ট হলাম কি করে? মিলিয়ে দেখিস—এক সময় খুব বড় হব; মা মস্ত বড় জিনিস রে!"

গিরিবালার মনটা আবার উথলিয়া উঠিল, প্রতিজ্ঞার কথাটা স্মরণ করিয়া নিজেকে সংবৃত করিয়া লইল, তবু একটু ধরা গলায়ই বলিল—"আমিও গিয়ে এবার থেকে সব কথা শুনব মায়ের, বিকাশ দাদা।"

বিকাশ আবার একটু কি ভাবিল, তাহারপর বলিল—"তোর অতটা না করলেও চলে, মেয়ে কিনা ;—তুই বরং বাপের দিকটা দেখিস—পিসেমশাইয়ের দিকটা আর কি।"

আর একটু থামিয়া কতকটা উপদেশহিসাবে কতকটা উচ্ছ্বাসের বশে বলিল—"তোকে বরং ভালো মা হতে হবে গিরি—যে দেশে যত ভালো মা, সে দেশে তত উন্নতি। ঐ যে সব দেখছিস নেপোলিয়ন, বিদ্যা-সাগর, মৌর্য-চন্দ্রগুপ্ত—ওঁরা কি অমনি অত-বড় হয়েছেন?—ওঁদের মায়েরাও তেমনি ছিলেন। তুই এখন থেকেই ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করবি....'হে ঠাকুর, আমি যেন বড় হয়ে ভালো মা হতে পারি—আমি যেন বড় হয়ে ভালো মা হতে পারি।'....পূজো করিস রোজ তো?"

গিরিবালার মুখে এমন যোগাযোগে আর সত্যটা বাহির হইল না, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ, করে।

বিকাশ বলিল—"পূজোর সময় বলবি শিবঠাকুরকে ; তা ভিন্ন তোকে আমি একটা সুন্দর প্রার্থনাও শিখিয়ে দোব, আমাদের বাংলার পণ্ডিত মশাইয়ের রচনা, রোজ ঘুম ভাঙলেই আগে বলে তবে বিছানা ছাড়বি—

রাত্রি হোল অপগত
নব সূর্যোদয়ে,
খুলিনু নয়ন প্রভু,
তবাশিস্ লয়ে ;
আমি না প্রার্থনা করি
বিত্ত অগনন,

পুণ্য কর চিত্ত মোর
এই নিবেদন ;
জ্ঞান দাও, শক্তি দাও,
দাও ভক্তি চিতে....

আরও আছে, আমি দু'এক জায়গায় বদলে ছেলের কথাটা বসিয়ে দোব'খন। পদ্যও লিখছি কিনা একটু একটু আজকাল....”

৮

গিরিবালা এবার বেশ কয়েক দিন রহিয়া গেল মামারবাড়ি—একেবারে পূর্ণিমা পর্যন্ত। রসিকলাল ইতিমধ্যে দুইতিনবার বাড়ি-শ্বশুরবাড়ি যাওয়া-আসা করিলেন। টানা এতদিন শ্বশুরবাড়ি পড়িয়া থাকা যায় না, তাহা ভিন্ন হাতের কেসগুলা আছে। বেলে-তেজপুরে আর একটা নূতন আকর্ষণ হইয়াছে, পণ্ডিতমশাই। অলস রসালোচনা আর যত রকম অসম্ভব কল্পনার সঙ্গী পাইয়া রসিকলালের মধ্যেকার কর্মপলাতক কবিটি আবার মাথা ঝাড়িয়া উঠিতেছে। বেলে-তেজপুরে গেলে এখন ওঁর ওখানেই কাটে বেশিটা সময়।

এই গতায়াতের মধ্যে একবার ভাই-পো সাতকড়িকে রাখিয়া যান সিমুরে, তাহার পায়ের ঘাগুলা সারিলে। বিকাশ দুইটি শিষ্য বা ছাত্র-ছাত্রী পাইয়া পুরাদস্তুর শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়া দিল—বাড়িতে এবং বাহিরেও।—স্কুল থেকে প্রত্যহ বড় বড় যাহাকিছু শিখিয়া আসে—আজকাল ঝোঁক করিয়া শেখেও অনেক—সমস্ত দুইটি শিশুর সামনে উজাড় করিয়া দিয়া তাহাদের বিস্ময়ের পরিধি বাড়াইয়া তোলে। সাতকড়ি ছেলেটি বড় ভালোমানুষ আর দিদির নিতান্ত অনুগত।

শুনিবার সময় মাঝে মাঝে দিদির দিকে চাহিয়া দেখে। দিদি যেমন মুখের ভাবটি করে, সেও করিবার চেষ্টা করে, দিদি "আহা" বলিলে "আহা" বলে, "ওরে ব্বাবা!" বলিলে হয়তো আর একটী শব্দ বাড়াইয়া বলে—"ওরে ব্বাবা! উস্!"

বাহিরেও শিক্ষকতা হয়, ছোট গ্রামটির যত রকম দ্রষ্টব্য যা'কিছু সেগুলির সঙ্গে বিকাশ ভাই আর বোনটির পরিচয় করাইয়া বেড়ায় বিকালে স্কুল থেকে আসিয়া। একটা মজা ডোবার, কি একটা পোড়ো বাড়ির, কি একটা ঢিবির মধ্যে অবশ্য দ্রষ্টব্য কিছু থাকে না, তবে বিকাশের কল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্ক করিয়া তোলে সেগুলিকে দ্রষ্টব্য—তাহাদের সঙ্গে রোমান্স্ বা রহস্যের যোগাযোগ ঘটাইয়া।—"ঐ যে ঢিবিটা দেখছিস্ সাতকড়ি, ওর মধ্যে কিছু নয় তো লাখখানেক সোনার মোহর পোতা আছে—পেতলের ঘড়ায় ক'রে।"

সাতকড়ি দিদির দিকে চায়; দিদি বিকাশকে প্রশ্ন করে—"সত্যি! কেউ নেয় না কেন বিকাশ দাদা?"

সাতকড়ি বলে—"সত্যি! কেউ যে নেয় না?" বিকাশের ততক্ষণে উত্তর আরম্ভ হইয়া যায়। বলে—"চেষ্টা কর না তোরাই গিয়ে, এখন তো রাত্তিরও হয় নি।....সব ঘড়ার ঠিক মাঝখানটিতে এক যক্ষী বসে আছে।... চেষ্টা কেউ কেউ যে না করেছে এমন নয়; লোভ বড পাপ কি না, কিন্তু...."

এফেক্টের জ্ঞান ভালো, আর বলে না।

এ-ভিন্ন স্কুল আছে, চৌধুরীদের বাড়ি আছে, পঞ্চাননতলা আছে, কত দিনের কত ইতিহাস বিজড়িত। এমন কি একদিন জগদীশ-মাষ্টারকে পর্যন্ত দেখাইয়া দিল—সব বিস্ময়ের সেরা বিস্ময়।—হেডমাষ্টারের কানের পিছনে যে একটি চিরন্তন দাগ রাখিয়া দিয়াছে

সেও কিনা খালি গায়ে হুঁকা হাতে নিজের বাড়ির বারান্দাটিতে সাধারণ মানুষের মত ঘুরিয়া বেড়ায়! এর পরে আরও কী না দেখিতে হইবে!

রাত্রিগুলো কাটে মেজমাসিমা, মামি আর দিদিমাদের কাছে। মাসিমার কাছেই বেশি, কেননা তিনি যেন বেশি করিয়া খোঁজেন, আরও ঠিক ভাবে বলিতে গেলে অন্য সবার কাছ থেকে কাড়িয়া কাড়িয়া বেড়ান। মামিমার হাতটা একটু আজাড় থাকিলে মামিমা রান্না ঘরে ডাকিয়া লন, পাইলে দু'জনকেই নয় তো শুধু গিরিবালাকে। অনেক রকম গল্প হয়—বেলে-তেজপুরের, এখানে আজ নূতন কি সব দেখিল, বিকাশ কি কি সব বলিল—সেই সব। মামি তরকারি নাড়িতে নাড়িতে খন্তিটা তুলিয়া নিজের হাঁটুর উপর চিবুকটা রাখিয়া ঈষৎ হাসি মুখে শুনিতে থাকেন—কী মধু পান তিনিই জানেন—এক একবার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একদিন গিরিকে একলা পাইয়া এমনি করিয়া গল্প শুনিতে শুনিতে হঠাৎ বলিয়া বসিলেন—"বিকাশের যদ্দিন না একটি বোন হবে তুই যেতে পাবি না গিরি! থাকবি তো মামির কাছে?"

একটু পরে উঠিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—"যাস্ নি গিরি যেন, এলাম বলে আমি।"

ফিরিয়া আসিয়া গিরির হাতে একটা ডবল পয়সা দিয়া বলিলেন,—"কাল রাসের মেলায় কিছু কিনে খাবি গিরি।"

একটু পরেই বলিলেন—"হ্যাঁ, ভালো কথা, তোকে যা বললাম কাউকে যেন বলিস নি, ভাববে মামি আটকে রাখতে চায়।"

আরও একটু পরে একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলিলেন—"মায়ের জিনিস মায়ের কাছে যাবি, আমি আটকাতে গেলাম কেন, কি বলরে?"

কয়েক দিন যাত্রা দেখাও হইয়াছে। রাত্রে খাওয়া দাওয়া সারিয়া যায়। যায় প্রায় সকলেই, অখিল এবং দিদিমাদের মধ্যে কেহ একজন

বাড়িতে থাকেন। পূর্ণিমার দিন হইল অভিমন্যু বধ। শেষ দিন, আসরটা সাজানো হইয়াছে খুব ঘটা করিয়া, লোকও হইয়াছে খুব বেশি। অভিমন্যুবধের পালাটাও গোপাল উড়ের নামজাদা পালার মধ্যে। কয়েক দিন থেকে নাগাড়ে যাত্রা হইয়া চলিয়াছে, এদিকে শ্রোতাদের অবসাদের জন্য আসরটা খালি-খালি হইয়া আসিতেছিল, সাজানোর মধ্যেও একটা গতানুগতিক ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল, আজ যেন আবার গমগম করিয়া উঠিয়াছে। পূর্ণিমার এই শেষ রাত্রিটিকে বিশিষ্ট করিবার জন্য বরাবরই দু'একটা জিনিস আলাদা করিয়া রাখা হয়—এই রাত্রেই বাহির করা হয়। আজ মাঝখানটিতে একটি বেশ বড় টকটকে রাঙা বেলোয়ারি ঝাড় দেওয়া হইয়াছে, চারি কোণে চারিটা ভালো ভালো কাচের হাঁড়ি-লালটেম টাঙান হইয়াছে, চারি কোণের চারিটা থামেও সবুজ রঙের ব্র্যাকেট-ঝাড় বসান হইয়াছে। যে মোমবাতিগুলি ছোট হইয়া গিয়াছিল সেগুলি বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কাগজের শিকল, কাগজের পতাকা যেখানে যেখানে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর, নিবিবার পূর্বে আসরটা যেন পূর্ণতর ঔজ্জ্বল্যে একবার দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এদিকে রাসের মঞ্চেও এই ব্যাপার—আলোয়, সজ্জায় যেন ঝলমল করিতেছে। সাতকড়ির তো কথাই নাই, গিরিবালা, যে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এ-ধরণের জাঁকজমকে, সে পর্যন্ত আজ যেন নূতন করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। মনটা কি-একরকম পূর্ণতায় যেন কানায় কানায় ঠেলিয়া উঠিতেছে।

তাহার উপর আজ যাত্রাও হইতেছে সেই রকম। অভিমন্যু যে সাজিয়াছে সে দলের একেবারে নামকরা ছেলে, মাৎ করিয়া দিতেছে। গিরিবালা অবশ্য অত বুঝিতেছে না, তবে প্রায় মেয়ের মতোই সুকুমার

ছেলেটির উপর ইহার বড মায়া বসিয়া গিয়াছে। এই মায়াটুকু তাহার বুকে সংক্রামিত হইয়াছে সুভদ্রার পার্ট হইতে। অমন সদাব্যাকুল, পুত্রগতপ্রাণ মা আর হয় না,—অভিমন্যু না হইলে তাহার যেন কিছুতে স্বস্তি নাই। আজ যেন আরও অধীর,—থাকিয়া থাকিয়া স্বীয় সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "সখি, আজ আমার ডান চোখ নাচে কেন? আমার অভিমন্যু কোথায়? সখীরে, আজ যেন আমার মনে কি হচ্ছে, কেন এমন হচ্ছে বল্ না আমায়, গোপন করিস না....আমার নয়নের মণি অভিমন্যু এখনও আসে না কেন?"

এমন সময়ে ধনুর্বান, বর্ম, আর সাজগোজ হাতে করিয়া একটা গান গাহিতে গাহিতে অভিমন্যু প্রবেশ করিল—

ওমা ও জননী, পূর্ণচন্দ্রাননী,
এই যে অভি তোমার, নাও মা তুলে কোলে,
নাশি অরি কুলে, তোমার আশিস্ বলে,
'মা, মা,' বলে আবার আসব চলে।

গিরিবালা একবার হঠাৎ কাত্যায়নীকে প্রশ্ন করিল—"কেন মেজ-মাসিমা, ডান চোখ নাচলে কি হয়?"

কাত্যায়নী গিরিবালাকে বুকে একটু চাপিয়া বলিলেন—"অমঙ্গল। অভিমন্যু বাঁচবে না কিনা, তাই ডান চোখ নাচছে মায়ের।"

শুনিয়া অবধি মনটা বিষণ্ণ হইয়া আছে। চারিদিকের জাঁকজমক যেন একটু বিস্বাদ ঠেকিতেছে; অথচ বিপদটার জন্য একটা শিশুসুলভ ঔৎসুক্যও লাগিয়া আছে।....সুভদ্রা প্রথমে গানের মধ্য দিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া পরে আবার যথার্থ ক্ষত্রিয়ললনার মতোই পুত্রকে যথাবিধি সাজাইয়া দিল, তাহার পর কারুণ্য, আশীর্বাদ ও বীরত্বের

সমাবেশে খানিকটা বক্তৃতা করিয়া পুত্রকে বিদায় দিল। আসর ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জুড়ি উঠিয়া তান ধরিল—

ওযে পণ করেছে মনে
যাবে রণাঙ্গনে,
কেমনে রুধিবি
ক্ষত্রিয়ে ললনে ?
ওরে কোল থেকে নামায়ে,
বাঁধ মা আপন হিয়ে,
ওর সব বাঁধন ঘুচিয়ে
নিয়তি যে টানে।

অর্থ বিশেষ না বুঝিলেও গিরিবালার মনটা সুরের কাতরানিতে যেন টনটন করিতে লাগিল। কিন্তু পরে অভিমন্যু যে ভাবে সগর্বহুঙ্কারের সহিত শত্রুসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল, গিরিবালার অনেকটা আশা হইল যে ব্যাপারটা সামলাইয়া যাইবে। একবার বলিল—"সবাইকে বেশ মেরে ফেলছে না মেজমাসিমা ?"

মাসিমা বলিলেন—"ফেলবে না মেরে ? কতবড় বীর ছেলে !....চুপ ক'রে দেখ না।"

একে একে সপ্তরথী আসিতে লাগিল, একক সকলেই পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। গিরিবালার মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। মনের আনন্দটা চাপিতে না পারিয়া সাতকড়িকে বলিল—"দেখছিস সাতু কি বীর, উস্ !"

সাতকড়ি ঢুলিতেছিল, তন্দ্রাচ্ছন্ন চক্ষু দুইটিতে চাড়া দিয়া বলিল "হুঁ, উরে ব্বাস্ রে !"

তাহারপর একজোটে সপ্তরথীতে বালক অভিমন্যুকে ঘিরিয়া ফেলিল। আরও ঘোরতর যুদ্ধ, সপ্তরথীদের সকলেই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহার পর অস্ত্রাঘাতে অস্ত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া অভিমন্যু ধরাশায়ী হইল।

গিরিবালার মুখে আশা-নিরাশার একটা আলো-ছায়া খেলিতেছিল এতক্ষণ, সব দীপ্তি যেন নিবিয়া গেল। একবার মাসিমাকে প্রশ্ন করিল —"ও-ই মরে গেল, না ?"

"মরবে না ?—একটা শিশুকে সাতজন মিলে চারিদিক থেকে ঘিরে মারলে !"

তিনি চোখে আঁচলের খুঁট দিতেছেন দেখিয়া আর অন্য প্রশ্ন করিল না।

তাহার পর আসিল কাঁদার পালা—সুভদ্রা যখন আসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নার সঙ্গে গান ধরিল—

"বাপরে অভিমন্যু, রিদয় করিয়া শূন্য
কোন পুণ্যধামে গেলিরে তুই চলে ?
যদি, নিতান্ত কৃতান্ত করবে সর্বস্বান্ত,
কেন আশা দিলি পুনঃ আসিব বলে ?"

গভীর করুণাত্মক পালাটির আলোচনা করিতে করিতে বর্ষীয়সীরা গৃহে ফিরিল। গিরিবালার মনটাও খুব আলোড়িত, সমস্ত রাস্তাটায় আর বিশেষ কিছু কথা কহিল না। বিশেষ বুঝিতেছে না, তবে এই অস্পষ্ট শোক যেন একটা অবলম্বন চায়। আসিয়া লেপে প্রবেশ করিল, মাসিমা তখনও আসেন নাই, মুখ হাত পা ধুইতে গেছেন—গিরিবালা সাতুকে বলিল—"বড় কষ্ট, নয় রে সাতু ?—সব্বাই মিলে মারলে বেচারিকে। আহা !"

সাতকড়ি বলিল—"হুঁ।"

একটু পরে গিরিবালা বলিল—"হ্যাঁরে সাতু, আমার একটা পুতুল রেখে এসেছিলাম হরুর কাছে,—কিছু বলেনি তোকে ?"

সাতকড়ি বলিল—"না তো।"

মাসিমা আসিয়া পড়ায় গিরিবালা আর কিছু বলিল না।

তাহার পর দিন সকালে রসিকলাল আসিলেন এবং বৈকালে ইহাদের লইয়া চলিয়া গেলেন।

ননদভাজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ভাইবোনকে সাজাইয়া দিলেন—দুধের সর দিয়া হাত মুখ মাজিয়া নির্মল করিয়া। মামারবাড়িতে পাওয়া নূতন কাপড় চোপড় পরিয়াছে, তাহার উপর বাড়িমুখো—গিরিবালা ও সাতকড়ি দুইজনেই প্রফুল্ল। তবুও কিন্তু সেই প্রফুল্লতার মধ্যে কয়েকটি বিষণ্ণতার রেখা প্রস্ফুট, বিশেষ করিয়া গিরিবালার। মাসিমা আর মামিমা ঘন ঘন চোখ মুছিতেছেন—গিরিবালা সাহস করিয়া তাহাদের মুখের পানে চাহিতে পারিতেছে না।

সবাই দাওয়ায় একত্র হইয়াছেন। গিরিবালার হাতে একটি পুঁটুলি—এতদিনে যাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছে সব জড়ো করা তাহার মধ্যে।—মামিমার কাছ থেকে পাওয়া একটি পমেটমের পাত্র—অল্প একটু পমেটমসুদ্ধ, একটি গোলাপি রংএর নূতন সাবান, একটা এসেন্সের খালি শিশি, খানিকটা মাথার ফিতা; মাসিমার কাছ থেকে একটি কালো-পাথরের নাড়ু-গোপাল, একটা রাধাকৃষ্ণ নামের পিতলের ছাপ; বিকাশের কাছে একটা পেন্সিল, একটা হাড়ের কলম। এছাড়া কিছু কাচের পুতুল এবং সাতকড়ির কয়েকটা মার্বেলগুলি এবং একটা ব্যাটবল উহারই

মধ্যে আছে। বিকাশ নিজের একখানি ছবিওয়ালা প্রাইজের বইও বোনকে উপহার দিয়েছে, সেটি রহিয়াছে গিরিবালার হাতে।

শাশুড়ি আসিয়া ঘোমটা টানিয়া দরজার কাছটিতে দাঁড়াইলেন, অস্পষ্টস্বরে জামাইকে উদ্দেশ করিয়া অখিলকে কহিলেন—"ওঁকে বল্ অখিল, নিয়ে আসতে মাঝে মাঝে—কোন্ এমন নশোপঞ্চাশ কোশ দূর ? ....মেয়েটা বড় হয়েছে, এখন দেখতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়। আর কতদিনই বা দেখব? ও-ই বা আর কতদিন বাপের বাড়িতে আছে ?"

কাত্যায়নী চোখ মুছিয়া হাসিয়া আরম্ভ করিলেন—"ওমা, তোমাদের আবদারও তো কম নয় ! বাড়ুজ্জেব পায়া ভারি এখন, সম্পত্তির মালিক হ'য়েছে—নিজের সম্পত্তি দেখাতে কি কেউ চট ক'রে...."

শেষ করিতে না পারিয়া মুখে আঁচল গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ভাজও আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া, হঠাৎ অগ্রসর হইয়া গিরিবালাকে বুকে চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ; চাপা ভাঙা ভাঙা গলায় বলিলেন—"জোর ক'রে আসবি গিরি—আমরাও এমন কিছু পর নয়...."

গিরিবালা তাঁর বহুবিস্তৃত জীবনে ভালোমন্দ অনেক কিছুই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলেবেলার ঐ কটা দিনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ যেন আর সবের চেয়ে বেশি করিয়া করিতেন—এই এবারের মামারবাড়ির যাওয়ার ব্যাপারটা। মামারবাড়িও যে এই প্রথম যাওয়া এমন নয়, পূর্বেও গেছেন অনেকবার, পরেও গেছেন, কিন্তু এইবারের উল্লেখ যত করিতেন, আর যত দরদ দিয়া, অন্য কোনও বারেরই ততটা বা তেমন ভাবে করিতেন

না। শৈলেনের বড় কৌতুক বোধ হইত, তাহার পর ভাবিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে।

এই কয়টা দিনের খুব তাড়াতাড়ি ঘটিয়া যাওয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া গিরিবালা এক নবতর জগতের সন্ধান পান, উত্তরকালে তাঁহার জীবন যখন ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে—আত্মীয়-পরিজন, মান, ঐশ্বর্য, সবদিক দিয়াই, তখন যাত্রা আর প্রবাসের অভিজ্ঞতা লইয়া সিমুরের ঐ কটা দিন মনে পড়িয়া যাইত। পৃথিবী যে বেলে-তেজপুরের চেয়ে বড়, এবং তিনিও যে শ্রী আর স্বভাবে সে-পৃথিবীর কিছু পাইবার অধিকারী, শতমুখের আশীর্বাদ আর প্রশংসার মধ্য দিয়া এ-চেতনার উন্মেষ হইয়াছিল সিমুরের ঐ দিনগুলিতে। সেখানে যাহাদের মনের উত্তাপে প্রথম আশা ফুটিয়াছিল, প্রথম আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল—আশা আকাঙ্ক্ষার পরিণতির দিনে সে জায়গার আর সে-সব মানুষের কথা যে না মনে পড়িয়াই পারে না।

সেই সঙ্গে বোধ হয় একটু নিরহঙ্কার অনুকম্পাও ছিল মিশানো।

যখন পড়ার বইএ বাড়ি ঠাসা, পুত্রেরা বিশ্ববিত্যালয়ের উচ্চ সম্মান অর্জন করিয়াছে, নাতি-নাতনিরা স্কুলের বইএর ভারে বিপর্যস্ত,—তিনি নিজে এক বৃহৎ নগরীতে অধিষ্ঠিতা,—যেখানে এক গ্রাম্য জমিদারের আড়ম্বর নিতান্তই নিষ্প্রভ;—এমন দিনের স্মিত মুহূর্তগুলিতে সিমুরের কথা মনে পড়িবে বৈকি, একটু বেশি করিয়াই মনে পড়িবে। বিকাশ-দাদার কৈশোর-সুলভ দম্ভ একটি হাস্যমণ্ডিত প্রীতির স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠিবে বৈকি।

দ্বিতীয় পর্যায়

১

নন্তীদের বাড়ির একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। নন্তীদের পূর্ব-পুরুষেরা বাহিরের কোথা থেকে উঠিয়া আসিয়া এই গ্রামে বসতি করেন। অবস্থা ভালো ছিল না, গ্রামের এক প্রান্তে সস্তা দেখিয়া একটু জমি লইয়া দুইখানি চালা তোলেন। বেশ কিছুদিন যায়, গিরিবালাদের সে-সময়ের পরিবারেব সঙ্গে কি করিয়া সৌহার্দ্য হয় এবং তাঁহাদেরই চেষ্টায় গিরিবালাদের বাডিব নিকটে, সদর রাস্তাটুকুর ব্যবধান দিয়া একফালি জমি লইয়া ইঁহারা গ্রামের মধ্যে বসবাস আরম্ভ করেন। বহুদিনের কথা সে, একেবারে গোড়ার ইতিহাস। তাহার পর কয়েক পুরুষ কাটিয়া গিয়াছে। এ-ক্ষেত্রে যেমন হইয়া থাকে,—কোন পুরুষে থাকে সদ্ভাব, কোন পুরুষে থাকে অসদ্ভাব, কোন পুরুষে হয়তো ঔদাসীন্য; —তবে বর্তমানের, অর্থাৎ এই পুরুষের সম্বন্ধটাকে একটা নাম দিয়া ব্যক্ত করা শক্ত। হয়তো চলেও একটা সংজ্ঞা দেওয়া, কিন্তু সেটা যখন আপনি প্রকাশ হইয়া পডিবে তখন আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। বরং গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে গিরিবালাদের ফিরিবার পরদিনের কথাবার্তা হইতে উদ্ধৃত করিয়া আরম্ভ করা যাইতে পারে—

পরের দিন সকাল বেলায়ই নন্তীর পিসিমা দামিনী পুকুরের ওদিক-কার ঘাট হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন—"কি গো গিরি, মামারবাড়ি থেকে কি সব নিয়ে এলি গো মোট বেঁধে?"

গিরিবালা হাসিয়া বলিল—"অনেক জিনিস পিসিমা, এসো না, দেখবে।"

"মুয়ে আগুন আমার! যাব বললেই যদি যেতে পারতাম তবে তো

আগে পারে যাবারই ব্যবস্থা করতাম। নেপটে প'ড়ে আছি।....তা যাব'খন দুপুরে, সব যেন খেয়ে ফেলিস·নি, পিসির জন্যেও রাখিস দু'টি। জেঠাই কি করছে?"

তখনই কি কাজে হঠাৎ উঠিয়া গেলেন বলিয়া গিরিবালার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হইল না।

দুপুর বেলা আসিলেন, নন্তীকে লইয়া। নন্তীর হাতে একটা নূতন পুতুল, যেন গিরিবালাকে নবৈশ্বর্যশালিনী ধরিয়া লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তৈয়ার হইয়া আসিয়াছে।

জা কোথায় বাহিরে গিয়াছিলেন ; বরদাসুন্দরী ঘুমন্ত শিশুকে পাশে শোওয়াইয়া একটা কাঁথায় ফুল তুলিতেছিলেন। গিরিবালা, সাতকড়ি আর হরিচরণ বর্ধিত সরঞ্জাম লইয়া শিউলিতলার খেলাঘর গোছাইতেছিল।

পিসি আসিয়া ডাকিতে গিরিবালা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বরদাসুন্দরী বলিলেন—"পিসিমাকে পেন্নাম কর, এতদিন পরে এলি ; কী যে হচ্ছেন মেয়ে, খেলা নিয়েই উন্মত্ত!"

"থাক্, হয়েছে"—বলিয়া দামিনী তাহাকে ধরিয়া পাশটিতে বসাইলেন, মুখের দিকে একবার চাহিয়া বরদাসুন্দরীকে বলিলেন—"বলি, হ্যাগা বৌ, তোরা সব কী, মেয়েটাকে একবার ঘুরে দেখিস না?—ক'টা দিনই বা মামারবাড়িতে ছিল?—কিন্তু এরই মধ্যে ছিরি হয়েছে দেখ দিকিন মেয়ের! তারা তো হাতি-ঘোড়াও খাওয়ায় নি, দুধেও নাওয়ায় নি।"

"দুধে নাওয়াবে কি, তাদের নিজেদেরই কোন রকমে জোটে একটু প্রাণধারণের জন্যে। একটু আদর যত্ন পেয়েছে কটা দিন,—মেজদিদি আর বৌদি' গিরির নাম নিতে অজ্ঞান একেবারে। এখানে, কোন দিকটা সামলাই, কাকে দেখি ঠাকুরঝি....দেখতেই তো পাও ; মরবার ফুরসৎ থাকে না।"

দামিনীর মুখে একটা কথা আসিয়াছিল, যেন তুলিয়া রাখিলেন। গিরিবালাকে প্রশ্ন করিলেন—"তা কি কি নিয়ে এলি মামারবাড়ি থেকে ?"

বড় ধামায় করিয়া সঙ্গে যাহা যাহা আনিয়াছিল সব কিছুরই নমুনা একটু একটু করিয়া বাড়িতে গেছে, কথার ভয়ে বরদাসুন্দরী নিজে দেখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। গিরিবালা তালিকা দিতে যাইলে বলিলেন —"ওসব আমি পেয়েছি লো, তোকে আর ফিরিস্তি গুণতে হবে না। তোকে কি দিলে তাই বল।"—একটু হাসিয়া বলিলেন—"ওসব না পেলে তোর মার কিছু আর বাকি রাখতাম নাকি ? তোকে কি কি দিলে ?"

গিরিবালা উৎসাহের সঙ্গে তাড়াতাড়ি খেলার ঘরে গিয়া, মামারবাড়ি থেকে সংগ্রহ-করা জিনিস সব কোঁচড়ে করিয়া হাজির হইল। বরদাসুন্দরী যেন কাঠ হইয়া ঠায় একদৃষ্টে নিচুদিকে চাহিয়া ফুল তুলিতে লাগিলেন। গিরিবালা সম্পত্তিগুলা দাওয়ায় মেলিয়া ধরিলে দামিনী একটি হাসি মুখে পিষিয়া লইয়া একটু মুখটা ফিরাইয়া লইলেন। একটু থামিয়া বলিলেন—"আর যা দিয়েছে না হয় দিয়েছে ; অন্ততঃ একটা পুতুল তো দিতে পারতো ভালো দেখে ছেলেমানুষের হাতে ?...তা তোর মায়ের সামনেই বললাম বাছা, আমি আবার বড় ক্যাটক্যাটি....যা, খেলগে যা।"

বরদাসুন্দরী ঘাড় নিচু করিয়াই বলিলেন—"দুজনের হাতে দুটি টাকা দিয়েছে পুতুলটুতুল কেনবার জন্যে।"

সূচের একটা ফোঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে মুখটা তুলিয়া বলিলেন—"আর, পাবেই বা কোথায় ঠাকুরঝি, তুমিই বলো না ? সংসারটি তো একেবারে ছোট না, উপার্জন করতে ঐ তো একলা দাদা।"

দামিনী বলিলেন—"দেখো গেরো, বউ ভাবলে আমি বুঝি সত্যি

বললাম কথাটা ! মনে একটা কথা এল, ঠাট্টার সম্পর্ক, বলে ফেললাম, তুই রাগ করবি জানলে....”

বরদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—“না. না, রাগ করব কেন ঠাকুরঝি—রাগের কি বলেছ ? আর, যদি তুমি একটা কথা নেয্য ভেবে বলেই থাক, হুট করে রাগ করে বসব ?—কথা উঠল, তাই বললাম অবস্থাটা, তোমার বলায় তো দোষ নেই ?”

এর পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া একথা-সেকথা হইল। দামিনী একবার নন্তীকে বলিলেন—“যা না, খেলগে যা না ; বড়রা একটু বসে কি ছ’টো সুখ-দুঃখের কথা কইছে, হাঁ করে শুনতে হবে ? ঠিক মায়ের অব্যেসটি পেয়েছেন মেয়ে !”

নন্তী চলিয়া গেলে আরও দু’একটা এদিক-ওদিকের কথা তুলিয়া দামিনী বলিলেন—“বৌ, বলব ? কু-ভাবে নিবি না তো ?....না বাছা, পরের কথায় থাকি না, জিগ্যেস করেই বলা ভালো।”

বরদাসুন্দরী এ-সব বাঁধা গৎ-এ অভ্যস্ত, জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি কথা ঠাকুরঝি ? বলবে বৈকি, তুমি বলবে তার আর....”

“না ; নেহাৎ তোর মুখ দিয়ে ফুরসতের কথাটা বেরুল, প্রাণে গিয়ে বিঁধল, তাই বলছি ; আর বেরুতে দোষই বা কি ? নিজের সন্তানের দিকে একবার ফিরে দেখতে পাচ্ছি না, আর দু’টো সংসারের পাট সারতে সারতে নাজেহাল হচ্ছি—এতে কোন্ মায়ের মনেই না আক্ষেপ হয় বল না—মায়েরই প্রাণ তো ? একটা গাইও বিয়োলে বাছুরটাকে চেটেপুটে একটু স্নেহ-আত্তিস্ত দেখায় যে।....বলি, গিন্নি নিজে গেছেন কোথায় টহল দিতে ?”

বরদাসুন্দরী মুখটা নিচু করিয়া আস্তে আস্তে ফোঁড দিয়া চলিলেন।

দামিনী একটু থামিয়া বলিলেন....“কেন, আজকাল তো রসিক দু' পয়সা আনছে।”

বরদাসুন্দরী সেই ভাবেই বলিলেন—“কৈ, দেখি না তো ঠাকুরঝি !”

নেহাৎ একতরফায় সুবিধা হইতেছিল না, দামিনী একটু উৎসাহ পাইলেন। বলিলেন—“দেখবে কোথা থেকে বোন?—বাড়ির দরজা না পেরুতে পেরুতে মা-লক্ষ্মী যে দাদার বাক্সয় গিয়ে ওঠেন। খবর রাখি তো একটু একটু।....লক্ষ্মণভাইয়ের অনেক ভোগান্তি বোন, গোড়াতেই একটু সাবধান হওয়া ভালো।”

বরদাসুন্দরী এবারে আর কিছু বলিলেন না। সেই ভাবেই কাজ করিয়া চলিলেন।

দামিনী একটু থামিয়া বলিলেন—“রসিক তাহ'লে তোকেও কিছু জানায় না দেখছি?”

বরদাসুন্দবী বলিলেন—“কৈ, কিছু বলেন না তো।”

দামিনী মুখে একটা “চ্যু” করিয়া শব্দ করিলেন, বলিলেন—“বলিহারি শাসন ভাই আর ভাজের !”

বরদাসুন্দরী এ-কথার উপরেও কিছু বলিলেন না।

কথা অগ্রসর হইবার বেশ রসদ পাইতেছে না দেখিয়া দামিনী একটু একথা-সেকথা করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—“আসি এখন বৌ, আবার ছিষ্টির পাট পড়ে রয়েছে।”

বরদাসুন্দরী একটা মৌখিক প্রশ্ন করিলেন—“বসবে না ঠাকুরঝি আর একটু?”

“না, এখন আসি বৌ। বসবার কি জো আছে বেশিক্ষণ? মনে করলাম—গিরিটা কতদিন পরে এল, যাই একবার চট্ করে দেখে আসি।”

দরজা টপকাইয়া নিজের মনে বিড-বিড় করিয়া বলিলেন—"বসবে না ঠাকুরঝি ?—ঠাকুরঝির বকে বকে মুখের ফেকো উঠুক, উনি চুপটি করে কাঁথার ফোঁড তুলে যান। মুয়ে আগুন গোমড়ামুখী !"

এ-পুরুষে এক তরফের মনের ভাবটার একটা নিদর্শন দেওয়া গেল। এরূপ ক্ষেত্রে হয় তো ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা হইয়া উভয় পরিবারেই শুভার্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার আবির্ভাব হয়, নয় তো বা শুভার্থীদেরই সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হয় ;—এ-ক্ষেত্রে দুইয়ের মধ্যে একটাও হইতেছে না। তাহারও একটু কারণ আছে এবং নিচের ব্যাপারটুকু থেকে সে-সম্বন্ধে কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে।—

বসন্তকুমারী যেইখানেই থাকুন, খোকার দুধ খাওয়াইবার সময়টিতে ঠিক আসিয়া উপস্থিত হন বাড়িতে। কি কারণে ঠিক বলা যায় না, এ কাজটুকু নিজের হাঁতেই রাখিয়াছেন, বলেন—"তোর হাত বড় কড়া ছোটবৌ, কোন্‌দিন কি করে বসবি! তোর আর ও উবগারটুকু করে কাজ নেই। মা-গিরি ফলাবার ঢের সময় পাওয়া যাবে এর পর।"

সময় হইয়াছে, বরদাসুন্দরী দাওয়ায় নারিকেল পাতা জ্বালিয়া দুধ জ্বাল দিতেছিলেন,—"কৈ রে ছোটবৌ, বলি খোকার দুধ খাওয়ার যে সময় হোল, সে হুঁস আছে?"—বলিয়া বসন্তকুমারী বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, এবং জায়ের যে সে হুঁস একটু বেশি আছে তাহার প্রমাণ পাইয়া লজ্জিতভাবে বলিলেন—"কৈ খোকা?—আমারই বরং ঘোষ-গিন্নির ওখানে একটু দেরি হয়ে গেল। যা গপ্পে মানুষ!"

বরদাসুন্দরী একটু চাপা গলায় ডাকিলেন—"দিদি শোন ; উঠে এসো না ওপরে।"

"কি লো ?"—বলিয়া বসন্তকুমারী উপরে উঠিয়া আসিলেন।

"আজ দামু ঠাকুরঝি এসেছিল, এই খানিকক্ষণ আগে।"

"আসছে তো রোজই, নৈলে ভাত হজম হবে ? তা নতুন কিছু বললে নাকি ?"

"নতুন নয়, কিন্তু পুরনও তো হয় না ব'লে ব'লে।—'তু'টো সংসারের পাট করতে নিজের সন্তানদের দেখে উঠতে পারিস না'....ওর নাম করে—'তার তো আজকাল বেশ পশার হয়েছে—সব টাকা দাদার বাক্সয় ওঠে তো আর দেখবি কি কবে ?'....উত্তর দিচ্ছি না, তবু পাশে ব'সে গজর গজর।....ছেলেপুলেগুলোকে তো সব্বদাই ধোওয়াচ্ছি মোছাচ্ছি দিদি, আর ক্রমাগতই খিট খিট করছি, মাখবে ধূলোমাটি তো কত সামলাবো বলো ? আর এই এক ছাইয়ের ডাক্তারি হয়েছে—যা এক আধ পয়সা হাতে আসবে দাতব্য কবে আসবে—শত্রুদের চোখ টাটিয়ে শুধু ফ্যাসাদ ডেকে আনা।....কী তুজ্জন মনিষ্যি দিদি।—কবে যে কী ঘটাবে !...."

বসন্তকুমারী বলিলেন—"তুই কিছু বলিস নি তো ?"

"দিব্যি দিয়ে রেখেছ তো বলব আব কি করে ? তুলে নাও তো মুখ ছাড়ি একবার, গায়ে যেন বিষ ছড়িয়ে দেয়।....তাই বা করি কি করে ঝগড়া ?—বডঠাকুর, উনি ভাববেন—দেখেছ ?—বৌ-মানুষ হয়ে...."

"দিব্যি আমি কখনও তুলব না বোন, চুপ করেই শুনে যাস। তুই যে-সংসারে আছিস সেখানে ও কিছুই করতে পারবে না। সে-দিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্দি আছি। হাজার ধূলেও কয়লার ময়লা কখনও ঘোচে না ; স্বভাব, কি করবি বল ?"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"আর তোরও যেন কি হয়েছে !—রাগ

করিসই্ বা কেন, আর অত ভয় করাই বা কিসের? আমার তো বেশ লাগে,—যাত্রায় না গিয়ে, বাড়িতে বসেই জটিলে-কুটিলের ভ্যানভ্যানানি শুনি—খরচ নেই, রাত-জাগা নেই। আমি হলে তো আরও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বাড়িয়ে তুলতাম।....চমৎকার লাগে আমার।....'হ্যাঁলা ছোট-বৌ, তিনি রাজ-রাণী নিত্যি টহল দিয়ে বেড়াবেন, আর তোর বরাতে বুঝি দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলা?....ছোটবৌয়ের হাতের রান্না না হ'লে বড় ঠাকুরের মুখে ওঠে না!....বলে নেকি বুদ্ধির ঢেঁকি!...সব ঐ বড় আবাগির কারচুপি, কবে বুঝবি?' ”

দামিনীর ভঙ্গী নকল করিয়া কথাগুলা টানিয়া টানিয়া বলিতে বলিতে বসন্তকুমারী খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বরদাসুন্দরীও না হাসিয়া পারিলেন না। বড-ঠাকুরের তাঁহার হাতের রান্না-প্রিয়তার কথায় চোখের কোণে একটু অশ্রুও চকচক করিয়া উঠিল।

বসন্তকুমারীর রঙ্গ করিবার ঝোঁক চাপিলে সহজে ছাড়ে না। হঠাৎ দীপ্ত মুখে বলিয়া উঠিলেন—“ঠিক হয়েছে রে ছোট-বৌ, আজ রাত্তিরে যাব'খন গতরখাকির ওখানে। তুই উত্তর দিস নি, নিশ্চয় চটে আছে। গেলে নিশ্চয় বলবে—(আবার দামিনীর নিজস্ব ভঙ্গিমা অনুকরণ করিয়া)—

'ওমা, বড়গিন্নি যে! কী ভাগ্যি আমার! কোন দিকে আজ সূয্যি উঠেছে?'

আমি ভালো মানুষের মতন বলব—'ব'লে নাও ঠাকুরঝি জো পেয়ে। পাট সেরে এই দু'পা এসেছি, বলি ঠাকুরঝিকে কদ্দিন দেখিনি, একবার দেখে আসি—এইতেই ছোটরাণির মুখে কত কথা উঠবে দেখে নিও। দেখতেই—দুই জায়ে আছে দিব্যিটি, কিন্তু কী সুখে যে আছি অন্তর্জামীই জানেন।'

(আবার দামিনীর ভঙ্গী সহকারে)—

'তা যদি বললি বড়বৌ তো বলতে হোল।—আজ দুপুরে পাট-সাট সেরে একবার মনে হোল—বড়বৌকে দেখে আসি। ছোট-রাণীকে জিগ্যেস করলাম—কৈ গো, আমাদের বড়বৌকে দেখি না যে?....তা, বানিয়ে বানিয়ে এই এতো কথা—বড়-রাণী রাজ্য তদারকে গেছেন। এই দেখোনা ঠাকুরঝি, দু'বেলা হাঁড়ি-ঠেলা; রাজ্যের ঝঞ্ঝাট, একটু ফুরসৎ নেই যে, নিজের পেটের সন্তানগুলোকেও একবার কাছে ডেকে....' "

পূর্বের চেয়ে আরও জোরে বসন্তকুমারী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর সামলাইয়া লইয়া ভাব ভঙ্গী সব বদলাইয়া বলিলেন—"দে, তোর হোল? দাঁড়া, খোকাটাকে নিয়ে আসি।.... মুখে আগুন পোড়াকপালির, নাম করলেই হাতের কাজ পর্যন্ত ভুলে বসে থাকতে হয়। অতবড় রোগটা হোল, মোলোও না তো?—যমেরও অরুচি!"

এইখানে আর একটি মানুষের কথা বলিয়া রাখি, তাহা হইলেই নন্তীদের বাড়ির আসল পরিচয়টা দেওয়া হইয়া যায়। স্বয়ং কর্তার কথা।

নিকুঞ্জলাল লোকটি অত্যন্ত মৃদু স্বভাবের। আস্তে আস্তে খুব স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া কথা বলেন, বেশ থিতিয়া-জিরাইয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া, আর মানুষ যতটা পারে মিষ্টি করিয়া। একসঙ্গে গড়-গড় করিয়া যে বেশি কথা বলিয়া যাওয়া তাহাও নাই। হাতে প্রায় সর্বদাই একটি হুঁকা থাকে, খানিকটা বলিয়া হুঁকাটা ফর্-ফর্ করিয়া একটু টানিয়া

লন, আবার বলেন; কি বলিয়া গেলেন, ফল কি হইতে পারে যেন সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করিয়া লন, কি বলিবেন তাহাও একবার ভাবিয়া লন—এই মনে মনে ভাঁজা আর পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়া নিকুঞ্জলালের বক্তব্য চলিতে থাকে।

গৃহিণীকে দুয়ারের পাশে না দাঁড় করাইয়া বিচক্ষণ বরের-বাপ যেমন কোন কাজের কথা পাড়েন না, হুঁকা হাতে না করিয়া নিকুঞ্জলালও তেমনি কোন আলোচনা কি মন্তব্যে অগ্রসর হন না; না থাকিলে ত্বরায় আনাইয়া লন। লোকে বলে—নিকুঞ্জলালের হু কাটা সজীব, ফব-ফরানির মধ্যে দিয়া নিয়তই কানে মন্ত্রণা ঢালে।

নিকুঞ্জলালের বৃত্তি ঘটকালি। এটা হইল বংশগত বৃত্তি; নিজেব বুদ্ধি-বৃত্তি দিয়া আবও অনেকগুলি দাঁড করাইয়াছেন। আইন-কানুনে একজন হুঁসিয়ার লোক, জেলার বড় বড উকিল-মোক্তারের নাক কাটেন; প্রায়ই লোকেব দরকার হয় তাঁহাকে, আদালত মাড়ান না এমন দিন খুব কমই যায়। • এমন বুক পাতিয়া জেরার ধাক্কা সামলাইতে খুব কম লোকেই পারে।

মন্ত্রণা ভিন্ন মন্ত্র দেওয়াও আছে। দূরে দুরে—অনেকগুলি যজমান গড়িয়াছেন, স্বকৃতই। আরও কি কি সব আছে, অনুসন্ধিৎসু লোকে এখনও জানিয়া উঠিতে পারে নাই।

ভদ্রাসনটি পৈতৃক। কোঠাটা নিজেই তুলিয়াছেন। সরিকদারের মধ্যে একটি কনিষ্ঠ ভাই ছিল। রোদ-ছায়ার নিয়মানুসারেই এমন-এমন দাদার ভাইয়েদের অনেক সময় একটু ধর্মের দিকে টান হয়। নিকুঞ্জ-লালের কনিষ্ঠেরও একটু ছিল—জপ, সাধুসঙ্গ, তীর্থ প্রভৃতির সুবিধা করিয়া দিয়া ভাইয়ের প্রবৃত্তিকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া নিকুঞ্জ তাহাকে কায়েমিভাবে বিবাগি করিয়া দিয়াছেন। এখন একছত্র মালিক; বয়োজ্যেষ্ঠ কেহ

আসিলে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া বলেন—"আশীর্বাদ করো মতি-গতি ফিরুক, ফিরে আসুক সে।"

গভীর জলের মানুষ—নূতন লোকের পক্ষে চিনিতে সময় লাগে। নিকুঞ্জলালের চরিত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার ওঁর সম্মোহিনী শক্তি। চিনিয়াও আবার লোককে ওঁর কাছে আসিতে হয়;—দায়ে পড়িয়াও, আবার মোহের বশেও।

পরিবারের মধ্যে ঐ বিধবা বড় ভগ্নী—দামিনী, একটি কন্যা,—নন্তী, আর স্ত্রী,—রাইমণি।

স্ত্রীটি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অত্যন্ত ভয়-প্রবণ, নিরীহ, ভালোমানুষ; কথাবার্তা নিকুঞ্জলালের চেয়েও মৃদু এবং মন্থর, তফাৎ এই যে রাইমণির এটা ভয়ে;—সর্বদাই একটা আতঙ্ক, কি বুঝি বেফাঁস বলিয়া ফেলিলেন, কি বুঝি একটা অঘটন ঘটিল!

—অমন স্বামী আর অমন ননদের চাপে যেমনটি হওয়া সম্ভব আর কি। চাপটা অবশ্য ননদেরই বেশি; ননদের আওতায়-পড়া বধূর সম্বন্ধে একটা কথাই চলিয়া গেছে গ্রামে—'রায়বাঘিনির রাইমণি।'

২

বেলে-তেজপুরের দিনগুলি শান্তগতিতে গড়াইয়া চলিয়াছে, কানানদীর মতো। যখন কালেভদ্রে দামোদরের জল নামে, কানানদী একটু জাগিয়া ওঠে, দু'পাঁচদিন তীরের আগাছাগুলো একটু নাড়া খায়; দু'পাশের শিশু মহলে একটু স্নানের হুড়াহুড়ি পড়ে, দু'কুল ব্যাপিয়া একটু যেন প্রাণের সঞ্চার হয়। তাহার পর আবার নদী খাদে নামিয়া যায়,

স্রোত হইয়া আসে মন্থর ; ক্রমে অতি মন্থর—স্রোতের প্রায় কোন চিহ্নই থাকে না ; নিতান্ত তলায় একটা অচঞ্চল স্বচ্ছ জলের ফালি পড়িয়া থাকে—কানানদীর প্রতিদিনের আসল রূপ।

বেলে-তেজপুরেরও এই ইতিহাস। সিংহবাহিনী কি বারোয়ারি তলায় একটা পূজা, কিংবা চৌধুরীদের বাড়িতে একটি বড় কাজ হইলে—গাঁয়ের মধ্যে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়া কিছুদিন আগে এবং কিছুদিন পরে পর্যন্ত একটা স্পন্দন জাগিয়া উঠে, খানিকটা ছুটাছুটি খানিকটা দলাদলি, খানিকটা বকাবকি ; তাহারপর জীবন আবার খাদের বীচিহীন স্বচ্ছ ধারাটিতে নামিয়া আসে,—নাকে চশমা দিয়া আর বাঁহাতে হুঁকা লইয়া নিকুঞ্জলাল মকদ্দমার খাতাপত্র, কি পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠী-ঠিকুজি বিচারে নিজের বাহিরের ঘরে লীন হইয়া থাকেন ; ভগ্নী দামিনী এবাড়ি-সেবাড়ি ঘুরিয়া ভাঙনের মন্ত্র পড়িয়া বেড়ান ; অনুগত হারাণের মাথায় ঔষধের বাক্স চাপাইয়া ফকরে ঘুড়ির পিঠে চাপিয়া রসিকলাল একের বাড়িতে যাহা উপার্জন করেন অন্যের বাড়িতে তাহা বিলাইয়া বেড়ান ; ত্নলালের বৌ 'বামুন ডাক্তার'-এর পথ চাহিয়া একটি-না-একটি শিশুকে বুকে লইয়া দুঃখ, দারিদ্র্য আর মাতৃত্বের শ্রীতে কুটির দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকে। রসিকলালের প্রত্যাশায় থাকেন আরও একজন, কিছু কম আগ্রহের সঙ্গে নয় ;—পণ্ডিতমশাই রাস্তার ধারেই সিমেণ্টের বেঞ্চেটিতে বসিয়া থাকেন, পাশে এক-আধটা খাতা, দু'একখানা বই। খাতার মধ্যে একটা হয়তো রসিকলালের পদ্যের খাতা। পণ্ডিতমশাইকে সংশোধনের জন্য দিয়া গিয়াছেন রসিক, সেই সূত্রে কোন্ লাইনে কি অপূর্ব অর্থ-গৌরব বা ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করিয়াছেন পণ্ডিতমশাই বলিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকেন। আসিলেই দু'জনের মুখেই এমন একটা আলো খেলিয়া যায় যাহার সন্ধান দিবসের কোন মুহূর্তেই অন্য কোন ব্যাপারের

মধ্যেই পাওয়া যায় না। রসিকলাল ঘুড়ির পিঠ থেকে নামিয়া আসেন, এমন হালকা হইয়া যান যে মনে হয় শুধু যে বাহনটিরই ভার লাঘব করিলেন এমন নয় নিজেও যেন মস্ত বড একটা বোঝা পিছনে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। পণ্ডিতমশাই বলেন—“গিন্নির কথা—‘রসিক এলেই তোমার নাওয়া-খাঁওয়া যায় উল্টে, কি যে হয় ছু’জনে বসে!’··· বলি—‘ঐ সময়টুকু আমার প্রতিদিনের জীবনের বানপ্রস্থ,—নিজের কথাও মনে থাকে না, তোমাদের কথাও মনে থাকে না।’····হাঃ—হা—হা····”

রসিকলাল মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু তাঁহার লঘু মন ঠিক ঐ কথাটিতেই সায় দেয়—প্রতিদিনের বানপ্রস্থ—প্রতিদিনের বানপ্রস্থ—সংসার-মুক্ত কয়েকটি নির্মল, সৌম্য মুহূর্ত—বানপ্রস্থ যে স্বর্গের কাছাকাছি।

আরম্ভ হয় কবিতার আলোচনা—“তুমি যে কি ক্ষতিটাই করেছ লেখা পড়া বন্ধ ক’রে দিয়ে! এইসব ভাব কি সচরাচর চোখে পড়ে আজকাল? এগুলো প্রতিভার ক্ষণিক স্ফুরণ—বিদ্যুতের এক একটা ক্ষণিক বিকাশ—বুঝতে হবে পিছনে একটা মস্ত বড় শক্তি আছে; তা তুমি নিজেও চিনলে না নিজেকে, কেউ চিনিয়েও দিলে না। এই যে পেয়েছি শোন····”

বেড়ার পাশে ঔষধের বাক্সের পিঠে হারাণের তবলার বোল মৃদু হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে থাকে। তন্ময় হইয়া মাথা নাড়িয়া একলাই চালাইতেছে। প্রভুর চেয়ে আরও সৌভাগ্যশালী—তাহার বানপ্রস্থ একেবারে হাত-ধরা; বাক্সটা লইয়া একটু তফাতে বসিতে পারিলেই হইল।

বেলে-তেজপুরের জীবনের স্রোতে এই সব রেখার পাশে আরও অনেক রেখা ফোটে, সব এমনই মন্দগতি, অচপল।

কাব্যের সঙ্গে গিরিবালারও আলোচনা হয়। পণ্ডিতমশাই প্রশ্ন করেন—"শিবপূজোটা তো করে যাচ্ছে নাতনি? না, লক্ষ্য রেখো।"

আলোচনাটুকুতে একটা বেদনার স্থর থাকে। গৌরীদান হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই আর। পণ্ডিতমশাইকে সংকল্পটা জানাইবার পর বহুদিন চলিয়া গেছে। তখন গিরিবালার বয়স ছিল আট বছরে মাস দুয়েক বাকি, এখন নয় বৎসরের প্রায় অতটাই কাছাকাছি আসিয়া গেছে। মজার কথা এই যে, এসম্বন্ধে আলোচনা প্রায় রোজই চলিলেও, যখন প্রকৃতই দু'একটা পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল গৌরীর বয়সের সঙ্গে 'অষ্টবর্ষে'-র আর বিশেষ কোন সম্বন্ধই নাই।

এখন গিরিবালার বিবাহের উল্লেখ মাত্রেই একটি নৈরাশ্যের স্থর থাকে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যেদিন এই তথ্যটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়, প্রথম আঘাতের স্তব্ধতার পরেই দু'জনেই হঠাৎ বেশি রকম মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন—যেন কি একটা দুর্ভাবনা নামিয়া গেল। পণ্ডিতমশাই সান্ত্বনা হিসাবে বলিয়াছিলেন—"এর জন্যে তুমি খেদ রেখো না রসিক। ভেবে দেখো না, আজকালকার একটা আট বছরের মেয়ের সঙ্গে আগেকার আট বছরের মেয়ের তুলনা চলে? যুগটা কি যাচ্ছে দেখতে হবে তো? না, এইবার এসো, একটু কোমর বেঁধে লাগা যাক; ও তোমার এক-আধ বছরের এদিক-ওদিকে কিছু যাচ্ছে আসছে না; যুগটা দেখতে হবে যে গো!"

রসিকলাল উৎসাহের সঙ্গেই বলিয়াছিলেন—"হ্যাঁ, আমরাও চেষ্টা করি, ওদিকে দাদাও নিকুঞ্জদাকে বলে রেখেছেন।"

নিকুঞ্জলালের নামে পণ্ডিতমশাইয়ের মুখটা একটু শুকাইয়া গিয়াছিল, প্রশ্ন করিলেন—"নিকুঞ্জের পরামর্শ তোমার দাদা নেন নাকি বেশি?"

তখনই সে-ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলেন—"তা ভালোই তো,

নিকুঞ্জ হ'ল যাকে বলে জাত ঘটক। দেখুক না। তবে কি জান?—আত্মচেষ্টার মতো কিছুই নেই ; দাঁড়াও, তোমাদের হেডমাষ্টারমশাই যে কি ইংরিজিটা বলতেন—হ্যাঁ—মাই গুড্ রাইঠ্যাং·· ঠ্যাং না কি বলতেন আমার ঠিক মনে নেই বাপু, তখন করে নিয়েছিলাম মুখস্থ।"

গৌরীদানের বয়স পারাইয়া যাওয়ায় মনটা প্রসন্ন ছিল বলিয়া নিকুঞ্জঘটিত ব্যাপারটাকে সেদিন বেশি আমল দেন নাই।

গিরিবালার শিবপূজার একটু ইতিহাস আছে। সেবার সিমুর থেকে ফিরিয়া শিবপূজা আরম্ভ করিয়াছিল ; আত্মচেতনার সঙ্গে এবং তাহারই পাশে পাশে একটা বৃহত্তর জগতের সহিত পরিচয়ের সঙ্গে, এক ধরণের উচ্চাশা জাগিয়াছিল মনে,—হওয়ার মধ্যে দিয়া, পাওয়ার মধ্যে দিয়া—আত্মোপলব্ধির একটা কৈশোর বাসনা। কি হওয়া, কি পাওয়া ঠিক বোঝা যায় না—চিত্রের রেখা খুবই অস্পষ্ট, কিন্তু অস্পষ্ট বলিয়াই আরও মোহন।—শিবঠাকুর সব দেন, বেশ ঘরোয়া ঠাকুরটি, পূজারও বিশেষ কোন হাঙ্গাম নাই। মাটির ছোট তালটিকে মাঝখানে একটু টিপিয়া টুপিয়া মাথায় ছোট একটি গুলি বসাইয়া দেওয়া। তাহার পর এক মুঠা বিল্বপত্র আর গোটাকতক ধুতুরার ফুল, ব্যস্। বরাৎগুণে কোন দিন যদি একটু গঙ্গাজল জুটিল তো মনে হয় ঠাকুর যেন সমস্ত পৃথিবীটা হাতে তুলিয়া দিতে পারেন। চমৎকার ঠাকুর ; গিরিবালা তো গল্প শোনে জেঠাইমার কাছে—ভক্তকে রাজা করিয়া বেড়ান অথচ এদিকে নিজে ভিখারি! এমন আত্মভোলা ঠাকুরের উপর দয়াও হয় খানিকটা। দুইটা ধুতুরা বিল্বপত্র না দিলে মন কেমন করে যেন।

গিরিবালা এদিকে বরাবর পূজা করিয়া যাইতেছিল, তারপর গেল একবার মামারবাড়ি। সেকালের মেয়েরা প্রায় এই বয়সে করিত ঐ পূজাটা, কেহ আশ্চর্য হইল না। মামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁলা,

পূজো করিস, তা মন্তর-টন্তর কিছু জানিস? না, শুধু—'আমি ঠাকুর হাবলা গোবলা, ফুল খাও খাবলা খাবলা ?"

গিরিবালা জেঠাইমার কাছে শেখা মন্ত্রটা যথা-অশুদ্ধি বলিয়া গেল—

ধ্যায়ে নৃত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্র বতাংসং
রত্নকল্পো জলং ঘং পরশুমৃগবরা ভীতিস্তং....

মাসি বলিলেন—"বেশ, এই তো দিব্যি শিখেছিস। পূজোর পরে বর চাস তো ?—মানে, পূজোর শেষে বলিস তো—ঠাকুর আমায় অমুক জিনিসটা দাও, আমি এইটে চাই, আমি ঐটে চাই ?....কি বলিস শুনি তো ?"

গিরিবালা দুই হাতের আঙ্গুলে একটা মুদ্রা সৃজন করিয়া বলিল—" 'নমঃফট্' বলে এমনি করে ধ'রে শুইয়ে দিই।"

কাত্যায়নী বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"ব্যস্!" তারপর খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"ও পিসিমা, শোনসে তোমার নাতনিকে শিবঠাকুর কি রকম ঠকিয়ে রোজ পূজো আদায় করে যাচ্ছেন! ফুল বিল্বিপত্তোর নিয়ে 'নমঃ ফট্" বলে শুয়ে পড়েন, না হয় বর দিতে, না হয় কিচ্ছু। একি বাপু—ছেলেমানুষকে ওমনি-ওমনি খাটিয়ে নেওয়া !"

গিরিবালার রাঙাদিদিমাও শুনিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"পূজো, মন্তর ঠিকই আছে, ওর জেঠাইমা কি ভুল শেখাবে? তবে, আইবুড়ো মেয়ের পূজো, আর একটু জুড়ে দিতে হয়।....বলবি—"শিবের তুল্যি বর দাও, নারায়ণের ঘর দাও।"

পিসি চলিয়া গেলে কাত্যায়নী গিরিবালাকে বুকে জড়াইয়া, যেন নিজের বুকে সঞ্চিত সব তৃষ্ণা ঢালিয়া বলিলেন—"শুনলি? সব চাইবি, আরও চাইবি, ছেলে দাও, মেয়ে দাও, নাতি দাও, নাতকুড় দাও।

চাইবি বুড়োর কাছে, তোর মতন মেয়েকে দেবে না তো কার জন্যে রেখেছে সব ?....সবাই কি কাতি আবাগি ?”

শিব পূজার এই গূঢ় উদ্দেশ্যটি বোঝা পর্যন্ত, গিরিবালা লজ্জার বশে পূজা পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। মা জেঠাইমা মাঝে মাঝে ঝোঁক হইলে তাগাদা দেন, রসিকলালও বলেন। গিরিবালা কর্মের অজুহাতে এড়াইয়া চলে।

এক বৎসরের পূর্বের গিরিবালার চেয়ে এক বৎসরের পরের গিরিবালা একটু আলাদা হইয়া পড়িয়াছে নানা দিক দিয়াই। শৈশব আর কৈশোরের সেতুরূপে খেলাঘরটা ছিল, সেটাও গিরিবালার জীবন থেকে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। এ বিচ্ছেদটা ভালো করিয়া ঘটাইল হরিচরণ। ঘটনাটি কিছুদিন পূর্বের এবং বেশ একটু কৌতুকপ্রদ।

সেই হাতভাঙ্গা পুতুলটির হাজার খোঁজ করিয়াও সন্ধান মেলে নাই ; তবে পুতুল-সম্পদে গিরিবালা এখন বেশ সম্পন্ন। যদিও রমেশের দোকানের মোমের পুতুলটি বাপ আর মেয়ের জল্পনার মধ্যেই রহিয়াছে, তবু মামারবাড়ি থেকে অনেকগুলি সংগ্রহ হইয়াছে, এদিক-ওদিক থেকে আরও কয়েকটা আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ছেলে-মেয়ে বৌ-জামাইয়ে বাড়িটি গমগমে।....হরিচরণও একটু মানুষের মতো হইয়া আসিতেছে, মামা ছাড়া অন্য দু'একটা ভূমিকাও করে মাঝে মাঝে....কখনও গুরুমশাই হইয়া একটু দূরে কৃষ্ণচূড়ার তলে পাঠশালা খুলিয়া বসে—গিরিবালার বাড়ির, নন্তীর বাড়ির ছেলে-মেয়ে লইয়া বেত আছড়ায়। কখনও হয় ডাক্তার, কখনও বা আর কিছু। আজকাল আসল সংসারে গিরিবালার একটু বেশি খাটিতে হয় ; তবু ফুরসৎ পাইলে যখন খেলা-ঘর পাতে তখন জমে ভালো।

একদিন নন্তীর মেয়ের সঙ্গে গিরিবালার ছেলের বিবাহের যোগাড়-

যন্ত্র চলিতেছে। পুতী মামারবাড়ি হইতে বেড়াইতে আসিয়াছে; তাহার আসাটা এই বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়াই এইরূপ ধরিয়া লওয়ায় খেলাটা একটু বেশি করিয়াই জমিয়াছে। পুতীর মামারবাড়ি সহরে, মামারাও বেশ অবস্থাপন্ন, এই সব কারণে সমবয়সীদের মধ্যে সে একটু খাতির পায়ও বেশি, আর মাঝে মাঝে দু'একটা নূতন ধরণের কথা বলিয়া খাতির আদায়ও করিতে জানে বেশ।

সব ঠিক, বর বাহির হইবে; হরু পুরুত, পূজার-ঘর থেকে কিছু উপচার সরান যায় কিনা দেখিতে গিয়াছে, এমন সময় নন্তী কাঁদ-কাঁদ হইয়া আসিয়া বলিল—"গিরিদিদি ভাই, সব্বনাশ হয়েছে, খোকা মেয়ের কি করেছে দেখোসে!"

খোকা হরিচরণের ছোটটি; দুলিয়া দুলিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে, সুযোগ পাইলে অনিষ্ট-সাধনে বেশ তৎপর।

গিয়া দেখা গেল পুতুলের মুণ্ডুটি তাহার হাতে। নন্তী সব ঠিক করিয়া কৌতূহলবশে একটু বরের বাড়ির সরঞ্জাম দেখিতে আসিয়াছিল, ফিরিয়া গিয়া দেখে—এই কাণ্ড। দিদি যাইতেই খোকা জবাবদিহি হিসাবে বলিল—"ছাছি!" অর্থাৎ শাশুড়ি।

"রাক্কুসে ছেলে!" বলিয়া গিরিবালা একটু মৃদু তিরস্কার করিল বটে, কিন্তু ক্ষতিটা সহিয়া যাইতে হইল, কেননা খোকাকে কাঁদাইলে জেঠাইমা খেলা বন্ধ করিয়া দিবেন। এক-পয়সানে মাটির পুতুল মাঝে মাঝে অমন একটা যায়ই, তাহা ভিন্ন শেষ মুহূর্তটিতে অমন একটা দুর্ঘটনা ঘটাইয়া খেলাটাকে প্রায় সত্যের কাছাকাছি আনিয়া দিয়াছে খোকা, এক দিক দিয়া লাভই।

গিরিবালা অতঃপর কি করা যায় চিন্তা করিতেছিল, পুতী মুখটা গম্ভীর করিয়া নন্তীকে বলিল—"তোমার ঘরের কথা আমরা বুঝি না

ভাই, আমাদের এককাঁড়ি খরচ হয়ে গেছে, এখন পাবই বা কোথায় মেয়ে আমরা ?"

পুঁতীরই পরামর্শে নন্তী বরের মার বিস্তর হাতে পায়ে ধরিল এবং তাহারই পরামর্শে শেষ পর্যন্ত একটা রফাও হইল ;—নন্তীর মেয়ের সঙ্গে যে ঝি আসিবার কথা ছিল, তাহাকে কনে সাজাইয়াই আপাতত বিবাহ দেওয়া স্থির হইল। পুঁতী বলিল—"নৈলে যে দাঁড়িয়ে অপমান হই আমরা সমাজের কাছে ভাই ; এ পাড়াগাঁ নয়, সহরের সমাজ, জান না তো তোমরা।"

গিরিবালা কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল—"ভাগ্যিস বোন-পো ভেবে এসেছিলি পুঁতী, একটা সমিস্তে মিটিয়ে দিলি, আমার তো মাথা গুলিয়ে গেছল একেবারে।"

বিবাহ আরম্ভ হইয়া গেলে গিরিবালা হরুকে বলিল—তুই পুরুতের কাজটা সেরে নিয়ে ডাক্তার হবি ; মেয়েটার চিকিচ্ছে করতে হবে তো ?"

পুঁতী আবার মুখটা গম্ভীর করিয়া বলিল—"তা করতে হবে না ? একে বিয়ে হোল না, তার মুণ্ডু গেল—এক সঙ্গে দু'টো চোট সইতে পারে ছেলেমানুষ ?"

খেলা ভাঙিবার পর ভাঙা পুতুলটা হরিচরণের জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল।

হরু ছেলেটি বেশ চালাক। ছোট হইলেও তাহার সব কাজেই মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দিদির খেলাঘরের ডাক্তারপদের গৌরব লাভ করিবার সুযোগ অনেকবার হইয়াছে বটে, কিন্তু কখনও এত বড় সার্জারির কেস্ হাতে পড়ে নাই। সমস্ত দিন সে বড় অন্যমনস্ক

হইয়া রহিল, গতিবিধিটাও যেন একটু ছমছমে। তাহার পরদিন যখন আবার খেলা আরম্ভ হইল, হরুর ডাক্তারি দেখিয়া সবার, এমন কি সহরবাসিনী পুতীরও তাক লাগিয়া গেল। পুতুলের গলাটি ধড়ের সঙ্গে পরিপাটি করিয়া জেয়ল-আঠা দিয়া জুড়িয়া এমন ভাবে ব্যাণ্ডেজ করিয়াছে যে মনে হয় যেন হারাণের হাতের কাজ। আগে তো উহারা বিশ্বাসই করিল না; যখন হরু শপথ খাইল এবং হারাণের কাছে ভজাইয়া দিবার জন্য লইয়া যাইতে চাহিল, তিনজনে পরম বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের পানে চাহিল। পুতী বলিল—"সহরে এক সায়েব-ডাক্তারের কথা শুনেছি, হরু দেখছি...."

শেষ করিতে না দিয়াই নন্তী আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল—"গিরি দিদি, এবার থেকে হরুকে সায়েব-ডাক্তার করতে হবে, কি বলিস?"

গিরিবালা বলিল—"নিজের ভাই বলেই বলছি না, সায়েব-ডাক্তারেও এমন করে পারে না। এক খালি যে গণেশের গলায় হাতির মুণ্ডু বসিয়েছিল সেই পেরেছিল—রাঙাদিদিমার কাছে গপ্প শোনা,—কি নামটা ভুলে যাচ্ছি যে....। জেঠামশাইকে বলব'খন—তোকে ডাক্তারি পড়াতে হরু!"

নন্তী বলিল—"রসিক কাকার চেয়ে বড় ডাক্তার হবে হরু, উঃ।"

গিরিবালা বলিল—"বাপ হ'ন, ও-কথা বলতে আছে?"

পুতী বলিল—"বাপ যে আবার গুরুজন রে।"

নন্তী প্রশ্ন করিল—"পটিটা যখন খুলবি তখন জোড়টা আলগা হয়ে খুলে যাবে না তো রে হরু?"

হরিচরণ একহাতে পুতুলটা লইয়া, একহাত কোমরে দিয়া দর্পিতভাবে তিনজনের কথা শুনিতেছিল, ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল—"কি রকম বোকা! খুলে গেলেই হোল? খালি পটি বেঁধেছি নাকি?"

গিরিবালা বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"আর কি করেছিস রে ?"

নন্তী প্রশ্ন করিল—"আটার কথা বলছিস বুঝি ?"

হরু একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল—"হ্যাঁ।"

গিরিবালা প্রশ্ন করিল—"কিছু মিশিয়েছিস বুঝি আটার সঙ্গে ?"

পুতুলের গলার কাছে নাকটা লইয়া গিয়া আঘ্রাণ লইয়া বলিল—"হ্যাঁ রে! পাথর-কুঁচির পাতা বেটে দিয়েছিস,—না ?—গন্ধ পাচ্ছি।"

তাহার পর পুতী আর নন্তীর পানে চাহিয়া বলিল—"হরুটা জানে সব রে! হাড় জোড়ার অমন ওষুধ আর নেই কিনা।"

হরিচরণ আরও দর্পিতভাবে স্মিত হাস্য ঠোঁটে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খেলাটা খুব জমিল সেদিন। এমন বিচক্ষণ ডাক্তার হাতে পাইয়া পুতী আর গিরিবালার ঘরে পাঁচটি ও নন্তীর ঘরে তিনটি ঝপাঝপ অসুখে পড়িয়া গেল; কাজের বাড়িতে এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপারও নয়। তবে এপিডেমিকের একঘেয়েমি নয়, রকমারি অসুখ। পটির লোভে পুতী নিজের একটা কাচের পুতুলের একটা পা পর্যন্ত ভাঙিয়া দিল, ডাক্তার-ভাইয়ের ব্যাণ্ডেজসুদ্ধ মামারবাড়ি লইয়া যাইবে, সবাইকে দেখাইবে; সেখানে আবার বাপের বাড়ির বড়াই শোনাইবার লোক আছে তো ?

দুপুরের অনেক আগেই রসিকলাল বাড়ি ফিরিলেন এবং প্রবেশ করিয়াই হৈ-হৈ লাগাইয়া দিলেন—"আমি আর ও-ব্যাটা নাপতের-পোকে কখনও রাখব না। এই প্রথম বার নয়, কয়েক বারই হয়েছে, যতই সয়ে যাচ্ছি, ততই বাড়াবাড়ি হচ্ছে, যতই সয়ে যাচ্ছি, ততই····"

বসন্তকুমারী বাহিব হইয়া আসিলেন, বিস্মিতভাবে কহিলেন—"বলি ব্যাপার খানা কি? আজ আবার এ মূর্তি কেন?"

রসিকলাল বলিলেন—"আমি বলে দিচ্ছি, ও-বেটা ঠিক আমাব ঘাড়ের ওপর দিয়ে প্র্যাকটিস লাগিয়েছে। নরুন চালাতে জানে বলে নিজেকে ভাবেই একটা মস্তবড সার্জেন, এবার আমার পুঁজি ভেঙে তলায় তলায় ওষুধেও হাত পাকাচ্ছে।....তাইতো বলি—হাবাণ-কম্পুণ্ডাবেব এত খাতির বেড়ে যায় কোথা থেকে দিন দিন!—যখনই দেখ, একপাল লোক চারিদিকে...."

বসন্তকুমারী বলিলেন—"ব্যাপারখানা কি আগে তাই বলো না।.... হারাণে!"

হারাণ ঘুড়িটার গলায় ঘাসের থলেটা বাঁধিয়া দিয়া 'হিস্-হিস্' করিয়া ডলাই-মলাই করিতেছিল, কতকটা নির্লিপ্ত কণ্ঠেই উত্তর করিল--"এসছি বড়মা, ঘুড়িটাকে একটু ঠাণ্ডা করে; অবোলা জীব, মনে মনে শাপমণ্যি দিলে সইবে না;-বামুন না হোক, এর শাপমণ্যিগুনো সত্যিকারের শাপমণ্যি হবে কিনা।"

রসিকলাল আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, ভাজকে সাক্ষী রাখিয়া বলিলেন —"শুনে নাও হারামজাদার কথাগুনো!—আমি মিথ্যে বলছি, সত্যিবাদী হোল ঐ একটা ফকরে ঘুড়ি! দাদা কিছু বলবেন না, হয়ে উঠেছে ওর কথাগুনো ঐরকম চ্যাটাং-চ্যাটাং আজকাল।....মিথ্যে কথা বলছি আমি! —তাবৎ ওষুধের নাম ওর মুখস্থ, না ঘাঁটাঘাটি করলে হয় কি করে? তক্কে তক্কে থেকে আজ অ্যাদ্দিন পরে হদিস পেলাম,—দাঁয়ের বৌকে ওষুধ দিতে গিয়ে দেখি শিশি খালি! নরেনের ছেলেটাকে ওষুধ দিতে গিয়ে দেখি শিশি খালি! স্বরূপের বৌটাকে ওষুধ দিতে গিয়ে দেখি শিশি আদ্দেকটা খালি! তখন বাক্সটা আরও ভালো করে মিলিয়ে দেখি আর

তিন চার খানা শিশির ঐ দশা, কোনটা একেবারে খালি কোনটা আদ্দেক! রোগা দেখে বেড়াব কি, রাগে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে গেল। দাদা এসে ওকে আগে বিদেয় করুন, নৈলে আমার দ্বারা আর····"

এমন সময় বরদাসুন্দরী ঘোমটা টানিয়া লঘু পদে রান্নাঘর থেকে নামিয়া আসিলেন, বসন্তকুমারীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—"দিদি, রান্নাঘরে দেখোসে কি কাণ্ড!"

"বেড়ালে সব মাছ নিয়ে গেল তো?—তোর যেমন····"

"দেখোইসে না।" বলিয়া বরদাসুন্দরী তাঁহাকে এক রকম টানিয়াই লইয়া চলিলেন।

"যেমন দেবা তেমনি দেবী! খুলে বল, তা নয়····" বলিতে বলিতে বসন্তকুমারী অগ্রসর হইলেন।

সেই কবন্ধ পুতুলটি, যেটিকে হরিচরণের চিকিৎসাধীনে রাখা হইয়াছিল; আবার ধড় আলাদা আর মুণ্ড আলাদা হইয়া পড়িয়াছে। ধড়ের দিকটা গলার নিচেই পুতুলের বুক আর পেট লইয়া বেশ একটা বড় গর্ত;—গর্তটির সমস্তটা হোমিওপ্যাথির শাদা শাদা ক্ষুদ্রাকার চিনির গুলিতে ভরা!

বরদাসুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভাইয়ের ডাক্তারির কথা গিরি ফলাও করে বলতে এসেছিল—ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে। অত কি জানি দিদি? ভাবলাম সত্যি বুঝি তেমনি কোন আটা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে—দেখিতো। হরু 'হাঁ-হাঁ' করতে করতেই একটা টান দিয়ে ফেলেছি, দেখি এই কাণ্ড!"

চাপা হাসিতে দুই জায়ে লুটোপুটি খাইবার দাখিল। বসন্তকুমারী সামলাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় গেল দু'টোতে?"

"আর থাকে ?" বলিয়া বরদাসুন্দরী কহিলেন—"ব'লে দেবে না কি দিদি ? কিন্তু না বললেও যে ওদিকে নিরীহ হারাণেটা বকুনি খেয়ে সারা হয় ; বড়ঠাকুর এসে বোধ হয় ছাড়িয়েও দেবেন।"

"রোস্"—বলিয়া বসন্তকুমারী পুতুলের খণ্ড দুইটি কাপড়ের ভিতর লইয়া উঠানে নামিয়া আসিলেন, গম্ভীরভাবে দেবরকে বলিলেন—"তোমার দ্বারা না হয় ছেড়ে দাও, তার জন্যে আর অত চোখরাঙানি কেন ? ডাক্তারি করবার ঢের ভালো লোক আছে।"

হঠাৎ এই পরিবর্তিত ভাব দেখিয়া রসিকলাল একটু বিমূঢ় ভাবে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"ব্যাপার কি বল দিকিন ?"

"ঐ তো বললাম।"

রসিকলাল রাগিয়া উঠিলেন—"বলো বলছি বৌদি, একে আমার মাথার ঠিক নেই....."

"তবে চুপ করতে হ'ল—মাথা না ঠিক হওয়া পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়।"

"আঃ, বৌদি বলো বলছি।"

"তার আগে কথা দিতে হবে, শুনে মাথা ঠিক রাখবে, কোন গোল-মাল করতে পারবে না।"

তাহার পর পুতুলের ভিতরকার গ্লোবিউলগুলা হাতে ঢালিতে ঢালিতে কপট গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন—"হরু বেঁচে থাক্, কে তোমার আর তোয়াক্কা রাখে গা ? কি পাকা কাজ,—ব্যাণ্ডেজ, তার ওপর এক পেট ওষুধ !...."—বলিতে বলিতেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"আমি ওকে আর আস্ত রাখব না, কোথায় সে ?"—বলিয়া

রসিকলাল অগ্রসর হইতেছিল, বসন্তকুমারী বলিলেন—"কথা দিয়েছ, কিছু বলবে না। আমার মাথা খাও।"

হারাণ আসিয়া উঠানের দরজার নিচে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—"হারাণে তো যাচ্ছেই। এ মিছে গঞ্জনার চেয়ে না খেতে পেয়ে মরাও ভালো। তবে যাবার আগে একটা হক্ কথা বলে যাই, বলি—কি অন্যায়টাই বা হয়েছে যে মার খেতে যাবে, হক ঠাকুর? ওষুধগুনো কোন রোগীর পেটে গেলেই বা কী রাজা ক'রে দিতো? রোজ তো কাঁড়ি কাঁড়ি যাচ্ছেই, বাড়ি ঢোকার সময় পকেট যে ঢন্‌ঢন্ সেই ঢন্‌ঢন্।"

৩

মাসের পিঠে মাস, ঋতুর পিঠে ঋতু, এই করিয়া দিন বহিয়া যাইতেছে। গিরিবালা দশ ছাড়াইয়া এগারর পানে পা বাড়াইয়াছে, এবং নিজের অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে খেলার ঘর ছাড়িয়া আসল ঘরগুলিকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। একটি যেন পবিত্র, নির্মল চন্দ্রোদয়, —চন্দ্রমা ধীরসঞ্চারে নিজেকে স্পষ্টতর ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন, আর স্নিগ্ধ আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

জেঠামশাইয়ের সমস্ত সেবার ভার এখন গিরিবালার হাতে, একটির পর একটি করিয়া কেমন করিয়া যে চলিয়া আসিয়াছে কেহই জানে না। বাবার সেবার হাঙ্গাম নাই বড় একটা, একে আত্মভোলা মানুষ, তায় বাহিরেই বেশি থাকেন এবং অভাবও কম, তবু উহারই মধ্যে গিরিবালার বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রসিকলালের জীবনে যেন একটু শৃঙ্খলা আসিয়াছে। দুপুরের আহারের সময়টা অনেকটা নিয়মাধীন হইয়াছে।

বারোটা বাজিলেই মনে পড়ে তেল গামছা ঠিক করিয়া একটি কচি মেয়ে প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, যতই বিলম্ব হইতেছে ততই গোছানো জিনিস আবার ঝাড়িয়া গোছাইতেছে—পাটকরা গামছা আবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পাট করিতেছে, কোঁচানো কাপড় আবার খুলিয়া কোঁচাইতেছে —প্রয়াসের সঙ্গে মুখখানি এদিক ওদিক হেলিয়া পড়িতেছে ; জেঠামশাই ছোট ছোট দুইটি মাকড়ি গড়াইয়া দিয়াছেন,—চাঞ্চল্যে ঝিকমিক করিতেছে ; দিন তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিতেছে, বাহিরে আসিয়া পথের খবর লওয়া তো প্রায় মিনিটে মিনিটে।.... দুপুরের পর আর দেরি করেন না রসিকলাল—চিকিৎসায় ক্রমাগতই ভুল হইয়া পড়ে।

দুই ভাইয়ে এক সঙ্গে খাইতে বসাটা আজকাল আর তত বিরল ঘটনা নয়। গিরিবালাও সঙ্গে সঙ্গে বসে, একটু দেরি হইলে জেঠামশাই হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেন, ডাক দেন,—"আয় গিরি, ভাতের সামনে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না।"

গলা নামাইয়া বলেন—"যাবে কিনা, আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াচ্ছে।"

বসন্তকুমারী কথার সূত্রটা তুলিয়া লন, কখনও কখনও সূত্র না থাকিলেও নিজে পাড়েন কথাটা—"বলি, হ্যাগা, এখন দুই ভাই রয়েছ, বলি, চলবে এরকম নাকে তেল দিয়ে শুয়ে থাকলে?....বলি, হ্যা ঠাকুরপো ?"

জ্যেষ্ঠ সুযোগ বুঝিয়া বোঝাটা কনিষ্ঠের উপর চাপাইয়া দিয়া নিজের গা বাঁচাইবার চেষ্টা করেন ; কালক্ষেপ না করিয়া বধূকে সাক্ষী রাখিয়াই বলেন—"তা বুঝি জান না ?—মেয়ে ওঁর গৌরী, মহাদেব আপনি এসে...."

বসন্তকুমারী সঙ্গে সঙ্গেই নাক নাড়া দিয়া ওঠেন, বলেন—"তুমি বড়

আর ও গিয়ে নিজের মেয়ের জন্যে পাত্তোর খুঁজে বেড়াবে!—কি করে বের করলে কথাটা মুখ দিয়ে? বলিহারি!"

অন্নদাচরণ ঝামটাটা খাইয়া অপ্রস্তুত হইয়া যান, ভারিক্কে হইবার চেষ্টা করিয়া বলেন—"আমি! আমি বসে আছি নাকি? হুঁঃ, জিগ্যেস করগে গিয়ে নিকুঞ্জদাকে, এমন দিনটি যায় না, যে দিন না ..."

গিরিবালা আসিয়া না পড়িলে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাগাদা দেন—"কৈ গো গিরি, কতক্ষণ আর...."

কথাটা একেবারে সত্য না হইলেও নিতান্ত মিথ্যাও নয়। নিকুঞ্জলালকে ওদিকে দু'একবার বলিয়াছিলেন—এখন উল্টা তাগাদা ঠেকাইতে ঠেকাইতে প্রাণান্ত হইতেছে। নিকুঞ্জ প্রায়ই পাত্রের সন্ধান দেন—"পঁচিস বিঘে জমি, এক গোয়াল গরু....একটু বয়েস হয়েছে ছেলের... তা ছেলের আবার বয়েস, তুমিও যেমন! হ্যাঁ, পারতে খরচপত্র করতে তো আলাদা কথা....কি বল?"

অন্নদাচরণ বলেন—"বেশ তো দাদা।"

নিকুঞ্জলাল আবার সন্ধান আনেন—"নাও, আজকাল 'পাস-পাস' এক ঢো হয়েছে। পাওয়া গেছে তোমার পাস করা ছেলে।....দোজবরে, এই কয়দিন হ'ল বউটি মারা গেছে, বিশেষ কিছু নয়, একটি বছর আষ্টেকের ছেলে, একটি কোলের মেয়ে। গ্রামে বিষয়-আসয় যথেষ্ট.... সনাতন তো ঝুলোঝুলি করছে, বলে দিয়েছি—অন্নদাকে কথা দিয়ে ফেলেছি....আগে নিজের লোক, তারপর অন্যের কথা।....কি বল?—দেখি?"

অন্নদাচরণ একটা ঢোঁক গিলিয়া বলেন—"বেশ তো দাদা, দেখবে বৈ কি, এতো খাসা ছেলে।"

বাঞ্ছনীয় পাত্রেরও আসে সন্ধান দু'একটা। অন্নদাচরণ বলেন—"বেশ তো দাদা, এ তো অতি উত্তম পাত্র।"

যত ভালো পাত্র, বিদায়ের সম্ভাবনা যত বেশি হইয়া ওঠে, মনটা ততই যেন কি রকম হইয়া পড়ে। বাড়িতে আসিয়া কৌশলে এদিক ওদিক দু'একটা কথা পাড়িয়া বলেন—"হ্যাঁগা, গিরিটার বয়স হ'ল কত?"

বসন্তকুমারী বিস্মিত হইয়া বলেন—"সব সইতে পারি, ন্যাকামিটা সয় না; জান না, না দেখতে পাচ্ছ না?"

অন্নদাচরণ তাড়াতাড়ি বলেন—"আঃ, তোমাদের সঙ্গে কথা কওয়াও এক ফ্যাসাদ! মাস দিন ধরে ঠিকুজির বয়সের কথা বলছি।....ঠিকুজিটা বের করে দাওনা না হয়, একটি ছেলে পাওয়া গেছে, পাকা করে ফেলি। কারুর যেমন গা নেই!...."

বসন্তকুমারী রাগিয়া যান, বলেন—"তার জন্যে ঠিকুজি-কুষ্ঠির দরকার হয় না, চৌঠো-আশ্বিন জন্মেছিল, আশ্বিনে দশ বছর গেছে,—কাত্তিক, অঘ্রান, পোষ, মাঘ, ফাগুন, চোত,—এই ছ'মাস।....মেয়েছেলের বাড়তে দেরি হয়?..."

গর-গর করিতে করিতেই বাক্সর মধ্য হইতে ঠিকুজিটা বাহির করিয়া স্বামীর কোলে ফেলিয়া দেন, বলেন—"এইটুকু বা বাকি থাকে কেন, নিয়ে যাও; দেখাও, কি করবে করো। আসল কথা, গা নেই; না আছে নিজের, না আছে ভাইয়ের। সরি দিদি বিধবা মানুষ, দু'দুটো মেয়ে বিদায় করলে—দুটো বছর না ঘুরতে ঘুরতে।....এক কথার-ঢং হয়েছে—কুষ্ঠি বের করে দাও!"

অন্নদাচরণ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কোষ্ঠীর উপর দৃষ্টি ফেলিয়া বসিয়া থাকেন।....দশ বছর ছ'মাস,—কিসের তাড়া এত? মাসখানেক

একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে বিবাহ হইয়া যাইবে, ভারি তো একটা মেয়ের বিবাহ !....তাও কাণা হইত, খোঁড়া হইত, একটা ভাবনা ছিল।.... গিরিবালা নাই এমন অবস্থায় বাড়িটি কল্পনা করিবার চেষ্টা করেন; মনটা হাঁপাইয়া উঠে। শুধু কি তাই ?—কোথায় পড়িবে, কেমন শাশুড়ি, কেমন ননদ ?....এই তো চোখের সামনেই রহিয়াছে নিকুঞ্জদাদার স্ত্রী, সর্বদাই সশঙ্ক। মাত্র একটি ননদ, তাহাতেই এত !....ভাবা যায় ?— এই গিরিবালা, এত মুক্ত, সবার আদর মাখিয়া মাখিয়া কাজের মধ্যে, সেবার মধ্যে প্রতিনিয়তই বাড়িটাকে জীয়ন্ত করিয়া রাখিয়াছে, সে কোথায় এতটুকু বয়সেই ঘোমটা টানিয়া শাশুড়ির বিরাগ, ননদের গঞ্জনা বাঁচাইয়া অতি সন্তর্পণে, অতি ধীর গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভাবা যায় ?....রায়দের বউটি বিষ খাইয়া মারা গেল সেদিন। একটি লক্ষ্মী-প্রতিমা। অন্নদাচরণ গিয়াছিলেন দেখিতে,—বাড়ির কাহারও মুখে শোক দূরের কথা, নিজেদের জিনিস গেল বলিয়া যে একটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভাব তাহা পর্যন্ত যেন নাই। অবশ্য স্বামী ছিল না বাড়িতে, কিন্তু সে তো আর সবারটিও হইয়াছিল সংসারের মধ্যে।....অন্নদাচরণ এ-চিত্র থেকে মনটাকে জোর করিয়া সরাইয়া লন,—না, না, সবাই কি রায়েদের বউই হয় ? সবাই কি গঞ্জনাই খায় ? আদর আছে বৈ কি, গিরি আদরই খাইবে, ওর কোষ্ঠীতে লেখা আছে সে কথা ; কোন্ খানটায় যে লেখা আছে, সেদিন নিকুঞ্জদাদা পড়িয়া বেশ বুঝাইয়া দিলেন। অন্নদাচরণ যে সংস্কৃত বোঝেন না, নইলে এখনই বাহির করিয়া ফেলিতে পারিতেন।

তবে এটা ঠিক যে মেলা শাশুড়ি আর গুষ্টিখানেক ননদের সংসারে মেয়ে দিবেন না অন্নদাচরণ, দিতে হইবে ছিমছাম দেখিয়া—শাশুড়ি, এক আধটা ননদ—তাহাও, বিবাহ হইয়া গেছে, নিজের নিজের লইয়া শ্বশুর-

বাড়ি থাকে, ক্বচিৎ কখনও আসে এই রকম দেখিয়া।....ও হাঙ্গাম যত দূরে দূরে থাকে ততই ভালো।

ছেলেটি একটু দেখিয়া দিতে হইবে।....নিকুঞ্জদাদা শুধুই দ্বিতীয়-পক্ষের পাত্র টানিয়া তুলিতেছেন।....এইখানটায় আসিয়া অন্নদাচরণ একটু বেশি অন্যমনস্ক হইয়া যান—চিন্তা যেন একটা কেন্দ্রের চারিদিকে পাক খাইতে থাকে....দ্বিতীয়পক্ষ....দোষেরই বা কি এত ?....দ্বিতীয়পক্ষের পাত্রের কাছে একটু আদর হয় বেশি, খানিকটা ভুগিয়া তাহারা একটু কর্তাগোছের হইয়া পড়ে কিনা। এদিকে একটি বউকে নিঃশেষ করিয়া শাশুড়িও একটু ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে—যদি নেহাৎই থাকে শাশুড়ি।....যদি থাকিলই ও-পক্ষের দু'একটা সন্তান—ক্ষতি কি ? গিরি একেবারে গিয়াই মা হইয়া বসিবে। সে-খাতিরেও সংসারে ওর একটা মর্যাদা থাকিবে।... মোটের উপর যেখানে ভেজালের সম্ভাবনা—সেদিকে ঘেষা হইবে না। বিনি বা অল্প খরচে এই রকম দোজবরে হয়, তাহাই সই ; একটু খরচ করিয়া বেশ একটি ছোটখাট সংসারে একটি ভালো ছেলে হয় তো কথাই নাই।....তাহা হইলে আর সময় কই ?

অন্নদাচরণ ঈষৎ চটিয়া ওঠেন, বলেন—"বিয়ে অমনি হয় না, চাই এক কাঁড়ি টাকা আজকাল। তা দেখছে কেউ সেদিকে একটু চাড় ওর বাপের ? কি করছে ও? এর চেয়ে যে মাঠে গিয়ে লাঙল ঠেললে গেরস্তর ঢের উবগার হ'ত। চোখের সামনে একটা মেয়ে হু-হু ক'রে বেড়ে উঠছে, পণ্ডিতমশাইয়ের ওখানে গিয়ে কাব্যি করবার ওর এই সময় ? ও ঠাউরেছে কি আমায় বলতে পারে ? যেখানেই যাও—'শুনছ হে, রসিকের তোমার হাতটা খুলেছে খুব'।....আরে, তাতে রসিকেরই বা কি ? আর দাদারই বা কি ?—বাড়িতে তো সেই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।....হাত খুলেছে, ভারি কেতাত্ত করেছে ! আগে

দানের হাতটা বন্ধ হোক দিকিন দাতাকর্ণের, তবে বুঝব, হ্যাঁ।....তোর ঘাড়ে একটা অতবড় মেয়ে, তুই নিজের কড়াগণ্ডা বুঝে নিবি নি? হালদারের নাতনিটাকে আমতার গুপি ডাক্তার এলে দিয়ে চলে গেল—করকরে আটটি টাকা পকেটে নিয়ে। শেষে চাঙ্গা করলে তো ওই? ভেতরে একটা বস্তু আছে বলেই তো? কিন্তু কি পেলে একবার জিগ্যেস করো তো,—হু'টি টাকা। তার একটি দাতব্য ক'রে একটি এনে দাদার হাতে তুলে দিলেন—তাতে তেল আনবে, কি ডাল আনবে, কি....”

ওদিককার ঘর থেকে বসন্তকুমারী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“বলি, গিরি, কানের মাথা খেয়েছিস্? তামাক দিয়ে মুখ বন্ধ কর, অকেজো মনিষ্যির গরগরানি আমার ভালো লাগে না। সে তেতেপুড়ে ফিরবে এই সময়টা, ওঁর সুর উঠল!....এই নাক কান মলছি, আর যদি কখনও বিয়ের কথা তুলি। থাক্ মেয়ে আইবুড়ো থুবড়ি হ'য়ে ঘরে বসে। অদিষ্টে থাকে হবে বিয়ে, না থাকে বাপের দ্বারাও কিছু হবে না, জেঠার দ্বারাও কিছু হবে না।”

সুবিধা পাইয়া, অর্থাৎ জা ভাসুর থেকে কতকটা দূরে থাকায় বরদাসুন্দরী তাঁহার কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিলেন—“কি অন্যায়টা বলছেন দিদি?—বলতে দাও, এসে শুনুন। ভয় নেই, হাজার তেতেপুড়ে এলেও সে-মানুষের গায়ে আঁচ লাগবে না—তা যদি লাগত....”

বসন্তকুমারী আরও জোরে ঝঙ্কার করিয়া ওঠেন—“তুই চুপ কর ছোট বউ, তোকে আর ভাসুরের হ'য়ে ওকালতি করতে হবে না, বসন্ত-বামনি সবাইকেই চেনে।....ও না হয় ওই ধরণের মানুষ—বোকাই বলো, আপন-ভোলাই বলো—লোকে ঠকিয়ে নেয়, মুখ ফুটে বলতে পারে না। পাপটা তো ও করে না? ভগবান ওকে ঐ রকম গড়েছেন,

কি করবে ? তুমি তো বড় ভাই—তুমি কোন্ তাদের বলে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা আদায় ক'রে আন ?—বাড়ি বসে বসে শুধু....”

হুঁকা লইয়া অন্নদাচরণ বাহিরে গিয়া বসেন।

৪

বরদাসুন্দরীও সুযোগ খুঁজিতে থাকেন, তবে তাঁহার ভাগ্যে সুযোগ ঘটা বড় অল্প কথা নয়, অর্থাৎ ভাসুর এবং জা উভয়েই বাহিরে থাকা চাই, বেশ কিছুক্ষণের জন্য, এবং স্বামী বাড়ি থাকা চাই। এ যোগাযোগ দুর্লভ, তবে হইলে বরদাসুন্দরী ফস্‌কাইয়া যাইতে দেন না।

বর্ষার প্রথম বারিপাত—আকাশ বেশ ঘোর করিয়াই নামিয়াছে। মেঘের সরঞ্জাম দেখিয়াই অন্নদাচরণ সকালেই মুনিষ ঠিক করিবার জন্য বাহির হইয়া গেছেন, সেখান থেকে মাঠে যাইবেন, বীজ ছড়ানর ব্যবস্থা করিতে হইবে। বসন্তকুমারী গেছেন সরি-দিদির বাড়ি, সরি-দিদির প্রথম মেয়েটি আসন্ন-প্রসবা। এসব ব্যাপারে বসন্তকুমারীই গ্রামের লেডি-ডাক্তার, কখন আসিবেন ঠিক নাই, হয় তো নাও আসিতে পারেন আজ।

রসিকলাল বাড়িতেই আছেন। একবার হালদারের ওখানে যাইবার দরকার ছিল; সকাল থেকেই সঞ্চীয়মান মেঘের স্তূপ তাঁহাকে কেমন আজ অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছে—যাই যাই করিয়া দেরি হইয়া গেল; তাহারপর হঠাৎ একটা শীতল বায়ু আর গোটাকতক বিদ্যুৎঝলকের পর বৃষ্টি নামিয়া পড়িল,—কে যেন সমস্ত আকাশটার গায়ে একবার যাদু-অস্থি বুলাইয়া দিয়া কোথা থেকে কি একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটাইয়া বসিল।

বরদাসুন্দরী রান্নাঘরে পাক করিতেছেন। গিরিবালাও তাঁহারই কাছে। এ-ঘরের দাওয়ায় সাতকড়ি, হরু আর খোকা। সাতকড়ি ইস্কুলে বাহির হইতেছিল, বৃষ্টি নামিতে বই-শ্লেট ঘরে রাখিয়া দিয়া ভাই দুইটিকে লইয়া একটা খেলার মতলব আঁটিল,—সে ঘোড়া, খোকা কাকা—অর্থাৎ ডাক্তার এবং হরু হারাণ। হরিচরণ—"আয় বৃষ্টি হেনে" —বলিয়া ডাইনে বাঁয়ে দুলিয়া বর্ষার গান ধরিতেছিল, সাতকড়ি ধমক দিয়া থামাইয়া দিল, বলিল—"তুই না হারাণে হরু? ভুলে যাস কেন?"

হারাণ ঘুড়ির পিঠে দিবার জন্য ভিতরে কম্বল লইতে আসিয়াছিল, আটকাইয়া গেছে; দাওয়ার একদিকে কিনারাটিতে উবু হইয়া বসিয়া বর্ষা দেখিতেছে, মাঝে মাঝে ডান হাতটা যেন নিজে হইতেই এদিক-ওদিক চলিয়া চলিয়া যাইতেছে;—হারাণ অন্যমনস্ক ভাবে তবলা খুঁজিতেছে।

কিসের একটা যেন ঘোরে রসিকলাল দাওয়ায় একটু পায়চারি করিলেন। নীরব; অন্তরের কী একটা অনাবিল আনন্দে মুখে একটা স্মিত হাস্য ফুটিয়া উটিয়াছে—সরসীর রসপুষ্ট পদ্ম কলিটির মতো। আবিষ্ট ভাবে একটু ঘুরিলেন, তাহারপর হারাণকে বলিলেন—"নাঃ, আজ আর বেরুন হবে না হারাণে। এক রকম বাধা! জ্বালাতন করে তুলেছে।"

হারাণ নিষ্প্রয়োজন কথার উত্তর দেয় না। চুপ করিয়া যেমন ছিল সেইরূপই বসিয়া রহিল। রসিকলাল সিঁড়ির একটা ধাপ নামিয়া ডাকিলেন—"গিরি, একবার আসতে পারবি এ ঘরে? দেখিস যেন ভিজিস নি, নতুন জল, টোকাটা মাথায় দিয়ে আসবি।"

ভিতরে গেলেন এবং একটা পেটিকার মধ্যে হইতে একটা খাতা

আর কতকগুলা আলগা কাগজ লইয়া একটা মোড়ার উপর বসিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন।

গিরিবালা আসিল, এইটুকু আসিতেই টোকা থাকা সত্ত্বেও একটু একটু ভিজিয়া গিয়াছে। তবে লাগিয়াছে ভালো, পাড়ের কাছে কাপড়ের ধারটুকু একটু নিংড়াইয়া লইয়া, সমস্ত শরীরটিতে একটা আহ্লাদের শিহরণ তুলিয়া বলিল—"উঃ, কী তোড় বাবা, দু'পা না আসতে আসতেই ভিজিয়ে দিলে !....আজ আমি বাবা নাইব বিষ্টিতে—হ্যাঁ।"

রসিকলাল বলিলেন—"তোর গর্ভধারিণীকে জিগ্যেস করিস, বকাবকি করবে।"

একটু মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন—"আমি তো নাইবই।"

গিরিবালা বোধ হয় উঠানে স্নানরত পিতাকে ভালো করিয়া কল্পনা করিয়া লইবার জন্য একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া দীপ্ত মুখে বলিল—"কী চমৎকার বাবা, না ?"

কন্যার মনেও অনুরূপ স্পন্দনের সংবাদ পাইয়া রসিকলাল মুগ্ধদৃষ্টিতে খানিকটা তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, যেন নিজেই উহার মধ্যে মুকুরিত হইয়া গেছেন। তাহার পর কতকটা আবিষ্টভাবেই বলিলেন—"প্রথম বর্ষা কিনা, লাগবেই ভালো। এমনি বর্ষা-জিনিসটাই চমৎকার কিনা...."

"কেন ডাকছ বাবা ?"

"তোকে ডেকেছি, না ?....কেন যে ডাকছিলাম।....কাজ করছিলি ?"

"না, বসেছিলাম মার কাছে। বলোনা তুমি কি করতে হবে ?"

রসিকলাল কথার মধ্যেই কাগজগুলা ওটকাইতেছিলেন। বলিলেন—"তোকে ডেকেছি—তুই কবে যেন একবার বলেছিলি না—'তোমার পদ্যগুলো একবার শুনব বাবা'—? তা, ফুরসৎই হয় না..."

ওটকাইতেই লাগিলেন।

গিরিবালার মনে পড়িল না, এমন আবদার কখন করিয়াছে বাপের কাছে। মনে করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়াই বলিল—"বলেছিলাম বৈ কি সেদিন—হ্যাঁ বাবা, পড়োনা…"

"রোস্, অত উতলা হলে হয়?….তোর বাবাই যেন এক পদ্য লিখতে পারে, আর তো কেউ পারে না!….এই পেয়েছি, এইটেই শোনাই আগে।"

উঠানে জল দাঁড়াইয়া বর্ষার জলতরঙ্গ আরও জাগিয়া উঠিয়াছে, ঘাটের ঢালুতে স্রোতের কলতান উঠিল, ভেকের দল কণ্ঠসঙ্গীত তুলিল।….হাতের কাছের টোকাটা টানিয়া লইয়া হারাণের অঙ্গুলি তবলার বোলে মাতিয়া উঠিয়াছে।…প্রভাত হইয়া পড়িল সন্ধ্যা, আর এই অকাল-সন্ধ্যার মলিন আলোয় গোটাকতক ঝিঁঝি জাগিয়া উঠিয়া একটা একটানা সুরের সূত্র দিয়া বর্ষাদিনের বিচিত্র সঙ্গীতগুলাকে গাথিয়া তুলিতে লাগিল।….রসিকলাল আত্মহারা হইয়া পদ্য পড়িয়া যাইতেছেন। গিরিবালা বাপের হাঁটু দুইটা জড়াইয়া মুখ তুলিয়া না-বোঝার পরম বিস্ময়ে শুনিয়া যাইতেছে। বরদাসুন্দরী দুই তিনবার ডাকিলেন, দুইবার—"যাই মা" বলিয়া উত্তর দিল, একবার বিরক্তভাবে বাপকেই বলিল—"কী যেন মা, আমি একটু পদ্য শুনছি, তা!…"

রসিকলাল একেবারে আবিষ্ট হইয়া গেছেন। একটা পদ্য শেষ করিয়া নূতন একটা ধরার মুখে একটা-আধটা কথা বলিতেছেন—"এইটে স্কুলের সময়ের লেখা—পণ্ডিতমশাই সংশোধন করে দিয়েছিলেন, তাঁর নিজের হাতের লেখা, এই দেখনা কেমন মুক্তোর মতন অক্ষর গিরি! আজ পণ্ডিতমশাই নিশ্চয় মেঘদূত আরম্ভ করেছেন, খেয়ে দেয়ে যাবই কোন রকমে‥ 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং বপ্রক্রীড়া

পরিণতগজ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।'....এটা পণ্ডিতমশাইয়ের বিদায়ের দিনে লেখা—যেদিন বর্ধমানে চাকরি নিয়ে গেলেন না ?...এই পেয়েছি এইটে শোন্ গিরি—পদ্যটার নাম হচ্ছে—'নবীন বর্ষা'....আজ যেমন নতুন বর্ষা নেমেছে না ?—এই রকম একটা দিনে লিখেছিলাম ; আজও একটা লিখব, দেখি নতুন কিছু ভাব আসে কিনা কলমের ডগায়। শোন্—

অম্বর ঘিরি একি গম্ভীরে বাজে আজি,
শাখে শাখে কদম্ব শিহরে,
শঙ্কর হর বুঝি ডম্বরু করে লয়ে
ভূতসাথে সদম্ভে বিহরে।

কেমন ছন্দটা বল দিকিন গিরি ? বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে না ?"

একবর্ণও না বুঝিলেও ছন্দের দোল লাগে মনে। করতলে চিবুকটা রাখিয়া গিরিবালা একটু দুলিয়া বসিয়া বলে—"চমৎকার বাবা! পড়ো, আরও আছে তো ?"

"অনেকখানি এটা, শোন্ না।"

ও-ঘরের দাওয়া থেকে আবার ডাক পড়ে—"যাই"—বলিয়া গিরিবালা মুখটা আবার ঘুরাইয়া লয়, বলে—"মা যেন কী।"

রসিকলাল বলেন—"শোন্—

তাণ্ডবে ক্ষিতিতল টলমল টলমল
তরুদল মূর্ছিয়া পড়ে যে,
লক্ষ-অযুতে কারা লঙ্ঘিয়া বসুধরা
প্রলয়ের গর্জনে নামিছে।

চঞ্চল ফণিদল শঙ্কর জটা ছাড়ি
নামে বুঝি মন্থিয়া আকাশে ?
শঙ্কা নাহিরে, তারা ঊর্ধ্বেই আছে দেখ—
চিক্কুর-গর্জনে বিকশে।
লঙ্ঘিয়া কতদেশ....”

এমন সময় অতি রুক্ষ কণ্ঠে—“কী হচ্ছে শুনি ?”—বলিয়া বরদাসুন্দরী ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাপ ও মেয়ে উভয়েই তাঁহার দিকে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া গেল।

বরদাসুন্দরী ভিজিয়া একশা হইয়া গেছেন, সমস্ত শরীর বহিয়া জলের ধারা নামিয়া পায়ের চারিদিকে জমা হইয়াছে। কাঁপিতেছেন—রাগে কি ঠাণ্ডায় বলা যায় না, তবে বেশ স্পষ্টই কাঁপিতেছেন। ইহারা চাহিতেই গিরিবালাকে লক্ষ্য করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—“কী হচ্ছে ?—বলি, হচ্ছে কি শুনি ?—তখন থেকে একটা মানুষ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যে গলা ফাটিয়ে ফেললে, তা কানে যাচ্ছে না একটা কথা ?....কাজের কথা তো যাবে না কানে, তেমন মানুষ যে জন্মই দেয়নি !—নৈলে যার ঘরে একটা আইবুড়ো মেয়ে—সে-মানুষ বসে বসে রাশি রাশি ছড়া নিকে যেতে পারে ? হায়া ঘেন্না বলে একটা জিনিস থাকে মানুষের—তা কিছু কি দেননি ভগবান ?···ওঠ্, ওঠ্ বলছি গিরি, নৈলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন—কচি খুকি, আদর কাড়িয়ে বাপের কাছে ছড়া শুনতে এসেছেন ! যা, ভিজতে ভিজতে হাঁড়ি ঠেলগে যা। আমি পারব না; আমি পারব না, পারব না, পারব না—এ বাড়ির কোন কাজে, কোন কথায় যদি আর থাকি তো আমার অতি-বড়-কোটি দিব্যি রইল।”

গিরিবালা বাপের হাঁটু ছাড়িয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাবের ঘোরে এ-ধরণের উগ্র ভৎ‍সনা খাইয়া বাপ-মেয়ে উভয়েরই অবস্থা

অবর্ণনীয় ; কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছে না। গিরিবালা দুয়ারের দিকে পা বাড়াইতেই বরদাসুন্দরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কোথায় চলেছিস ঠ্যাকার করে শুনি ?—তোর না এই ক'দিন আগে জ্বর হয়েছিল ?—ঠ্যাকার !—তেজ !—গটগটিয়ে চললেন মেয়ে এই পাহাড়ে বিষ্টি মাথায় করে !···যাঁর শিক্ষা তিনি নিজে কেন বসে রইলেন ?—যান, বিষ্টি মাথায় করে রোজগার করতে। হবে যেতে—যার ঘাড়ের ওপর বারো বছরের আইবুড়ো মেয়ে তার আবার রোদ-বিষ্টি কি ?··· হারাণে—কোথায় গেল সে ?····"

ঘরের দুর্যোগ আরম্ভ হইতেই হারাণ তবলার বোল ভুলিয়া দাওয়ার যে কিনারায় ছিল সেই কিনারা হইতেই উঠানে নামিয়া পড়িয়া সিধা বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

বরদাসুন্দরী যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিলেন, সমস্ত তিরস্কার, মন্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়া তেমনি ভাবেই অবারিত মস্তকে উঠান বাহিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

মা চলিয়া যাইতে গিরিবালা সেইভাবেই দাঁড়াইয়া অঞ্জলিতে মুখ চাপিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রসিকলাল উঠিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইলেন, গিরিবালার কাছে আসিয়া দ্বিধাজড়িত পদে ক্ষণমাত্র দাঁড়াইয়া বলিলেন—"চুপ কর গিরি ।"—ঐটুকু দাঁড়াইতে আর ঐটুকু সান্ত্বনা দিতেও যেন ভয়—রান্নাঘরের দাওয়া থেকে বরদাসুন্দরী বুঝি টের পাইয়া গেলেন।

তাহার পর টোকাটা মাথায় দিয়া তিনিও বাহির হইয়া গেলেন।

ঘণ্টা দুয়েক বৃষ্টি রহিল এবং এই ঘণ্টা দুয়েক বাড়িটা থম্ থম্ করিতে

লাগিল। হৃদয়াবেগটা প্রশমিত হইলে গিরিবালা পদ্য-লেখা কাগজপত্র-গুলা পেটিকাতে তুলিয়া রাখিয়া, হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। এক এক বার মনটা আলোড়িত করিয়া চোখে জল ঠেলিয়া আসিতেছে, হাত দিয়া মুছিয়া লইতেছে। ছেলে তিনটি খেলা ভুলিয়া দাওয়ার এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে! খোকা এক এক বার সাহস করিয়া দাদাদের আবার খেলায় নামাইবার চেষ্টা করিতেছে, বিফলমনোরথ হইয়া আবার রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ম্রিয়মান হইয়া পাশটিতে গুটাইয়া সুটাইয়া বসিতেছে।

বরদাসুন্দরী আবার এ-ঘরে আসিলেন। গরগর করিতেছেন, তবে অনেক নরম গলায়—শেষ বর্ষণের বৃষ্টিধারার মতোই।—

"ওঠ্, খেয়ে নিবি চল্।....চিরকেলে অব্যেস মানুষের—পারে কখনও ছাড়তে? তবে অব্যেসটাই খারাপ, তাই বকতে হয়,—চিরকালটা কি কাব্যি নিয়ে থাকলেই চলে? দেখিস্, কাগোজগুনো যেন ছড়িয়ে না পড়ে—রেখেছিস তুলে? ছেলেগুলোকেও খাইয়ে দে গিরি, আমার শরীরটে যেন ভালো নেই, একটু শুইগে,—কোথায় যে গেল মানুষটা এই দুর্জ্জয় বিষ্টি মাথায় করে!...."

হারাণ প্রবেশ করিল! হারাণকে দেখিয়াই বরদাসুন্দরীর বকুনিটা একটু বাড়িয়া গেল—"হ্যাঁরে, আমি না হয় ঝোঁকের মাথায় বকলাম, তোর তো আক্কেল করতে হয়। লোকটা যে এই পাহাড়ে বিষ্টি মাথায় করে রাগের ঝোঁকে রুগী দেখতে বেরিয়ে গেল, তুই কোন্ বুঝিয়ে সুঝিয়ে বারণ করলি?"

হারাণ বিস্মিত ভাবে বরদাসুন্দরীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"শোন' কথা ছোট মায়ের! উনি তো এখানথে' বেইরে ওবধি এক পহর ধ'রে ছড়া শুনিয়ে শুনিয়ে আমায় ক্ষেপিয়ে তুললেন।—একটা মানুষ অমন

দাবড়ানিটা খেয়ে বেইরে এয়েছে, বলতেও পারি না কিছু ;—বসে বসে নরকযন্ত্রণায় ভুগছি।....বারণ!—যাবার জন্যে পা বাড়ালে তো বারণ করব? আর তাও বারণই বা করবো কাকে কও দিকিন?—মণ্ডলের মায়ের পেটে ফিক ব্যথা উঠেছে, ডাকতে এল, গেলে ডবল বিজিট কবলালে, তা নড়লেন এক পা?...দাও, তেল চেয়ে পাট্যেচে...বলেন—'তুই কোন বারণ করলি!'...."

বরদাসুন্দরী হাসিটা চাপিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। হাসির সঙ্গেই একটু দুঃখের ভাব মিশাইয়া বলিলেন—"ওই শোন্ গিরি, তোরা বলিস মা বকে কিসের জন্যে ;— মেয়ের কাছে যুৎ হ'ল না, চাকরের কাছে ছড়া কাটছে।....মরিঃ, কারেই বা বলা! মানুষ হয় তবে তো ;—উনি বিষ্টি মাথায় করে রোজগারে বেরুবেন। আমি আবার মন খারাপ ক'রে ছেলেগুনোকে পয্যন্ত শুকিয়ে রেখেছি, পোড়া কপাল।....তা আধিখ্যেতা কেন? ভেতরেই আসতে বল্‌গে।"

৫

সিমুরের চৌধুরীদের বাড়িতে রাসের মতো শ্রাবণ মাসে ঝুলনটাও খুব ঘটা করিয়া হয়। রসিকলাল একদিন গিয়া গিরিবালা সাতকড়ি আর হরিচরণকে রাখিয়া আসিয়াছেন। জায়গাটা বড়, তা ভিন্ন অনেক বাড়িতেই ঝুলন উপলক্ষে কুটম্ব সাক্ষাতের আমদানি হয় বলিয়া এই সময়টা অনেক লোকজন হয় ; মেয়ে দেখাইয়া বিবাহের সম্বন্ধ করিবার মস্ত একটা সুযোগ। গিরিবালারা সমস্ত ঝুলনটা ওখানেই কাটাইবে।

নিকুঞ্জলাল একটা দিন-মজুরের সঙ্গে পাওনা লইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন। মজুর রাখায় নিকুঞ্জলাল একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ

করেন।—প্রথমত, নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে কখনও কাছে-পিঠের লোককে নিয়োগ করেন না ; তেমনি আবার সুস্থ-সবল লোক্‌কেও নিয়োগ করেন না। বলেন—"আহা, দুর্বল, কেউ ডাকে না, তবুও দু'টো পয়সা যা পায়। লোক দেখিয়ে যে দান-ধ্যান করব সে-অদেষ্ট তো ক'রে আসেনি, এই করেই গরীব দুঃখীদের ঘরে যা দু'টো পয়সা পৌঁছে দিতে পারি।"

অবশ্য এরূপ দয়ার পাত্র যে একবার কাজ লয়, সে আর দ্বিতীয় বার এপথ মাড়ায় না, তবুও একবার ধরা পড়িবার মতো হতভাগ্যও চারিদিকে বহুৎ, নিকুঞ্জলালের কাজ চলিয়াই যায়।

মজুরটা কাতরভাবে বলিতেছে—"একে তো আধা মজুরিতে কাজ করমু বাবাঠাকুর, তায় এই ক'টা পয়সার জন্যে চার কোশ থেকে তিনবার হেঁটে আসতে হ'ল। আর পারি না ; শরীল কখনো বয়—আপনিই কন্ না ?

নিকুঞ্জলাল বলিতেছেন—"এই জন্যই বলে, তোদের ছোটলোকদের ভালো করতে নেই কখনও। ঐ শরীরে তুই কত কাজ করবি যে তোকে পুরো মজুরি দিতে হবে বল? রেট খারাপ ক'রে তো গেরস্তদের শাপমণ্যি কুড়োতে পারিনে? তোকে পুরো দিলে যারা সক্ষম তারা ডবল চাইবে না গেরস্তদের কাছে?—তখন?"

মজুরটা বলিতেছে—"যা জোরে পারিনি তা বেশি খেটে হাঁসিল করে দিয়েছি বাবাঠাকুর। যারা সক্ষম, যারা কাছের, তারা খেতে বাড়ি যেতেই কতটা পুষিয়ে নেয় কন্ না কেন? একমুঠো ভাজাভুজি মুখে দিয়ে নাগাড়ে তো খেটে গেছি, নইলে চারটে দিনে অতটা জঙ্গল পস্কের করা যায়? সক্ষম দু'টো নোকেও পারত না ; আপনি কাউকেই ডেকে জিগুন না কেন।"

নিকুঞ্জলাল বলিতেছেন—"ঘাট হয়েছে বাপু, ভেবেছিলাম মজুর, এখন দেখছি এক তর্কপঞ্চাননের পাল্লায় পড়েছিলাম। তা বেশ, তিনবার হেঁটে এসেছিস, খালি হাতে তো ফিরে যেতে হয়নি? বারো আনা থেকে কুল্যে পাঁচ আনায় ঠেকেছে,—নিয়ে যাবি, তার আর কি? —গেরস্তর হাতে তো সব সময় থাকে না পয়সা...."

মজুরটা পায়ের কাছে বসিয়া কাতরাইতেছে—"না বাবু, আপনি রাজা, এই কটা পয়সার জন্যে গরীবকে ঘোরাবেন না। বাদল নামল, পথের কষ্ট, তার ওপর আবার জ্বর আসতে নেগেছে, দেন চুকিয়ে; শরীল আর বয় না বাবাঠাকুর।"

নিকুঞ্জলাল বলিতেছেন—"হ্যাঁ, তাগাদা বলতে হয় তো একে! চার কোশ দূরে থাকিস, বলছিস শরীর বইছে না, তার ওপর তো তাগাদার চোটে ভিটের মাটি তুলে ফেলছিস, কাছে পিঠে থাকলে যে কি করতিস!....বলছি নিয়ে যাস, বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে না তো মানুষে? সকালবেলা থেকে দিয়ে-থুয়ে হাতে ছ'টি পয়সা ঠেকেছে; তুই আগে আসতিস, তোকেই চুকিয়ে দিতুম।"

মজুরটা বলিতেছে—"চার কোশ পথ হেঁটে এর আগে আসা যায়? —আপনিই কন্ বাবাঠাকুর? দেন চুকিয়ে, দোহাই।"

নিকুঞ্জলাল অসহায়ভাবে বলিতেছেন—"এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! তা নিয়ে যা ঐ ছ'টা পয়সা, কি আর করব? মেছুনি এলে বুঝিয়ে বলব। হোক মেয়েমানুষ, সে বরং বুঝবে।"

মজুরটা পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, বলিতেছে—"তাহ'লে আর ছ'টা পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দেন বাবাঠাকুর, আর এসবো নি। মনে করব...."

এমন সময় হুই-হাঁই শব্দ করিতে করিতে সামনের রাস্তায় কয়েকজন

ঢুলি একটা পালকি নামাইল। পালকির দোরটা একটু টানা বলিয়া ভেতরটা দেখা যায় না। সঙ্গে একজন পাইক-বরকন্দাজ গোছের লোক আছে। দুই একজন ব্যক্তি জড়ো হইলে সে প্রশ্ন করিল—"এখানে নিকুঞ্জ ঘটক-ঠাকুরের বাড়িটা কোথায় বলতে পার?"

নিকুঞ্জলাল ফতুয়ার পকেট থেকে আড়াই গণ্ডা পয়সা বাহির করিয়া মজুরটার সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"নে তাহ'লে, আর এক আনা পয়সা ছেলেদের মুড়ির জন্যে রেখেছিলাম, তুই-ই নিয়ে যা; কিন্তু খবরদার আর এ-মুখো হ'স নি—ভদ্রলোকের বাড়িতে খাটবার যুগ্যি নোস্।....কে আবার এল দেখিগে।"

মাঝখানে একটা বাগান পড়ে, সেটা পারাইয়া আসিতে আসিতেই নিকুঞ্জ বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"আরে, পরেশ যে!—তুমি হঠাৎ কোথা থেকে?"

পা চালাইয়া গিয়া পালকির সামনে উপস্থিত হইলেন। পালকির আরোহী লোকটি বাহির হইয়া নিকুঞ্জলালের পদধূলি গ্রহণ করিল, তাহারপর ঈষৎ লজ্জিত ভাবে মুখটা অল্প নিচু করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"অনেকদিন পায়ের ধূলো দেন নি, মনে করলাম একবার নিজেই গিয়ে নিয়ে আসি।"

চেষ্টা করিয়াই হোক, অথবা স্বভাবসিদ্ধই হোক—কথাটাতেও একটু ছেলেমানুষি আবদারে ভাব আছে।

বর্ণটা কালোই, তবে মাজাঘষা; মাথায় টাক, চুল গোটাকতক যা আছে তাহাতে বোধ হয় পাক ধরিয়াছে, একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে মাঝে মাঝে কলপের কটাশে রংটা চোখে পড়ে, মোটা গোঁফ জোড়াটিরও সেই অবস্থা।

মাথায় একটু খর্বই; এদিকে আড়ে বেশ ফাঁদাল। বয়স

পঁয়তাল্লিশের এদিকে ওদিকে একটা কিছু হওয়া সম্ভব,—অর্থাৎ আধ আধ কথা বলিবার মতো নয়, লজ্জা করিবার মতোও নয়, এমন কি নিকুঞ্জলালকে প্রণাম করিবার মতোও নয়, কেন না নিকুঞ্জলালের বয়স পঁয়তাল্লিশের নিচেই।

আগন্তুকের গায়ে দামি সাটিনের চিনে কোট, গলায় পাট করা একটি দামি রেশমের চাদর, পরনে গিলে-করা ফরেশডাঙ্গার কালো পেড়ে ধুতি, পায়ে সিল্কের মোজা এবং গিল্‌টি সোনার ফুলকাটা বকলস্ বসান চীনে বাড়ির দামি পম্পশু।....এ সবের উপর আবার সঙ্গে একজন পাইক ; বেশ লোক জড়ো হইয়া গেল।

পদধূলি গ্রহণ করিতে নিকুঞ্জলাল মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"বেশ করেছ, খুব ভালো করেছ। আমার মনটাও ক'দিন থেকে বড় উতলা হয়েছিল—হবেই কি-না, সম্বন্ধটা তো সোজা নয় ;—শাস্ত্রে বলে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটা হ'ল পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ—মনটা টানবেই কিনা। হাতের গোটাকতক কাজ সেরেই যাচ্ছিলাম, তা এসে ভালোই করেছ।....চলো, এসো ; আর বাবাজি, যা গুরুর বাড়ি ; একটা কুঁড়ে বললেই হয়, এ কি আর তোমাদের থাকবার যুগ্যি ?"

দলটি পিছনে পিছনে চলিয়াছে। নিকুঞ্জলাল আলাপচ্ছলে যে পরিচয়টুকু দিয়া যাইতেছেন সেইটুকু লইয়াই বিস্মিত আন্দাজ-আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেছে। উঁহারা দুইজনে ঘরে প্রবেশ করিতে দলটি দুয়ার এবং জানালার বাহিরে চারাইয়া পড়িল। গুমট গরম পড়িয়াছে, নিকুঞ্জলাল থাকিয়া থকিয়া সরাইয়া দিতেছেন, যাহাতে ঘরে একটু হাওয়া আসে। দলটা সরিয়া গিয়া আবার বর্ধিত কৌতূহলে আসিয়া জড়ো হইতেছে। কিন্তু নিকুঞ্জলাল অত কাঁচা নন যে একেবারে সব পরিচয়টা দিয়া ব্যাপারটাকে হালকা করিয়া দিবেন। কুশল প্রশ্নাদি

প্রভৃতি প্রাথমিক কথাবার্তার মধ্যেই পাখার হাওয়া খাইয়া খানিকটা জিরাইয়া আগন্তুক জামা জুতা খুলিয়া তাকিয়া আশ্রয় করিল। স্থূল শরীর ঢাকিয়া বুকে পিঠে রাশীকৃত চুলও আছে—দলের লোকেরা এর অধিক পরিচয় যখন আপাতত কোন মতেই পাইল না, তখন অল্পে অল্পে পাতলা হইতে লাগিল।

আরও খানিকক্ষণ গেল। মিছরির সরবৎ, ফলমূল, কিছু মিষ্টান্ন সেবন করিয়া আগন্তুক ঠাণ্ডা হইল, তাহার পর কৌতূহলীদের যখন আর কেহই বাকি নাই সেই সময় আসল কথা আরম্ভ হইল। গুমট করিয়াছিল, একটু পরে বর্ষা নামিল, বিশ্রম্ভালাপে সুবিধাও হইল।

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—"একটু দেরি করে ফেললে পরেশ, মেয়েটি পরশু মামার বাড়ি চলে গেছে। আমি আকুলি-বিকুলি করে মরছি পরেশ এখনও আসে না কেন। পষ্ট বলতে তো পারি না, তবুও ছুতোনাতা করে ওর বাপকে দু'টো দিন রেখেছিলাম, আর পারা গেল না, শ্বশুর বাড়ির টান, বোঝই তো বাবাজি—হি-হি-হি,...তা, ঐ যে বললাম মেয়ে দেখতে হবে না, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণটি।"

পরেশনাথ শিষ্যোচিত লজ্জা ও বিনয়ের সহিত বলিল—"মেয়ে দেখবার তো আমার কোন দরকার নেই, আপনি নিজেই যখন রয়েছেন তখন আর কথা কি? তবে বিলম্বটা আর ঠিক হচ্ছে না, তাই ভাবলাম নিজে গিয়েই গুরুদেবকে বলি, বার বার তাঁকে ডেকে আনানো ঠিক নয়—অবিশ্যি পায়ের ধূলো পড়লেই আমার ভাগ্যি....তাহ'লেও নিজেই যাই একবার। গুরুগৃহের মতন তীর্থ তো আর নেই; অনেক দিন থেকে একটা সাধ আছে।....থাকত মেয়ে, দেখে যেতাম, সে আলাদা কথা। আসল দরকার একটু তাড়াতাড়ি যাতে...."

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—"আমার চেষ্টার বিরাম নেই বাবাজি, তবে

বেশি তাড়াহুড়ো করতে গেলে আবার এ-সব ব্যাপার ভেস্তে যায়। বুঝতেই তো পার? বড়টিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনে—কটা হাতে এনেছি। দোজপক্ষের জন্যে তার আর তেমন আপত্তি নেই। অবিশ্যি কে ছেলে, কত বয়স, কি বৃত্তান্ত—সেটা সইয়ে সইয়ে ভাঙতে হবে। তবে তাকে করবই রাজি—এ তুমি অবধারিত জেন বাবাজি, বড়কে রাজি করব। মুস্কিল হয়েছে ছোটকে, অর্থাৎ মেয়ের বাপকে নিয়ে। সে এক আধ-পাগলা মানুষ—মাথায় কে ঢুকিয়ে দিয়েছে, মেয়ে ওর পার্বতী, শিব এসে তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। দিন কতক তো 'গৌরীদান করব, গৌরীদান করব' বলে খুব খেপলো, সে-ফাঁড়া কাটিয়ে মেয়ে তো এখন তেরোতে পড়েছে, এখন মাথায় বসে গেছে শিব নিজে মানুষের বেশে এসে ওর মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে।....এ পাগলামিও ঘুচবে, তবে নেহাৎ বাপ, শেষ পর্যন্ত না আবার উল্টে বসে, তাই একটু সাবধানে পা টিপে টিপে এগুনো....”

আগন্তুক বলিল—“আপনি যা ভাল বুঝবেন তার ওপর আমার আর কি বলবার আছে? তবে খুব দেরি যাতে না হয়....মানে সংসারটা ভেসে যাচ্ছে কি-না....বছরখানেকের বেশি যাতে না যায়....”

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—“এই আসছে মাঘ-ফাল্গুন, তার বেশি এগুতে দোব না, নিশ্চিন্ত থাকো।....হ্যাঁ, তুমি যখন এসেইছ, তখন কাজ খানিকটা এগিয়ে ফেলা যাক। বড়কে ডেকে তোমার সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিই। ওসব কথা এখন স্রেফ কিছু নয়, শুধু একটু চেনা-শোনা আলাপ-পরিচয় হয়ে থাকা, পরে আমার কথাবার্তা পাড়তে সুবিধে হবে। খুব সাবধানে চালিয়ে যেও তুমি....বরং একটা পরামশ করে ফেলি এস।....তাহলে কিন্তু তোমার আর সন্ধের গাড়িতে ফেরা হয় না।”

অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজনে সলা-পরামর্শ হইল। পাইকটাকে বলিয়া

রাখা হইল—দরকারি মকদ্দমার কথাবার্তা হইতেছে, কেহ আসিতে থাকিলে সে যেন পূর্বাহ্ণেই সঙ্কেত করিয়া দেয়।

বৃষ্টিটা ঘণ্টাখানেক পরে ধরিলে নিকুঞ্জলাল নন্তীকে পাঠাইয়া দিলেন অন্নদাচরণকে ডাকিয়া আনিতে। আগন্তুক আবার জামা মোজা পরিয়া মোটা সোনার-ঘড়ির চেনটা বুকে ঝুলাইয়া ভব্যসব্য হইয়া বসিল।

অন্নদাচরণ আসিলে নিকুঞ্জলাল বলিয়া উঠিলেন—"এসো, এসো অন্নদা। পরেশ বলে—বেলে-তেজপুরে এলাম, এখানে সমাজে যাঁরা বিশিষ্ট তাঁদের সঙ্গে একটু দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় না করে গেলে মনটা খুঁৎ খুঁৎ করবে।....আমি বললাম—বিশিষ্ট লোক—মানে, একটা ন্যায্য কথা বললে বোঝে, পাঁচটা ভালো কথা নিয়ে চর্চা করে—মানে, চারিদিক দিযে আলাপ করবার মতন আমি তো এক অন্নদাকেই দেখি, আর লোক আছে কে বেলে-তেজপুরে?....অবিশ্যি থাকবে না কেন, রায়েরা রয়েছে, সাহারা দুই ভাই রয়েছে—টাকার আণ্ডিল, কেবল বড় বড কথা, সেদিক দিয়ে খুব বড়, খুব বিশিষ্ট....পরেশ হেসে বলে—না, টাকায় বড় ঢের দেখেছি, রোজই দেখছি; যাঁর সঙ্গে দু'টো ভালো আলাপ করে আরাম পাব, এমন লোকের সঙ্গই চাই দুদণ্ড। তাই তোমায় ডেকে পাঠালুম, কাজের ক্ষতি করে আসতে হ'ল নাকি?"

অন্নদাচরণ কতকটা অভ্যর্থনা এবং পরিচয়ের ভঙ্গীতে, কতকটা আগন্তুকের সাঙ্গোপাঙ্গ এবং বেশভূষার জাঁকে এবং সর্বোপরি বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তাহার সম্বন্ধে নিকুঞ্জলালের কনিষ্ঠের উপযোগী ভাষা প্রয়োগে বেশ একটু হকচকিয়া গিয়াছিলেন; একটু জড়িতভাবে চৌকির একটা কোণে বসিয়া তাঁহার নবলব্ধ বিশিষ্টতা অনুযায়ী কি একটা মানানসই

প্রশ্ন করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় আরও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার ঘটিল।—আগন্তুক স্থূল বপুটি দুইধারে একটু দুলাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া অন্নদাচরণের সামনে রাখিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

"ওকি করেন, ওকি করেন, বয়োজ্যেষ্ঠ আপনি।"—বলিয়া অন্নদাচরণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে যাইতেছিলেন, নিকুঞ্জলাল জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আমি জানতাম তুমিও ঐ ভুল করবে অন্নদা। ওর অধিকার আছে প্রণামের, করুক ; বয়োজ্যেষ্ঠ-টেষ্ঠো নয়, ছেলেবেলা থেকে চেহারাটা একটু ভারী ভারী—সবাইকেই ঐ ভুল করতে হয়—হাঃ হা—হা।....কিন্তু তুমি আবার ওকি করলে পরেশ! আবার টাকা কেন বাপু?"

আগন্তুক হাতটা অন্নদাচরণের দুই পায়ে ঠেকাইয়া বুক এবং মাথা স্পর্শ করিয়া সেই অল্প আধ-আধ স্বরে বলিল—"সে কি কথা গুরুদেব! আপনার ভাই, কত সৌভাগ্যে পায়ের ধূলো পেলাম, দুটো টাকা প্রণামী দোব বৈ কি, এতে বারণ করলে শুনব কেন?"

সলজ্জ গতিতে গিয়া নিজের জায়গায় বসিলে নিকুঞ্জলাল অন্নদাচরণকে বলিলেন—"নাও তুলে, ও ঐ রকম একগুঁয়ে, ছাড়বে না। অবিশ্যি ওর অধিকার যে আছে একথাও স্বীকার করতে হবে বৈ কি, আমার শিষ্যি হ'লে তোমার সঙ্গে সেই সম্বন্ধই দাঁড়াল কিনা।....পরেশ হ'ল হরিপুরের গাঙ্গুলীদের ছ-আনি শরিক—এখনকার বড় তরফ আর কি। বংশ-মর্যাদায় বলো, প্রতিপত্তিতে বলো, অর্থে বলো, অত বড় জমিদার আর ও-অঞ্চলে...."

পরেশ গাঙ্গুলী বিনয়ে একটু হেলিয়া গেল, বলিল—"অর্থ কোথায় গুরুদেব? আশ মিটিয়ে যে আপনাদের সেবা করব এমন সামর্থ্যটুকু

পর্যন্ত নেই ; কত কথাই যে মনে হয় !····তবে হ্যাঁ, গুরুবল আছে, চলে যায়—অভাব-অপ্রতুলটা আর ভোগ করতে হয় না····”

অন্নদাচরণের দিকে চাহিয়া বলিল—“এইটুকুই কি যথেষ্ট নয় ? এইটুকুতেই কি আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় ?”

হরিপুর এখান থেকে বহুদূর হইলেও গাঙ্গুলীদের নাম-ডাকের পরিচয় মাঝে মাঝে কানে আসে, সেখানকারই ছ-আনি তরফের মালিককে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এত কাছে দেখিয়া অন্নদাচরণ সত্যই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিকুঞ্জলালের উপরও কোথা দিয়া একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। একটা কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া বলিলেন—“এ তো অতি মহতের মতন কথা, আপনার উপযুক্তই কথা····”

পরেশ গাঙ্গুলী ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত অল্প একটু হাসিয়া,—মাথাটা নিচু করিয়া বলিল—“আমায় ‘আপনি’ বলেই ডাকতে থাকবেন ?”

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—“ওটা ক্রমেই সুধরে যাবে, ওর জন্য তুমি খেদ ক’র না। আর অন্নদার চেয়ে তুমি খুব ছোট তো নও, বছর দুয়েকের হদ্দ হবে, বোধ হয় তাও নয়। আলাপ-পরিচয় বাড়বার সঙ্গে ওটুকু কেটে যাবে।···ভুলছ কেন গো ?—নতুন নতুন তো আমিও তোমায় ‘আপনি’ ছাড়া বলতে পারতাম না।”

অন্নদাচরণ বিজ্ঞ এবং বিশিষ্ট লোকের মতো একটা কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন, বলিলেন—“তুমি ওর কুলগুরু, আমার দাদা—আমাদের উভয়েরই নমস্য, তোমার সব মানায় ; কিন্তু তাই বলে যে আমারও ওঁকে উপযুক্ত সম্ভাষণ করলে দোষ হবে—একথা মানবো কেন দাদা ?—দেশের রাজা, বয়সে কনিষ্ঠ হ’লেও সে সমাজের শীর্ষস্থানীয়। রাজা বিনয়ী হ’ন, তাঁর গুণ, তাঁর দয়া ; তাতে তো তিনি ছোট হন না, বরং আরও

বড়ই হ'য়ে পড়েন ; তাঁর সঙ্গে আলাপে আমাদের এ সোজা কথাটুকু ভুললে চলবে কেন ?”

নিকুঞ্জলাল হুঁকা অবলম্বন করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, অন্নদাচরণ শেষ করিলে—মুখ তুলিয়া পরেশ গাঙ্গুলীর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন —“শুনলে তো ? এখন দাও উত্তুর ।....না, বেফাঁস তো কিছু বলে নি অন্নদা, বলেছে খাঁটি কথাই, ওর উপযুক্ত কথাই । আর বলবেই কিনা, নৈলে তুমি ভালো লোকের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে, সবাইকে ফেলে আমি নিজের ছোট ভাইটিকে ডাকিয়ে আনাই কেন ?....না, দিতে হবে উত্তুর তোমায়, উঁহু....”

পরেশ গাঙ্গুলী মাথা নিচু করিয়া মৃদু হাস্যের সহিত উভয়ের কথাই শুনিয়া যাইতেছিল, মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে দুলাইয়া বলিল—“এর উত্তুর আমার কাছে নেই, হার মানলাম গুরুদেব ; তবে এও বলি, যদি মেনে নিতেই হয়—রাজা, তো সে আর সবার কাছে, আপনার কাছে নয়, ওনার কাছেও নয় ; আপনাদের কাছে স্নেহই আশা করি, আর যদি দেখি সামান্য একটি সম্ভাষণের মধ্যেও সে স্নেহ ছাড়া অন্যভাব আসছে তো আপত্তি করতেও ছাড়ব না ।”

উত্তর দেওয়ায় অক্ষম বলিয়া জানাইলেও বেশ ভালো উত্তরই দেওয়া হইল । শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে পরেশ গাঙ্গুলী বেশ ভালো ভাবেই হাসিয়া উঠিল । নিকুঞ্জলাল আবার হুঁকায় মুখ লাগাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, একবার আড়চোখে যেন শিষ্যগৌরবে অন্নদাচরণের পানে চাহিলেন । অন্নদাচরণ বলিলেন—“সাধু, সাধু ;—নৈলে আর রাজার সৌজন্য বলেছে কেন ?....বাঃ, পরিচয় পেয়ে, আলাপ করে ধন্য হলাম ।....সাধু !”

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা হইল, খুব হৃদ্যতা জমিয়া উঠিল । সন্ধ্যার

কিছু পূর্বে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, পরেশ গাঙ্গুলী বরকন্দাজকে ডাকিয়া পালকি ঠিক করিতে হুকুম দিল, তাহারপর নিকুঞ্জলালের পানে চাহিয়া বলিল—"এ রকম মহাশয় পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গ ছেড়ে যেতে মন সরছে না গুরুদেব, থেকেই যেতাম রাতটা, আমার তীর্থধামই তো, কিন্তু জানেনই তো কি রকম হাঙ্গামে পড়ে আছি কটা ব্যাপার নিয়ে ?"

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—"তা জানি বৈ কি। শুনতেই রাজা, রাজত্ব করাটা যে কী তাতো দেখছিই।....অন্নদার সঙ্গে মাত্র ঘণ্টা দু'একের আলাপে তৃপ্তি তো হয়ই না। তা তোমার বক্তব্যটা কি ?"

পরেশ গাঙ্গুলী কুণ্ঠিতভাবে বলিল—"বলতে সাহস হয় না। গুরু বা গুরু বংশীয়-কাউকে হুট করে আহ্বান ক'রলেই হ'ল না তো ; তবুও যদি দিতেন পায়ের ধূলো একবার উনি...."

শেষের দিকটায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অন্নদার পানে চাহিল। অপ্রত্যাশিত এত বড একটা নিমন্ত্রণে তিনি একটু সঙ্কুচিত দৃষ্টিতেই নিকুঞ্জলালের পানে চাহিলেন। নিকুঞ্জলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"বুঝি, তোমারও অনেক কাজ হাতে ! কিন্তু যেতে হবে একবার। পরেশ বলছে অত করে, কি আর করবে ?"

পালকিতে উঠিয়া পরেশনাথ আবার পকেট থেকে দশটি টাকা বাহির করিয়া নিকুঞ্জলালের হাতে দিল বলিল—"দু'বাড়ির ছেলেপিলেদের মিষ্টি খাবার জন্যে এটা রাখুন, ভুলেই যাচ্ছিলাম, কথায় কথায়।"

নিকুঞ্জলাল সঙ্গে সঙ্গেই অন্নদাচরণের দক্ষিণ হস্তটা টানিয়া লইয়া এক রকম জোর করিয়া টাকা কয়টা গুঁজিয়া দিলেন, বলিলেন—"আমার বাড়ির ছেলেপুলে বলতে তো এক ঐ নন্তী। তুমি মিষ্টি-টিষ্টি কিনে দু'টো কিছু পাঠিয়ে দিও অন্নদা।"

বাড়িতে আসিতে আসিতে অন্নদাচরণের মনে হইল পৃথিবীতে যখন

এমন সরল আর উদার প্রকৃতির জমিদার থাকা সম্ভব, তখন নিশ্চয় এটাও সম্ভব যে নিকুঞ্জলালের সম্বন্ধে তিনি একটা ভুল ধারণাই পোষণ করিয়া আসিয়াছেন এতদিন। যতক্ষণ জাগিয়া রহিলেন মনটা একটা প্রীতি আর ক্ষমার রসে পরিপূর্ণ হইয়া রহিল।

পরদিন সকালে নন্তী গিয়া আবার অন্নদাচরণকে ডাকিয়া আনিল। নিকুঞ্জলাল একটা কিসের দলিল লইয়া হুঁকাহাতে মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিতেছিলেন, একবার অন্নদাচরণকে দেখিয়া লইয়া বলিলেন—"বসো।"

একটু পরে দলিলটা মুড়িয়া পাশে রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"কাল রাত্তিরেই ডেকে পাঠাব ভেবেছিলাম, তা শরীরটা কেমন করতে লাগল, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। জমিদার-শিষ্যি ও শুনতেই ভালো, এলে মস্ত বড় ধুক্‌পুকুনি লেগে থাকে কিনা—কি ত্রুটি হ'ল, কি খেলাপ হ'ল, —তোমার কাছে তো নুতুন নেই ; ভালোয় ভালোয় যেন বিদেয় হ'লেই ভালো।"

অন্তরের গোপনীয় কথাটি বলার সঙ্গে একটু হাস্য করিলেন। অন্নদাচরণ বলিলেন—"তা বৈ কি।"

নিকুঞ্জলাল তামাক টানিতে লাগিলেন। একটু পরে সেই ভাবেই—শুধু একটি তির্যকদৃষ্টিতে অন্নদাচরণের মুখের পানে চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেমন বোধ হ'ল লোকটিকে বলো দিকিন?"

প্রশ্নটা করার ভঙ্গীতে অন্নদাচরণ একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠেই বলিলেন—"কেন, আমার তো বেশ ভালোই বোধ হ'ল দাদা। কেন বলুন তো?"

নিকুঞ্জলাল তামাকটা একটু টানিয়া হুঁকাটা পিতলের বৈঠকে বসাইয়া

দিলেন। তাহার পর কলিকাটা আবার সাজিয়া দিবার জন্য নন্তীকে একটা হাঁক দিয়া বলিলেন—"না, ভালোই। কতকগুলো বড়মানষি খামখেয়ালিপনা আছে—যেমন ধরো এই বয়েস কমিয়ে বলা,—তা সে অত ধরা চলে না—অমন পায়ের ওপর পা দিয়ে খাবার সংস্থান থাকলে তোমার আমারও হ'তো...."

অন্নদাচরণ বলিলেন—"হ্যাঁ, বয়েসটা যেন একটু বেশিই মনে হ'ল।"

নিকুঞ্জলাল মাথাটা একটু হেলাইয়া বলিলেন—মনে হওয়া-হউয়ি নয়, বেশিই; আমার কাছে তো লুকুনো নেই—কুষ্ঠি-ঠিকুজি পর্যন্ত তোয়ের ক'রে দিতে হয়েছে। তবে হ্যা, আমাব চেয়ে ছোটই; তবে তোমার চেয়ে বড়ই; তোমার কত যাচ্ছে?"

অন্নদাচরণ বলিলেন—"আমার এই চোতে একচল্লিশ গেল।"

নিকুঞ্জলাল কপালে তর্জনীটা চাপিয়া একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—"দাঁড়াও, তাহ'লে একটু ভুল হ'য়েছে—পরেশ তাহ'লে তোমার চেয়েও একটু ছোটই হয়; পরেশের হ'ল....মানে, এই গেল মাঘে আটত্রিশে পড়েছে, ঠিকুজির বয়েস বলছি। তাহ'লে হ'ল না তোমার চেয়ে বছর দু'একের ছোট?"

একটু চুপ করিয়া বলিলেন—"চুলোয় যাক, বাজে কথা বেড়ে যাচ্ছে। তোমায় যার জন্যে ডাকা,—তোমার উপর হঠাৎ যেন একটু নেকনজর বলে বোধ হল—আমি লক্ষ্য ক'রে দেখছিলাম কিনা কাল....খপ্ ক'রে নেমন্তন্ন পর্যন্ত ক'রে বসলো...."

অন্নদাচরণ একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"হ্যাঁ, অতি সজ্জন....কিন্তু সেই কথা ভাবছিলাম দাদা—যাওয়াটা কি ঠিক হবে? আমাদের মতো লোক—ওঁদের দেউড়ি মাড়াবার যুগ্যি নই...."

নিকুঞ্জলাল অন্নদাচরণের হাঁটুর উপর চারিটি আঙ্গুল চাপিয়া তাঁহাকে

থামাইয়া বলিলেন—"শোন অন্নদা, ঐ জন্যই তোমায় ডাকা। নিকুঞ্জ দাদাকে কি মনে করবে জানি না, তবে নিকুঞ্জদাদা যে-পরামর্শটা ভালো মনে করেছে, চিরকাল দিয়েও এসেছে, দেবেও।—তোমায় যেতে হবে, আর টাটকা-টাটকি, আর 'তুমি' বললেই 'ও সন্তুষ্ট হয়, 'তুমি'ই বলতে হবে।"

অন্নদাচরণ একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। নিকুঞ্জলাল বলিলেন—"অবিশ্যি ঐ যে বললে সজ্জন, তা খুবই সজ্জন পবেশ ; তবে আমরা হচ্ছি গেরস্ত মানুষ, রাজারাজড়ারা সজ্জন কি দুর্জ্জন অত বুঝি না, আমাদের কাজ হাঁসিল হ'লেই হ'ল। তাহ'লে সব কথাটা তোমায় খুলেই বলি,—মানুষটা সজ্জন বলেই, ওর স্বভাব জানি বলেই, আব সবাইকে ছেড়ে তোমাকেই কাল ডাকিয়ে আনালাম, ভাবলাম যদি একটু সুনজরে পড়ে যায় অন্নদা তো একটা আখের হয়ে যাবে। তা দেখলাম দেখা মাত্রই তোমার ওপর কেমন একটা ভালো ধারণা জন্মে গেল—অবিশ্যি আমিও আগে থাকতে জমি ঠিক করে রেখেছিলাম, আর তোমার কথাবার্তাগুলিও খুব বিবেচকের মতোই হয়েছিল। তবে কি জানরে ভাই?—যতই বল, যতই কও, রাজারাজড়ার মন। ও টাটকা-টাটকি যতটা হয় কাজ আদায় করে নেওয়াই হুসিয়ারের কর্ম। তাই বলছিলাম,—বলে গেছে, একবার দেরি না করে গিয়ে পড়ো, নিজে সেদে তো যাচ্ছ না যে লজ্জা আর কুণ্ঠা। একটু দহরম-মহরম তো হ'ক, তারপর আমি আছি। অন্তত একটা মোটা বিদেয় তো নিয়ে এসো আপাতত।"

নন্তী কলিকাটা সাজিয়া হুঁকায় বসাইয়া বাপের হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিয়া গেল। নিকুঞ্জলাল দুইটা টান দিয়া হুঁকামুখেই অন্নদাচরণের পানে চাহিয়া মিটি মিটি হাসিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন—"অন্নদা

ভাবছে, নিকুঞ্জদাদা আচ্ছা মতলববাজ মানুষ তো। তা একটু মতলব খাটাচ্ছি বৈ কি, তোমাদের পর বলে ভাবতাম, গা করতাম না। এই সময় রসিকেরও একটু নামডাক হচ্ছে, একটা অমন জমিদারবাড়িতে, বেশি না, যদি মাসে একটা করেও ডাক পায় তো....রাবণের গুষ্টি, লেগেই তো রয়েছে একটা না একটা ওসুখ-বিসুখ...”

পূর্বসম্বন্ধের ইতিহাসে যা কিছু গলদ আছে সমস্ত ভুলিয়া অন্নদা-চরণের মনটা ভিতরে ভিতরে কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছিল; বলিলেন—“একটু কুণ্ঠিত হচ্ছিলাম দাদা, না হচ্ছিলাম যে এমন নয়; তবে ভেবে দেখছি আপনার পরামর্শই ঠিক। মেয়েটা ওদিকে তরতর ক’রে বেড়ে উঠছে, একটা বেশ বাঁধা গোছের উপার্জন নেই—আমার হাত খালি, ওর বাপেরও ওদিকে চাড় নেই.. এই সময় ভগবান যদি নিজে একটু যোগাযোগ করে দিলেন তো ছাড়া কোন মতেই উচিত নয়....”

শেষের কথাগুলো নিকুঞ্জলাল তীক্ষ ঔৎসুক্যে শুনিয়া যাইতেছিলেন; অভীপ্সিত সুযোগটাকে আপনা হইতেই এত কাছে আসিয়া পড়িতে দেখিয়া প্রায় সংযম হারাইয়াছিলেন: কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইলেন এবং অত্যন্ত ঘন-ঘন হুঁকা টানিতে লাগিলেন। তবু মনটা খুব তোলপাড় করিতে লাগিল। আরও অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল, আরও অনেক সৎপরামর্শ; এই পরিচয়টাকে কত রকমে কামধেনু করিয়া লওয়া যায় এবং উচিত—এই সব নানারকম হিতৈষণার কথা। সবশেষে, প্রস্তাবটা একেবারে পুরাপুরি না আনিয়া ফেলিলেও সামান্য, অতি সূক্ষ্ম একটি ইংগিত দিয়াই রাখিলেন নিকুঞ্জলাল, কথাটা এক সময় পাড়িবার সুবিধা হইবে। খুব চটুল একটি হাসি হাসিয়া কহিলেন—“আরও একটা জাঁদরেল মতলব ঠাউরে আছি হে অন্নদা, নেহাত বসে নেই তোমার নিকুঞ্জদাদা।”

অন্নদাচরণের আন্দাজটা অত বেশি উঠিতে পারিল না, তবু একটু আশান্বিত ভাবেই প্রশ্ন করিলেন—"কি মতলব দাদা ?"

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—"দেখবে, দেখবে ; তখন বলো..."

আরও সূক্ষ্ম একটি হাসি ঠোঁটে জাগাইয়া মৃদু মৃদু তামাক টানিতে টানিতে আড়চোখে অন্নদাচরণের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

যাওয়াই স্থির হইল, তবে বর্ষার সময়টা চাষবাসের হাঙ্গামাটা একটু লাগিয়াই থাকে, যাই-যাই করিয়াও দেরি হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে নিকুঞ্জলালের কাছে দুইখানি চিঠি আসিল—"ছোট গুরুঠাকুর"-এর পায়ের ধূলা না পড়ার জন্য অনেক দুঃখ-অভিমান করিয়া লেখা।—পরেশনাথ কি এতই অযোগ্য ? প্রথম সাক্ষাতে আলাপ-পরিচয়ে কি কোন অপরাধ হইয়া পড়িয়াছিল ? হইলেও যে শিষ্যস্থানীয়, সন্তানস্থানীয়,—তাহার জন্য কি ক্ষমা নাই ?....এইরকম অনেক করিয়া লেখা। নিকুঞ্জলাল দ্বিতীয় চিঠিটা হাতে দিয়া একটু ক্ষুণ্ণভাবেই মুখটা গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"দেখোহে, উত্তরটা তুমিই না হয় দিয়ে দাও যা হয় একটা, একদিকে জমিদার-শিষ্য, একদিকে ভাই, আমি মাঝখান থেকে কথাটা দিয়ে বড়ই অন্যায় করেছিলাম, এখন বুঝছি। এদিকে আমারও একবার যাওয়া দরকার, বাড়ি বয়ে এল অত বড় লোকটা ;—কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, তুমি একবার হয়ে না এলে আমি কোনমতেই তার সামনে হতে পারছি না..."

কাজের সঙ্গে সত্যই একটু কুণ্ঠাও লাগিয়াছিল,—অলক্ষ্য হইলেও গড়িমসি করিবার সেইটেই বোধ হয় বিশেষ কারণ ; কিন্তু আর ঠেলিয়া রাখা গেল না ! ভাদ্রের মাঝামাঝি অন্নদাচরণ দ্বিধাসঙ্কোচ লঙ্ঘন করিয়া

যাত্রা করিলেন। নিকুঞ্জলালের পরামর্শ মতোই কথাটা গ্রামে এবং বাড়িতেও গোপন রাখা হইল। নিকুঞ্জলাল বলিলেন—"লোকের নজর বড় খারাপ হে, সেদিন কটা টাকা প্রণামী দিয়ে গেল, তাইতেই অনেকের চোখ করকর করছে। থাক্না, লক্ষ্মীর যদি হয় কৃপাদৃষ্টি—মা যদি আসেনই আলো করে তো কারুর জানতে তো বাকি থাকবে না। বাড়িতেও এখন কাজ নেই জানিয়ে—মেয়েদের পেটে থাকেই না কথা, আর ভাইটিতো দেখতেই পাচ্ছ—বোধ হয় পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে বসে এই নিয়ে এক মহাকাব্যই লিখে সাতখানা গ্রামে ঢেটরা পিটিয়ে বেড়াবেন!"

ঢেঁটরা পিটাইলেন অন্নদাচরণ নিজে। শ্বশুরবাড়ির নাম করিয়া দিন পাঁচেক পরে হরিপুর হইতে ফিরিয়া মাসাধিক তাঁহার মুখে আর অন্য কথাই রহিল না এক রকম।

বাড়ি যখন ফিরিলেন তখন বৈকাল। বসন্তকুমারীর এ সময়টা পাড়ায় টহল দেওয়ার জন্য আলাদা করিয়া রাখা; জানা থাকিলেও একবার খোঁজ করিলেন, না পাইয়া রসিকলালের খোঁজ করিলেন। হারাণ খিড়কির পুকুরের ধারের বেড়াটাতে গোটাকতক নূতন বাঁধন দিতেছিল, আসিয়া গড় করিয়া দাঁড়াইল। অন্নদাচরণ তাহার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"এই যে! তা আজ বেরুস নি যে?"

হারাণ বলিল—"সেই কথাই তো এতক্ষণ ছোট মাকে কইছিলুম—বলি, বেরঘোর দাগা ষাঁড়ের মতন কাঁধে বাক্সটা চাপ্যে একা টহল দিয়ে বেড়ালে যদি চলতো তো না হয় একাই...."

অন্নদাচরণ রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ও! আর তিনি বুঝি

কাব্যি করে বেড়াচ্ছেন ? সংসারের এই অবস্থা, ঘাড়ে আইবুড়ো মেয়ে ! দাদা আছে, কিসের তোয়াক্কা ?....তা বলে দিবি, দাদাও তোয়াক্কা রাখে না কারুর,—কারুর তোয়াক্কা রাখে না। ঘুড়ি-টুড়ি বেচে ফেলে ও ওর ছড়া লেখা নিয়েই থাক,—ঘুরে দেখবার কিচ্ছু দরকার নেই, যাঁর দেখবার তিনি দেখছেন। বলে দিবি দেখে নিতে'—একা, কারুর একটি কানাকড়িও স্পর্শ না করে যদি আমি গিরির বিয়ে না দিতে পারি তো...."

এমন সময় সদর দরজা দিয়া মন্থর গতিতে বসন্তকুমারী প্রবেশ করিলেন, বলিলেন—"এসেই আরম্ভ হয়েছে ? শ্বশুরবাড়ি হপ্তাকে হপ্তা কাটিয়ে এসেই মুখ-সাপট, তা না হলে আর পুরুষ মানুষ কিসের !"

অন্নদাচরণের ঠিক রাগের মেজাজ ছিল না, পুরুষকারের জন্য দম্ভটাই ওই ছদ্মরূপে বাহির হইতেছিল ; বসন্তকুমারীর উপস্থিতিতেই ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন। একটু হাসিয়াই ঠাট্টার ভাবে কহিলেন—"এই যে, এসেছ, তাই তো বলি—টহলদার না হলে টহলদারের জন্য ওকালতি করে কে ! এদিকে একটা মানুষ যে দশ কোশ পথ বেয়ে...."

অন্নদাচরণের মেজাজ ভালো থাকুক, কিন্তু বসন্তকুমারীর ছিল না, না থাকিবারই কথা। একটু বেশ খোঁচা দিয়াই বলিলেন—"দশ কোশ পথ বেয়ে যে আবার আসবে, শ্বশুরবাড়ির আদর ছেড়ে সে আবার নিজের কুঁড়ের কথা মনে পড়বে, এ-ভরসা ছিল না। থামো বাপু, আমায় খেপিয়ে তুলো না, তুই ভাইয়ের আক্কেল দেখে দেখে...."

অন্নদাচরণ রহস্যচ্ছলেই বলিলেন—"অথচ নিজেই বে-আক্কেলের মতো কথা বলছ, শ্বশুরবাড়িতে শুক্‌ন আদর নিয়ে থাকা চলে কখনও ? শ্বশুরবাড়ির যা সার বস্তু তা'তো এইখানেই...."

রান্নাঘরের দোরের অন্তরালে ভ্রাতৃবধূর কুতূহলী ঘোমটার পাড়টায়

নজর পড়ায় থামিয়া গেলেন। হারাণ তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, হু কাটা হাতে করিয়া একটা টুলে বসিয়া কয়েকটা টান দিলেন। কি ভাবে যে আরম্ভ করিবেন যেন বুঝিতে পারিতেছেন না, শেষে কোটের পকেট থেকে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া বলিলেন—"নাও, এইটে আগে তুলে রাখো একেবারে আলাদা করে।"

ব্যাগটাকে এত স্ফীতোদর খুব কমই দেখা গিয়াছে। বিশেষ করিয়া পাঁচটা দিনের প্রবাসের পর উদরটা খালি থাকিবারই কথা; বসন্তকুমারী উপরে-উপরেই একবার টিপিয়া একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন—"অনেকগুলো টাকা যেন মনে হচ্ছে; কার গা?"

"খুব জিগ্যেস করা তো!—অন্য কার টাকা তোমায় বাক্সয় তুলতে বলব? পাঁচদিন শ্বশুরবাড়ি আদর খেয়ে আমার মাথা এতটা খারাপ হয় নি।"

"রঙ্গ রাখো; কত টাকা আছে?—ধার করলে না কি?"

কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিবার জন্য অন্নদাচরণের জিব নিস্-পিস্ করিতেছিল, বলিলেন—"নাঃ, তোমাদের কাছ থেকে পার পাবার জো নেই। যদি বলি ধার নয়, তখন,—'কোথা থেকে এল তাহ'লে?—কি বৃত্তান্ত?'....বলব একদিন, শুনো'খন, তাড়াতাড়ি কিসের?"

স্ত্রী অভিমানভরে মুখ ভার করিয়া বলিলেন—"ঘাট হয়েছে, এত কথা উঠবে যদি জানতাম...."

ঘরের পানে পা বাড়াইতে অন্নদাচরণ বলিল—"এতে আর রাগের কি হয়েছে? শুনবে শোন, লুকবার আর কি আছে? চুরি করেও আনা নয়, চামারি করেও আনা নয়।....লক্ষ্মণ দেওরটিকে বললে গায়ে লাগে, কিন্তু সংসার করতে হ'লে, শুধু পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে কাব্যচর্চা নিয়ে থাকলেই চলে না, পাঁচটা লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, দু'টো

ভাল-মন্দ কথা বলতে শিখতে হয়, সমাজের মধ্যে যাকে বলে' বিশিষ্ট—তাই একজন হ'তে হয়।"

গিরিবালা জেঠাইমার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়া নিকুঞ্জলালের বাড়ি একটু আটকাইয়া পড়িয়াছিল, আসিয়া উপস্থিত হইয়াই বিস্মিতভাবে বলিল—"ওমা, জেঠামশাই কখন এলে ?"

আজকাল আর ছুটিয়া চলে না, বিশেষ যদি মা বা জেঠাই কাছে-পিঠে থাকে ; তবুও কয়েকদিন পরে জেঠামশাইকে পাইয়া যেন বর্তাইয়া গেছে, ওরই মধ্যে একটু অসংযত গতিতে কাছে আসিয়া বলিল—"কখন এলে জেঠামশাই ? ওমা, এখনও জামা জুতো পর্যন্ত খোলেন নি !...."

জামার বোতাম খুলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অন্নদাচরণ কন্থার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া বলিলেন—"তাই তো বলি, মায়ে আর অন্য জনে তফাৎ আছে বৈ কি। একজনের কাছে বাড়িতে ঢোকবা মাত্রই তাড়া ...নাঃ, চটিয়ে কাজ নেই ; মায়ের আদর আর কদ্দিনই বা খাব ?"

বিদায় দেওয়ার সুযোগে আনন্দও হয়, এদিকে আবার কথাটা মুখে আনিলেই গলাটা ভারী হইয়া আসে। গাঢ় প্রীতিভরে পিঠে আরও গোটাকতক টান দিয়া একটু চুপ করিয়া তামাক খাইলেন, তাহার পর বলিলেন—"হ্যাঁ, যা বলছিলাম, পাতুলে যাই নি, শ্বশুরবাড়ি যাবার ভারী ফুরসৎ !"

বসন্তকুমারী অতিমাত্র আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিয়া বলিলেন—"তবে ?"

অন্নদাচরণ বলিলেন—"সেই সেবারে নিকুঞ্জদার ওখানে হরিপুরের রাজা এসেছিলেন, মনে আছে ?"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"ওমা, মনে থাকবে না ? অতগুলো টাকা পেন্নামি দিয়ে গেল...."

"নিজে হ'তে দেয় না, আদায় করতে জানতে হয়।....তারপর গিয়ে অবধি চিঠির উপর চিঠি, কি নজরে যে দেখে ফেলেছিল! তা ফুরসৎ হ'লে তবে তো যাবে মানুষে?—শেষে আর ঠেকানো ভালো দেখায় না দেখে দুর্গাশ্রীহরি বলে...."

রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া কথাগুলো এমন অবহেলার সহিত বলিয়া যাইতেছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অনাড়ম্বর ভাবে নিজেকেও এমন একটি মর্যাদা দিয়া যাইতেছিলেন যে বসন্তকুমারী বিস্ময়ের আর কুল পাইতেছিলেন না; খানিকক্ষণ অবাক হইয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"হ্যাগা, দামুদিদি বলছিল তারা সত্যিই মস্ত বড মানুষ!....পারলে চিনতে? যত্নআত্যি...."

"চিনতে পারার কথা কি? কোথায় রাখবে, কি করবে ভেবে পায় না। বড় মানুষ কি আমিও দেখি নি?—দেখেছি; বাড়িতে একটা মহল বাড়ল, কি একতলার উপর খানকতক ঘব উঠল তো মাটিতে পা পড়ে না।...তিন মহলের দেউড়িবাড়ি, সদর দরজায় ভোজপুরি দরোয়ান মোতায়েন, জুড়ি গাড়ি; লোকজন, আমলা-পাইক গিজগিজ করছে; কিন্তু একবার মনে হবে যে এই লোক এইসবের মালিক?—আর 'ছোট গুরুঠাকুর' বলতে তো অজ্ঞান; কটা দিন রইলাম, একটু চোখের আড়াল করা নয়, সর্বদা কাছে বসিয়ে আলাপ-আলোচনা সলা-পরামর্শ; কেউ এল তো—আর লোকজন আসা তো লেগেই রয়েছে—অমনি পরিচয় ক'রে দেওয়া,—তেজপুরের অমুক বাঁড়ুজ্জে—আমার বড়ঠাকুরের ভাই, মহা বিচক্ষণ ব্যক্তি। হেন-তেন, অত কি মনেও আছে? ভেবেছিলাম—গিয়ে একটা দিন কোন রকমে কাটিয়ে চলে আসব, রাজবাড়িতে থাকা কি আমাদের ধাতে পোষায়? তা আসতে দিলে তো! আজকাল, আজকাল ক'রে শেষে আসবার সময়

প্রণাম করে দশ টাকার ঐ দশখানি নোট, তাও কত যেন 'কিন্তু',—'বুঝছি, আপনার উপযুক্ত হ'ল না....সামনে পূজোর খরচটা রয়েছে, নইলে....' ”

সকলে স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছে—চিত্রার্পিতের মতো, আওয়াজ যাহাতে রান্না ঘরে ভ্রাতৃ-বধু পর্যন্ত পৌছায়, অন্নদাচরণ গলাটা তদুপযোগী বড় করিয়া লইয়াছেন ক্রমে। হারাণকে একবার সতর্ক করিয়া দিলেন—“শুনছিস শোন, বাড়ির চাকর ক্ষতি নেই, তবে খবরদার—বাইরে লোক জড়ো করে ঢাক পিটোবি নি, তোর আবার সে-রোগটি আছে। মানুষের কুনজর পড়তে দেরি হয় না, আর যা সব শুভাকাঙ্ক্ষী চারিদিকে !”

বসন্তকুমারী বলিলেন—“হ্যাঁগা, সত্যি সব ? তা মিথ্যেই বা কেন বলবে বাপু ? আর ঐ তো টাকাও রয়েছে। কিন্তু কেমন কেমন একটু যেন ঠেকছে বাপু।....তাই বা কেন গা ? ভগবান যেমন মন্দ গড়েছেন, তেমনি আবার ভালো লোকও কি গড়েন নি ?”

একটু চিন্তান্বিতই রহিয়াছেন যেন, কোথায় বেশ পরিষ্কার হইতেছে না যেন ব্যাপারটা। অন্নদাচরণ আবার এক চোট আরম্ভ করিবার জন্য হুঁকা টানিয়া দম সংগ্রহ করিতে লাগিলেন ; চাপা আবেগে মুখটি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। হারাণ আবার বেড়ায় বাঁধন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। গিরিবালা ঔৎসুক্যবশে কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, এমন সময় বসন্তকুমারী যেন কতকটা নিজের মনেই বলিলেন—“ভালোই ;—ভগবান একটু মুখ তুলে যদি চান....”

অন্নদাচরণ বলিলেন—“চাইবেন। তবে দেওরটিকে একটু গা করতে বলো। একটু মানুষ হ'তে বলো। নিকুঞ্জদাদা অভিভাবকের মতো রয়েছেন, আমিও একবার হয়ে এলাম, এই সময় পশার-টশার

হচ্ছে,—মাসে একবার করেও যদি হরিপুরে ডাক হয় তো টাকা কামিয়ে এলে যাবে। তুলেও এসেছি কথাটা একটু, তবে দু'চারবার হাঁটাহাঁটি করতে হবে,—তা ও যাবে?....আর যায়ই যদি তো কথাবার্তায় দিব্যি একটা বিচক্ষণ মানুষের মতো....”

বসন্তকুমারী বলিলেন—“হাবা নয়, বোকা নয়, পারবে না কেন? আর হবে পারতে, ভগবান যখন দিচ্ছেন একটু সুবিধে করে....”

নিকুঞ্জলাল গ্রামে ছিলেন না। সন্ধ্যার সময় অন্নদাচরণ ঘোষালদে'র বাড়ি, মিত্তিরদের বাড়ি, এবং গতায়াত আছে এমন আরও দু' একটা বাড়ি চক্কর দিতে গেলেন। যেখানেই গেলেন হরিপুরের রাজবাড়ির পরিচয়ের টুকরা-টাকরা একটু ছাড়িয়া আসিলেন, অবশ্য, খুব অনাসক্ত-ভাবে।—“হ্যাঁ, নাম-ডাক যা শুনেছিলাম, তা মিছে নয়। অবিশ্যি, তাই বলে যে বলতে হবে জনাইয়ের মুকুজ্জে কি মনসাতলার রায়েদের মতন কিছু-একটা তা নয়, তবে আমাদের বেলে-দক্ষিণ-পাড়ার চৌধুরীরা....নাঃ, কিসে আর কিসে!....তা হোক গে, টাকা কিছু সবার সমান হয় না, তবে মেজাজ!—হ্যাঁ, সে একটা দেখবার জিনিস বটে।—কি দরাজ হাত! দান ধ্যান সদাব্রত—সে এক এলাহি কাণ্ড, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।”

বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া যেটুকু সময় রহিল, ফিরিবার পথে ধর্মতলার চাতালে কাটিল, জায়গাটা পাড়ার আড্ডা, অনেকেই সন্ধ্যার পর সমবেত হয়। জমিদারবাড়ি লইয়াই আলোচনা চলিতেছিল—চৌধুরীদের ভাগাভাগি হইয়াছে, এইবার পূজা হইবে দুইটা, রেষারেষির মধ্যে ঘটাটাও এবার অন্যবারের চেয়ে হইবে বেশি করিয়াই....

অন্নদাচরণ উপস্থিত হইলেন। তর্কালঙ্কার বলিলেন—“এই যে

অন্নদা, কটা দিন ছিলে কোথায় হে? রসিক বললে—'শ্বশুরবাড়ি'। জিজ্ঞাসা করলাম—এতদিন শ্বশুরালয়! নূতন বিবাহ করলে নাকি দাদা তোমার?....হাঃ-হাঃ-হাঃ....তারপর?...."

অন্নদাচরণ হাত বাড়াইয়া বলিলেন—"শ্বশুরবাড়ি! ভায়া খুবই ফুরসৎ দেখছেন দাদার!....দাও।"

তর্কালঙ্কারের হাত হইতে নস্যের ডিবাটা লইয়া বলিলেন—"একটু বাইরে বরাৎ ছিল।....রেষারেষির কথা কি হচ্ছে?"

"এবারে চৌধুরীরা পৃথক হ'ল কিনা, প্রতিমাও দু'টো হবে। অনাথ বলছে—পূজো কাকে বলে এবার দেখিয়ে দোব। অনন্ত আবার একটু কৃপণ কিনা...."

অন্নদাচরণ নস্য লইয়া ডিবাটা ফেরৎ দিলেন; হাতটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন—"খুড়োর ওপর যদি এতই টেক্কা দেবার ইচ্ছে অনাথের তো এই বেলা লোক পাঠিয়ে দিক না, হরিপুরে কেষ্টনগরের কুমোরেরা এসেছে, ক'জনকে নিয়ে আসুক...."

ওদিক থেকে একজন প্রশ্ন করিল—"হরিপুরের রাজাদের বাড়ি?"

অন্নদাচরণ বলিলেন—"রাজা না হাতি; জমিদারই, তবে হ্যাঁ, জমিদারেরই যা বোলবোলাও দেখে এলাম, তাতে অনেক রাজ-রাজড়াকেও মাথা হেঁট করতে হয়...."

পরদিন সন্ধ্যার পর নিকুঞ্জলাল ফিরিলেন; উচ্ছ্বসিত বিবরণ, মায় প্রণামির কথাটা পর্যন্ত তামাক টানার মধ্যে অল্প অল্প মাথা দুলাইয়া শুনিয়া বলিলেন—"হ'ল তো? অথচ তুমি ভয় পাচ্ছিলে যেন তোমায় বাঘের মুখেই পাঠাচ্ছে, কি সিংগীর মুখেই পাঠাচ্ছে নিকুঞ্জদাদা!....তবে নিকুঞ্জ-দাদার ঐ এক কথা সর্বদাই মনে রাখবে রে ভাই;—ওরা রাজা, আমরা গেরস্ত; টাটকা-টাটকি নিজের কাজটুকু গুছিয়ে নেওয়া...."

পরের দিনটা আর পারিলেন না, তাহার পরের দিন নিজেই হরিপুর যাত্রা করিলেন।

৮

রসিকলালের শরীরটা একটু অসুস্থ ছিল, পরদিন সকালে আর বাহির হইলেন না। কয়েক জায়গায় প্রযোজনায় ঔষধ বিলি করিয়া প্রায় দুপুরের কাছাকাছি হারাণ গরগর করিতে করিতে বাটীতে প্রবেশ করিল—"হারাণে ব'লে বেড়াবে!—ব'লে বেড়াবে কি, সওয়ালেব জব্যব দিতে দিতে হারাণের পথচলা দায় হ'য়ে উঠেছে; বেলে-তেজপুরে বোধ হয় হেন একটি লোক নেই, যে হরিপুবের বাবুদের কথা না জানে। প্রাণের দায়ে রাস্তা ছেড়ে বনবাদাড় ধ'বে এস্‌ব—সেখানেও—'কিরে হারাণ, তোর বড়কর্তা নাকি হরিপুরে গিয়ে....' "

"দাদাতো?"—বলিয়া রসিকলাল বাহিরে আসিয়া এই সুযোগে অগ্রজের চরিত্রের এই হালকা দিকটা লইয়া একটা সুমিষ্ট মন্তব্য করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়—"কৈ গো দিদি!" বলিয়া কাত্যায়নী সদরের দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে একটি পোঁটলা হাতে করিয়া বিকাশ।

"কাতু দিদি যে!"—বলিয়া রসিকলাল দাওয়া হইতে নামিতে নামিতে কহিলেন—"কি সৌভাগ্য! পথ ভুলে নাকি?....অ বৌদি, কে এসেছে বেরিয়ে দেখসে।....বিকাশও এসেছ? বাঃ, বেশ!"

বসন্তকুমারী ওদিককার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।—"কে, আমাদের কাতু? ওমা, তাই বলি সকাল থেকে বাঁ চোখ নাচে কেন! বিকাশও এসেছিস যে! অনেকদিন পরে; আমি এই সেদিন ছোট

ঘউকে বলছিলাম—বলি—'হ্যাঁরে, বিকাশ এদিকে প্রায় বছরখানেক হ'ল আসে-'নি, তেজপুরের বড়পিসিকে ভুলে গেল নাকি ?....থাক্, থাক্, হয়েছে বাবা, দীর্ঘজীবী হও, বংশের মুখ উজ্জ্বল করো...."

কাত্যায়নী বলিলেন—"তোমাদের আশীর্বাদে তারই যেন একটু রাস্তা হয়েছে দিদি। আর বছর তো অসুখে অসুখেই গেল। এ বছর সুভালাভালি পাসটা দিলে ; কবে সিংহবাহিনীর তলায় নাকি মানৎ করে গেছল তাই দিতে...."

বসন্তকুমারী দেবরের পানে চাহিয়া বলিলেন—"পাসের খবর তো ঠাকুরপো অনেকদিন হ'ল দিয়েছিলে...."

কাত্যায়নী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ওমা, তা জান না বুঝি ?—ভাইপো তোমাদের সেয়ানা কত !...."

বিকাশ লজ্জিতভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ছোটপিসিব ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

কাত্যায়নী একবার তাহার পানে চাহিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন—"পাস করার খবর পাওয়া অবধি ক্রমাগত খ্যাচকাচ্ছি—'ওরে বিকাশ চ', ঠাকুর-দেবতার নামে মানৎ, পূজোটা চুকিয়ে আসি।'....কোন মতে গা করে না, কোন মতে গা করে না ; শেষে একদিন খিঁচিয়ে মিচিয়ে বললে 'হ্যাঁ, আমায় তেমনি বোকা পেয়েছেন কিনা,—ঘরের পয়সা বের করে পূজো দোব ! পাস করার খবর পাওয়ার দিনই মনে মনে বলে দিয়েছি—জলপানি না পেলে....' "

তিনজনেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। বসন্তকুমারী হাস্যজনিত অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন...."কি জ্বালা, ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে এ কি তঞ্চকতা বল দিকিন !....চল্, আয় ; উঠোনেই দাঁড়িয়ে আছি।"

ঘরের দিকে যাইতে যাইতে কাত্যায়নী কাহিনীর জেরটা ধরিয়া

বলিলেন—"তা অমন না হলে জব্দও হন না ঠাকুর, দিদি।....জলপানির খবরটিও পাওয়া গেল, প্রথম টাকা হাতে আসতে এই ধরে' নিয়ে এসেছি।....বরু কোথায়? গিরি, ছেলেরা?....পুতী মামার বাড়িতেই আছে তো?....কতদিন যে দেখিনি!"

রসিকলাল বলিলেন—"এ পূজোও ঠিক যে সিংহবাহিনীর পাওনা বলব, তা বলব না,—বিকাশ যে জলপানি পাবেই এতো ধরা কথা। আজকের পূজোর জোরে ওকে যদি বড় একজন নেতা, কি বড় একজন কবি...."

ভাজ বক্র দৃষ্টিতে দেবরের পানে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া বলিলেন—"ক্ষ্যামা দাও বাবু, সিংহবাহিনীর মানৎ করেই বুঝি নিজে কবি হয়েছ?—উঠতে বসতে দাদার মুখনাড়া, উঠতে বসতে...."

আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসি থামিলে বলিলেন "গুণধর পিসে-শালাপোর কথায় হাসব কি তোর কথার জবাব দোব?.... ছেলেরা ইস্কুলে, ছোট-বৌ গিরিকে নিয়ে ঘোষালদের বাড়ি সাধের নেমন্তন্ন খেতে গেছে। নে, হাত মুখ ধো কাতু।"

বিকাশ একটু একলা পড়িয়া গিয়া ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, বসন্তকুমারী প্রবেশ করিয়া দেখিয়াই বলিলেন—"ওমা, চুপ ক'রে বসে রইলি যে বিকাশ!—নে, হাত-পা ধুয়ে নিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'....এ যেন মনে হচ্ছে আবার সিংহবাহিনীকে কি করে ফাঁকি দিবি মনে মনে তার মতলব...."

আবার হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ঐ রকম হাস্যোচ্ছল প্রসন্ন আলাপের মধ্যে দিয়া অভ্যাগতদের তত্ত্বাবধান চলিল।

হারাণকে এসব বলিয়া দিতে হয় না, নিজেই গিয়া ঘোষালবাড়িতে

বরদাসুন্দরীকে খবরটা দিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া দুপুরের একটু পরেই গিরিবালাকে লইয়া তিনি চলিয়া আসিলেন। বেটাছেলেদের আহার হইয়া গিয়াছিল। বসন্তকুমারী আর কাত্যায়নী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিশ্চিন্তভাবে গল্প করিতে করিতে আহার করিতেছিলেন, এমন সময় কন্যাকে লইয়া ত্বরিতপদেই বরদাসুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শয়নকক্ষের দিকে নজর ছিল, কাত্যায়নী বলিলেন—'এদিকে।....দিব্যি মা যাহোক, মেয়ে সাতকোশ থেকে এসে হা-পিত্তেস ক'রে ব'সে, আর মা ওদিকে নেমন্তন্ন খাওয়ায়...."

গিরিবালা পরিবর্ধমান বয়সের সব গাম্ভীর্য এক নিমেষে ভুলিয়া গেল, একরকম ছুটিয়াই গিয়া মাসিকে জড়াইয়া তাঁহার কোলে মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া প্রশ্নে প্রশ্নে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

বরদাসুন্দরী বলিলেন—"সে কথা বলতে পারবে না দিদি। হারাণের মুখে শুনে ওবধি কি আর ওর তর সইছিল একটু? কেবলই—'মা চলো,' কেবলই—'মা চলো'।....যত গা টিপে বলি রোস, এসেছিস একটা বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে...."

কাত্যায়নী হাসিয়া উঠিলেন, বসন্তকুমারীকে সাক্ষী মানিয়া বলিলেন —"শুনে যেও দিদি, বলে ধম্মের কল বাতাসে নড়ে,—মা আর বোনে তফাৎ নেই? অ্যাদ্দিন পরে দিদি এত দূর থেকে এল, নেমন্তন্নের লোভে বোন...."

ভগ্নী রাগের অভিনয় করিয়া বলিলেন—"দেখো তো কথার ঢং! আমি তাই বললাম নাকি? তুমিই বল দিদি—পাঁচটা মানুষ একত্তর হয়েছে—পারা যায় সেখানে তাড়াহুড়ো লাগিয়ে গেরস্তকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে?....তবুও দিদির আসার কথা শুনে আমার মনটা আন্‌চান্ করছিল, ওদের সেজবউকে বলে কয়ে ওপর ঘরে আলাদা জায়গা করিয়ে

খেয়ে দেয়ে আসছি। তাতেও কি তাড়া মেয়ের!—আদ্দেকটা নাকে-মুখে গুঁজে....”

কাত্যায়নী বোনঝিকে বাঁ হাতে জড়াইয়া বুকের কাছে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন—“বেশ করেছে আদ্দেক খেয়ে উঠে এসেছে, বাকি ক্ষিদেটুকু আমার পাতে মেটাবে, না হ'লে আমারও মনে একটা খুঁৎখুঁতুনি থেকে যেতো। সিমুরে আমার পাতে খাওয়া গিরির একটা নিত্যকৰ্ম্ম ছিল কিনা।”

বসন্তকুমারী একটু বেদনা-স্তিমিত কণ্ঠে বলিলেন—“নে খাইয়ে সাধ করে যটা দিন পারিস, আর তো হয়ে এল।”

“ইস্, তাই নাকি?....”কি একটা বলিতে গিয়াই কাত্যায়নী সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেলেন। হঠাৎ যে একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেছেন সেটা কেহ বুঝিবার আগেই গিরিবালাকে বুকের আর একটা চাপ দিয়া হাতটা গুটাইয়া লইলেন, থালাটা তাহার সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—“নে, খেয়ে নে।”

বসন্তকুমারী আর বরদাসুন্দরী দু'জনেই বলিয়া উঠিলেন—“দেখো কাণ্ড! ওকি খাওয়া হ'ল?”

কাত্যায়নী বলিলেন—“পথ চলে এলে নাকি ক্ষিদে থাকে? আমার তো কমে যায় বাপু, কেমন উল্ট-ধাত। আর, যা একরাশ দিয়েছিলেন দিদি!....নে, খেয়ে নে গিরি। তোর আবার বিকাশদাদা এসেছে, ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়, নইলে এতক্ষণ তো ক'বার খোঁজ করলে।”

হারাণ ঝির মারফৎ সংবাদটা পৌছাইয়া দিয়াছিল; সে বিকাশের কথাটা—ভুলিয়াই হ'ক অথবা অপ্রয়োজন মনে করিয়াই হ'ক—আর বলে নাই। গিরিবালা পুলকিত হইয়া বলিল—“বিকাশদাদা?—কৈ, সেকথা তো বলে নি! বলেছিল মা?”

বরদাসুন্দরী বিস্মিত এবং পুলকিত হইয়া বলিলেন—"কৈ মাঁ, সেও এসেছে নাকি ?"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"ঘুমুচ্ছে নিশ্চয় ; থাক একটু, হাক্লান্ত হয়ে এসেছে।"

গিরিবালা নিমন্ত্রণ খাওয়ার মতোই তাড়াহুড়া করিয়া আরম্ভ করিয়া দিল, বলিল—"হ্যাঁ, ঘুমোতে দিলে তো ? এবার এতদিন গিয়ে রইলাম, একদিনের তরেও এলেন না কলেজ ছেড়ে...."

কাত্যায়নী বলিলেন—"তা যাক্, তুলুকগে ; আর সত্যিই তো,—দুটো দিনের জন্যে এসে যদি ঘুমিয়েই কাটাবে তো ভাই-বোনদের সঙ্গে একটু মিশবে কখন ? ওদের জন্যে কলকাতা থেকে কি সব বই কিনে নিয়ে এসেছে, দেবে। কি ভালোটাই যে বাসে ওদের। বিশেষ করে গিবিকে, —গিরির কথা যদি উঠল তো কি বলে যে প্রশংসা করবে ভাই, যেন ভেবে পায় না।"

বসন্তকুমারী একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"নিজের তো আর বোন দিলেন না ভগবান এ পর্যন্ত একটি, সাধ হয় তো ?"

কাত্যায়নী বলিলেন—"ওমা, তা বুঝি শোননি ছেলের কথা ?"

দুই জায়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন, কাত্যায়নী বলিলেন—"একদিন হুট করে বলে বসল—'আমার কি মনে হয় জানো মেজপিসিমা ?—মনে হয় আমার যেন মারপেটের বোন আর না হয়'....'সে কিরে ? বিয়ের ভাবনা নাকি ?'...'না, বিয়ের ভাবনা কেন ?—তাব দিকেই তা হ'লে বেশি টান হবে ; অন্তত গিরি ভাববে নিজের বোনকেই বুঝি বেশি ভালোবাসি।' "

কথাটার মধ্যে হাসির যে কিছু ছিল না এমন নয়, তবে সেই সঙ্গে একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য ছিল, দুই জায়ে স্মিত বদনে একটু চুপ করিয়া

রহিলেন। কাত্যায়নী বলিতে লাগিলেন—“বলে, ওকে বই থেকে যখন বড বড মেয়ে-ছেলেদের কথা পড়ে শোনাই মাসিমা—সীতা হলেন, সাবিত্রী হলেন, দময়ন্তী হলেন, অন্য অন্য দেশেরও মেয়েরা হলেন—এত মন দিয়ে শোনে গিরি!—দেখে নিও, ও-ও এক সময় ওদের মতন হবে।’ ”

কাত্যায়নী একটু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—“সে দৈবজ্ঞির মতন মুখ গম্ভীর করে বলবার যদি ধরণ দেখ! একলা মনে মনে আর কত হাসবো....”

তাহার পর গিরিবালার পিঠে আদরভরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—“বলি, তা হবে বৈকি, হবে না?—অমন চমৎকার স্বভাব, যেখানেই যাক্‌, যার কাছেই যাক, শুধু আশীর্ব্বাদ কুড়িয়েই বেড়াচ্ছে, ও হবে না তো হবে কে?”

গিরিবালা এদিকে মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছে। প্রশংসার চোটে সে ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পডিতেছিল। পলাইতে পারিলে বাঁচে, বিকাশ-দাদার ওখানে মনটাও পড়িয়া আছে, কিন্তু এই সব প্রশংসার মূল উৎস বলিয়াই আপাতত তাহার কাছে যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তাডাতাড়ি আহার আরম্ভ করিয়াছিল, হাতটা ক্রমেই মন্থর হইয়া আসিল, পলাইতে পারিলেই বাঁচে, কিন্তু প্রশংসাটা না থামিলে যেন ওঠাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, সময় পাইবার জন্যই পাতের সব ক’টি খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহার করিতে লাগিল। চাঁচিয়া পুঁছিয়া যখন প্রায় শেষ গ্রাসটি তুলিয়াছে, গল্পের মধ্যেই কাত্যায়নীর নজর পড়িল, বলিলেন—“দেখলে?—খিদে রেখে এই রকম ক’রে উঠে আসে মানুষে?”

বিকাশ উঠিল বিকাল করিয়া—সাতু এবং হরু স্কুল থেকে আসিয়া

যখন হুড়ুদ্দুম করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল। এদিক ওদিক করিয়া গিরিবালারও ততক্ষণে প্রশংসাজনিত লজ্জার ভাবটা কাটিয়া গেছে, বিকাশ উঠিতে সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। বরদাসুন্দরী কি একটা কাজে ঘরেই ছিলেন, বিকাশ অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল—"একি! দেখেছ ছোটপিসিমা? গিরিটা কত বড় হ'য়ে গেছে!"

বিকাশের রকমই ঐ; হাসিবার খোরাক রাখিয়া হঠাৎ এমন অসমঞ্জস ভাবের কথা বলিয়া বসে এক একবার! তাহার কারণ বিস্ময়ই হইয়া পড়ে ওর প্রধান, যুক্তি একেবারে আড়ালে পড়িয়া যায়।

বরদাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—"না, ছোটপিসিমা কি আর দেখেছে? —বলে, দেখে দেখে মাথা ঘুরে যাচ্ছে। তুই আজ প্রায় দেড় বছর পরে দেখছিস, বড় মনে হবে না তোর? তুই নিজেই কতটা বড় হয়েছিস ভেবে দেখ না।"

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটে নাই বিকাশের, বলিল—"আমি বড় হয়েছি.... মানে...."

রহস্যটা যেন ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারিতেছে না, বলিল—"মানে.... আমার তো বয়েসও হয়েছে, পিসিমা....ইস্কুল ছেড়ে কলেজেও গেছি...."

সদ্যোত্থিতের জড়তাটা তখনও লাগিয়া আছে মুখে চোখে, তাহার উপর এই বোকার মত কথা; বরদাসুন্দরী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"অ দিদি, শোনসে বিকাশের কথা!....হ্যাঁরে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঠাঁই নাড়া করে বেড়ালেই বয়েস হয়, নইলে হয় না?—কি জ্বালা বাপু! তুই না জলপানি নিয়ে পাস করেছিস বিকাশ!—হ্যাঁরে?"

আসলে বিকাশ যে বিস্মিতই হইয়াছে তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা

আঘাতও পাইয়াছে। বিকাশ নিরাশ হইয়াছে। ক্লাসে ওঠা, পাস দেওয়া, কলেজে প্রবেশ করিয়া একটা নূতন জগতে পদার্পণ—এই সবের ভিতর দিয়া নিজের বয়োবৃদ্ধি বরাবরই উপলব্ধি করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে, কাছে থাকিলেই যে সর্বক্ষণ তাহার শরীরটিকে বেষ্টন করিয়া থাকিত, এবং দূরে থাকিলে ঠিক তেমনি ভাবেই যে মনটিকে জড়াইয়া থাকিত, সেই গিরিও যে লুপ্ত হইয়া এই অপেক্ষাকৃত গাম্ভীর্যময়ী কিশোরীতে পরিণত হইয়াছে, তাহা ভাবিবার অবসর পায় নাই। এ-বিস্ময়টা হইত না যদি এর মাঝে আরও দু'একবার সে দেখিত গিরিবালাকে ; কিন্তু প্রায় দেড় বৎসরেরও অধিক ধরিয়া এমনি হইয়াছে, পাসের পড়া, পাস করা, কলেজ ইত্যাদির হিড়িকে সেও তেজপুরে আসিতে পারে নাই ; ওদিকে গিরিবালাও যখন যখন সিমুরে গিয়াছে, সে থাকিয়াছে অনুপস্থিত।....বিকাশ বেশ একটু নিরাশ হইল। আধার যত নিচু, স্নেহের তত বেগ, সেই আকুল বেগে হঠাৎ যেন একটা সম্ভ্রমের ভাব মিশিয়া বেগটাকে মন্থর করিয়া দিল। ব্যাপারটা সব সংসারেরই ভাই-বোনের মধ্যে নিত্যই হইতেছে, এমন কি পিতা-পুত্রীর মধ্যেও।—কিশোরী কন্যার মধ্যে বাপ কোলের শিশুটিকে হারাইতেছে, যুবতী কন্যার মধ্যে হারাইতেছে বক্ষলগ্ন কিশোরীটিকে—কিন্তু এটা হইতেছে ধীর-নিঃসাড়ে প্রতিদিনের অলক্ষ্য তিল তিল পরিবর্তনের মধ্যে। বহুদিন অদর্শনের পর হঠাৎ এটার উপর দৃষ্টি পড়িলেই বুকে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা লাগে।

বিকাশের মনে হইল—'যাঃ, সে গিরি কোথায়?' কতকগুলা অসংলগ্ন যুক্তির মধ্যে আঘাতের হেতুটাকে হাতড়াইয়া ফিরিতে লাগিল।

ঠিক এই আকারেই যে জিনিসটা কায়েমি হইয়া রহিল এমন নয়। মেলামেশার মধ্যে আবার এ-গিরিবালাও অনেকটা অভ্যাস হইয়া আসিল।

গল্প, ফরমাইস, উপদেশ ; সকালে এবং বিকালে একটু ঠাণ্ডা পড়িয়া গেলে চার-ভাইবোনে কাছাকাছি একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানো,—মধ্যে মধ্যে তাহার কলিকাতার নূতন জীবনেরও গল্প চলে। গিরিবালা যেমন একটু দূরে চলিয়া গেছে, তেমনি শ্রোতা হিসাবে সাতকড়ি এবং হরু আবার বেশি উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে ; গিরিবালাকে মূলে ইস্কুল জিনিসটাই কি তাহা বুঝাইতে বেগ পাইতে হইত, সাতু এবং হরুকে, বিশেষ করিয়া সাতুকে কলেজ জিনিসটা যে কি ব্যাপার তাহার একটা আন্দাজ দিতে অপেক্ষাকৃত কম বেগ পাইতে হয়। সাতু ফোর্থক্লাসে পড়িতেছে, যদিও এখনও প্রায় সব বিষয়ে চরম মতামতের জন্য দিদির প্রতিধ্বনি করার অভ্যাসটি অনেকাংশেই আছে, তবু বড় হইয়াছে, ইস্কুলের বড় সংস্করণ কলেজ যে কি হওয়া সম্ভব—বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

বিকাশের গল্পবলার মধ্যে অপেক্ষাকৃত গাম্ভীর্য আসিয়াছে নিশ্চয়, কিন্তু তবু পুরানো মন্দির বা পরিত্যক্ত বাড়ির চারিদিকে একটা কল্পনার কুহেলী বিস্তার করার ঝোঁকটা যায় নাই। একবার বেড়াইতে বেড়াইতে ধর্মতলার বটবিদীর্ণ ধর্মঠাকুরের মন্দিরে একটা ছাপমারা ইষ্টকখণ্ড তুলিয়া খুব গভীর ভাবে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিল—"নাঃ, ভাবিয়ে তুললে !"

গিরিবালা আর সাতু নিরতিশয় কুতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল—"কেন বিকাশদা ?"

বিকাশ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"এর এক-একটা ভাঙা অক্ষরের পেছনে যে কত বড় এক-একটা ইতিহাস আছে, কত বড় কীর্তি সব !... যদি কখনও মিউজিয়ামে যাস তো বুঝবি।"....টুক্‌রাটা পকেটস্থ করিল।

গিরিবালা কিছু বুঝিল না, শুধু একবার বটগাছটা আপাদশীর্ষ দেখিয়া বলিল—"ওরে ব্বাবা !"

সাতকড়ি ইতিহাস কথাটা বুঝিল। যথানিয়ম দিদির মতো একবার —"ওরে ব্বাবা!" বলিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের প্রমাণ হিসাবে ইতিহাসের খুব একটা জবরদস্ত নাম আনিয়া হাজির করিল—"তৈমুরলঙ্গের কীর্তি বিকাশদাদা?"

বিকাশ তাহার পানে চাহিয়া বলিল—"কোথায় বেলে-তেজপুর আর কোথায় তৈমুবলঙ্গ! তুই একটু মন দিয়ে পডাশুনা কবৰি সাতু।"

৯

সিংহবাহিনীর মন্দিরে বিকাশের মানসিক পূরণ করাই কাত্যায়নীর বেলেতেজপুরে আসিবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না; আরও একটা ছিল, যেদিন আসিলেন সেইদিনই সন্ধ্যার পর কাত্যায়নী সেই কথাটা পাড়িলেন।

আকাশ পরিষ্কার, বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, গাছের খণ্ডিত ছায়া দোল খাইয়া খাইয়া সেটাকে করিয়া তুলিয়াছে সচল, কে যেন আঙ্গুল লতাইয়া উঠানটায় লক্ষ্মীপূজার আলপনা দিয়া চলিয়াছে। বরদাসুন্দরী রান্নাঘরে; খন্তিনাড়ার শব্দের সঙ্গে মসলার গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। অন্নদাচরণের ঘর থেকে গড়গড়ার একটা তৃপ্ত একঘেয়ে শব্দ কানে আসিতেছে, তাহারই সঙ্গে বিকাশের গলার আওয়াজ। মাঝে মাঝে গড়গড়ার আওয়াজটা থামিয়া গিয়া অন্নদাচরণের প্রৌঢ় কণ্ঠের ভারি আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, সমস্ত জিনিসটা উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে পিতার পরামর্শের মতো শান্ত, গম্ভীর। রসিকলালের ঘরের দাওয়ায় সাতকড়ি আর হরু খোকাকে লইয়া কি একটা হুড়াহুড়ি খেলা

করিতেছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ তাহাদের কণ্ঠস্বর হাস্যে কলরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। গিরিবালা আছে ঘরের মধ্যে, বোধ হয় শয্যারচনা করিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া ভাইদের বারণ করিতেছে—"ওরে থাম, দেখছিস বাবার শরীরটা খারাপ!"

রসিকলাল বলিলেন—"আমায় এক ছিলিম তামাক আগে সেজে দে মা গিরি।"

—একখানি আদর্শ সংসারের চিত্র,—শান্ত, তৃপ্ত, আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ। উঠানের মাঝখানে একটি শানের চাতালে কাত্যায়নী একলা বসিয়া বসন্তকুমারীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ যেন একটি স্রোতের মধ্যে শরীরটাকে আলগা করিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, ক্রমেই কোথায় যেন তলাইয়া যাইতেছেন, তৃপ্তিতে অতৃপ্তিতে মেশানো কোন্ এক অতলে।

এক সময় চোখ দুইটা মুছিয়া উঠিয়া পড়িলেন, একলাই একটু এদিক-ওদিক করিয়া মনটাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইলেন। নিকুঞ্জলালের স্ত্রী অসুস্থা, বসন্তকুমারী একবার দেখিয়া-আসিতে গেছেন, এখনই-আসিয়া পড়িবেন।

তিনি আসিলে দু'জনে আবার চাতালটায় আসিয়া বসিলেন। খানিকটা একথা-সেকথার পর কাত্যায়নী বলিলেন—"গিরির সম্বন্ধের কিছু হ'ল দিদি?"

বসন্তকুমারী উত্তর করিলেন—"কৈ, এখনও কিছু তো হ'ল না ভাই। মুখে তো ভাত ওঠে না আমার। কত্তারা যে বসে আছে নিশ্চিন্দি হয়ে এমন বলতে পারি না, তবে খুব যে গা আছে, তাই বা কৈ? বাপের অবস্থা তো দেখছই—আপনভোলা মানুষ, কোন্ কথা-টাতেই বা আছে সংসারের? জেঠাকে যদি বললে…"

বসন্তকুমারী গরগর করিয়া যাইতেছেন, কাত্যায়নী মাথা নীচু করিয়া নীরবে শুনিয়া যাইতেছেন, এক সময় মুখটা তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—“আমি একটা বলব দিদি ?”

বসন্তকুমারী জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া বলিলেন—“কি কথা বল্ না।”

“গিরিকে আমায় দাও।”

বসন্তকুমারী মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন—“বুঝলাম না !”

একবার কথাটা পাড়িয়া ফেলিয়া কাত্যায়নী আর কোনখানে আটকাইলেন না, বাকি কথাগুলা এক নিশ্বাসে বলিয়া গেলেন—“আমার একটি বৈমাত্র দেওর আছে জানো বোধ হয় দিদি, তার একটি ছেলে আছে।....ঐ একটি মাত্র ছেলে, বাপের সমস্ত সম্পত্তি যা কিছু সব ওতেই বর্তাবে, নেহাৎ কিছু মন্দও নয় ;—পঁচিশ ত্রিশ ঘর যজমান আছে, তা ভিন্ন জোৎ-জমি, বাগান-পুকুর ; একটা গেরস্তর খুব ভালো ভাবে চলে যায়। তারপর আমার ভাগের যা আছে সব গিরিরই হবে ; একটা কাণাকড়িও আমি রাখব না দিদি। দিদিকে আর আমায় বাবা গয়না-পত্তর কম দেন নি, বকুর বেলায়ই না হয় অবস্থাটা একটু পড়ে এসেছিল,—আমি একটি একটি করে গিরির গায়ে সাজিয়ে দোব। বলবে, জায়গাটা একটু একটেরেয়। কিন্তু সমাজ জায়গা, গিরি বনবাদাড়ে পড়বে না। তোমার কাছে মনের কথা নুকোব না দিদি, আমার বরাবরই সাধ ছিল। এবার গিরি যেতে আমি দেওরকে ডাকিয়ে আনিয়ে দেখিয়ে দিয়ে পাড়লাম কথাটা। সে তো খুব রাজি, একটি পয়সা কামড় হবে না। এদিকে সম্বন্ধেও মোটেই আটকায় না, সে সব আমি, এক জন না, কয়েকজন ঘটকপুরুতকে দিয়ে বিচার করিয়ে দেখেছি, কিছু আপত্তির নেই···”

কাত্যায়নী সামান্য একটু থামিলেন, তাহার পর দুই হাতে বসন্ত-কুমারীর ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কণ্ঠে অশেষ আকুতি ঢালিয়া বলিলেন—"তুমি দাও আমায় গিরিকে দিদি, আবার আমি একটু সংসার পাতি, মুখ তুলে চাও ছোট বোনের ওপর।"

তাঁহার চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিয়াছে।

প্রস্তাবটা অত্যন্ত আকস্মিক, তায় কাত্যায়নীর বাক্যস্রোতে অভিভূত হইয়া বসন্তকুমারী ভাবিবার অবসর পাইতেছেন না, কতকটা বিমূঢ় ভাবে মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"ছোট বউকে বলেছিস ?"

এতক্ষণ প্রার্থনা ছিল, কাত্যায়নী এবার তাহার সঙ্গে খোসামোদ জুড়িয়া দিলেন, বলিলেন—"হ্যাঁ, বরুকে আমি বলতে গেলাম ! তুমি থাকতে বরু কে তা তো বুঝি না।"

বসন্তকুমারী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন ; বিলম্বে সুর কাটিয়া যাইতেছে দেখিয়া কাত্যায়নী বলিলেন—"দিদি, দাও কথা, পায়ে ধরি তোমার।"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"এতে আর পায়ে ধরার কি আছে কাতু ?—তুই তো মন্দ কিছু বলছিস না যে....ছেলেটি কেমন ?"

কাত্যায়নী ক্ষণমাত্র নিরুত্তর রহিলেন, কথাটা যেন গলায় কোথায় আটকাইয়া গেল, একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন—"ছেলে—যেমন গেরস্তর ছেলে হয়—জমি-টমি আছে, বাপ এখনও সবল, সে-ই দেখাশুনা করে—তা ব'লে ছেলে যে ঘুরেও দেখে না এমন নয়...."

একটু যে ছন্দপতন হইলই বসন্তকুমারীর সেটুকু কান এড়াইল না। তবে তিনি সেদিকে খুব খেয়াল করিলেন না। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বোধ হয় একটু বেশি সঙ্গীপ্রিয়,—ও ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। একছেলে, একটু আদুরে হইবেই।

বসন্তকুমারী'র দৃষ্টিটা সুবিধাগুলির দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল; জোৎ-জাম, যজমান, গয়না—সব দিক দিয়া যে একটি প্রাচুর্যের ছবি তাহারই উপর। এর অতিরিক্ত কাত্যায়নী যদি নিজে গিয়া সংসার পাতে—আর পাতিবেই, নারীর মন দিয়া কাত্যায়নীর ক্ষুধাটা স্পষ্টই বুঝিতে পান—তাহা হইলে গিরিবালার আর কিছুই দুঃখ থাকিবে না। ...সচ্ছল সংসার—কাত্যায়নী তার বুকের সঞ্চিত মধু সমস্তটুকু উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন, আর কি চাই?

কল্পনার মাঝেই বসন্তকুমারী বলিলেন—"বেটাছেলেদের বলে দেখব কাত্তু।"

কাত্যায়নী আবার হাতটা চাপিয়া ধরিলেন—"তোমায় কথা দিতে হবে দিদি, আমি তোমার সামনে বেটাছেলেদের অত বুঝি না।"

চরমের কাছাকাছি আসিয়া তিনি যেন আর নিজেকে সামলাইতে পারিতেছেন না।

বসন্তকুমারী ঈষৎ হাসিয়া কাত্যায়নীর পিঠে বাঁ হাতটা বুলাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"তুই ছেলেমানুষই রয়ে গেলি কাত্তু, কথা কি মেয়েমানুষ হ'য়ে আমি দিতে পারি? তবে এইটুকু তোকে বলতে পারি যে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। অমতের মতন তো কিছুই দেখছি না।"

সেই রাত্রেই কথাটা স্বামীর কাছে পাড়িলেন। অন্নদাচরণ খুব বেশি ভাবিয়া দেখিলেন বলিয়াও মনে হইল না; বলিলেন—"এ তো অতি উত্তম কথা, আজ হয় তো কাল নয়। তোমরা মেয়েছেলে, চোখে দেখলেও বুঝতে পার না,—দেখতে পাচ্ছ না ভগবানের উদ্দেশ্যটা?—ঠিক এই সময়টিতে হরিপুরের বাবুদের সঙ্গেও দহরম-মহরম হতে চলল, হাতে কিছু এলও, আর যেমন বুঝছি, আরও আসবে।....সে কি কথা!

—ওঁদের কামড় নেই বলে গিরিকে আমি শুধু শাখা পরিয়ে বিদেয় করব নাকি ?—কেন শুনি ?"

অন্নদাচরণের প্রায় নিয়মই হইয়া গেছে গিরিবালার বিবাহের কথায় শেষ পর্যন্ত খানিকটা রাগ রসিকলালের উপর গিয়া পড়িবেই ; পড়িলও। বলিলেন—"কথাটা ওঁকেই তুলতে হ'ল। কেন, রসিক কি খোঁজ রাখতে পারতো না ?—বয়ে গেছে তার এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে ! ততক্ষণ পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে বসে ছড়া আওড়ালে কাজ দেবে।"

তবুও মেয়ের বাপই, মনস্থির করিয়া ফেলিলেও অন্নদাচরণ সকালে ভ্রাতাকে বাহিরেব ঘরে লইয়া গিযা একান্তে কথাটা বলিলেন। শুনিয়াই রসিকলাল বিমূঢ় হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন,—"ওখানে গিরির বিয়ে।"

অন্নদাচরণ একটু রাগিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"আপত্তিটা কি শুনি ? কোথাও ঠিক করেছ ?"

আপত্তি !....কে বুঝিবে মনের কী যে গোপন আকাঙ্ক্ষা, কি যে গভীর বিশ্বাস ?....পাবতী-উমার জন্য শিব আসিবেন নিজে—বাপের অন্তরের অভিলাষ বাতুলের বিশ্বাসের রূপ ধরিয়াছে,—মুখ ফুটিয়া বলিলেই যে প্রলাপ !...আর, হে দেব, বিশ্বাস সম্বলটুকুও যে সত্যই ধরিয়া রাখা যায় না....গৌরীদান !—সে স্বপ্ন গেল, এখন আনন্দের পুত্তলি হইয়া উঠিয়াছে নিদ্রা-জাগরণের দুশ্চিন্তা....

রসিকলাল যেন একটা আচ্ছন্নভাব থেকে জাগিয়া উঠিয়া আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—"ঠিক ?—কৈ, নাঃ ··বলছিলাম—বলছিলাম ওখানে বিয়ে দিলে তো খুবই সুবিধে হয়।"

ভ্রাতৃবধূকেও অন্নদাচরণ নিজের মুখেই শুনাইলেন কথাটা। বরদা-

সুন্দরী বসন্তকুমারীর মুখেও শুনিয়াছিলেন, সাতুকে দিয়া জানাইলেন—তাঁহারা যাহা করিবেন তাহাই হইবে, আর এ তো সব দিক দিয়াই আনন্দের কথা।

সেই দিন সংবাদটা বেশ ভালো করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৈকাল বেলায় দামিনী পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দুয়ার টপকাইয়া হাঁক দিলেন—"কৈ গো, আমাদের হবু-বেয়ান কোথায়? বড়গিন্নি কৈ গো?"

বরদাসুন্দরী বাহির হইয়া আসিলেন, দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া দিয়া বলিলেন—"বোস' ঠাকুরঝি, দিদিরা এই যে বেরুলেন কোথায়।"

দামিনীর সেটা অজ্ঞাত নয়, ওঁর নিয়মই হইতেছে আগে হইতে খোঁজ লইয়া তবে আসেন, দুই জা বাড়ীতে থাকিলে আসেন না, আসিয়া কোন কাজ হয় না।

দামিনী উপবেশন করিলে বরদাসুন্দরী একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"শুনেছ বোধ হয় ঠাকুরঝি?"

"ওমা শুনব না? বলে, কাক-কোকিলের মুখে উড়ছে কথা!"

সামনে হাতটা চাপিয়া বলিলেন—"বোস্ ছোটবউ। একটা কথা শুনলাম তাই ছুটে এলাম। তোরা জিগ্যেস করিস না-করিস, ঠাকুরঝির মনটা রসিক আর ছোটবউয়ের কাছে পড়ে থাকে অষ্ট পহর,—আহা, দুটোই হয়েছে সমান, সংসারের ভালোমন্দ কিছুই বোঝে না।....বলি, হ্যাঁলা, এ দুর্মতি হ'ল কেন—বোনে-বোনে বেয়ানের সুবাদ?"

বরদাসুন্দরী একটু ভীত হইয়া বলিলেন—"কেন ঠাকুরঝি, অন্যায় হয়েছে? দিদির বৈমাত্র দেওর পো, সম্বন্ধে তো...."

দামিনী বলিলেন—"নৈলে আর হাঁদা বলি কেন? শুধু যে অন্যায় হয় নি তাই নয়, এমন সম্বন্ধ লাখে একটা হয় না,—ভালো ঘর, তায়

জানা ঘর···এমনি যা' তা' সম্বন্ধ যে তুমি করবে না তা আমি জানি ; কিন্তু একজনের মুখ বন্ধ করবে কি করে ?—আর যে-সে একজন নয় তো ?"

কথার ঢো'টা নূতন না হইলেও বরদাসুন্দরী একটু ভীত হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে 'একজন' ঠাকুরঝি ?"

"ঐটি ঠাকুরঝিকে জিগ্যেস করো না বোন : আন্দাজে বুঝতে পার ভালোই, সাবধান হবে, না পার, সেও মন্দ নয়।····কত কথা সে।—'এইবার দুই বোনে একজোট হলেন, আর কি আমরা থৈ পাব ঠাকুরঝি ?'····এই দেখ বেরিয়ে গেল নামটা মুখ দিয়ে····'আর কি আমরা থৈ পাব ঠাকুরঝি ? ও শুনতেই ভাই ভাদ্দোরবউ—কোকিল ছাঁয়ের মতন পুষে মরো, ডানা গজালেই নিজের পথ দেখবে'····সে বিনিয়ে বিনিয়ে কত কথা !—শুধু তোর নামে হ'লে তো বাঁচতাম, শুনে শুনে, সয়ে সয়ে তোর ঘাটা পড়ে গেছে ; চিরকালটা এখন হবেও শুনতে ; কিন্তু ঐ একটা বিধবা, তায় কুটুম মানুষ, তার ওপর আবার নতুন কুটুম হ'তে চলল,—ওর নামেও এই এতগুলো—'দেখো ঠাকুরঝি, বলে রাখছি—ছোট বোন তো কি, বড়টি আবার যা সেয়ানা।—বছর না ঘুরতে যদি হাঁড়ি না আলাদা করিয়ে দেয় তো····'

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেলে কাত্যায়নীকে লইয়া বসন্তকুমার বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। মনটা খুবই প্রফুল্ল, বেশ জোর গলায়ই কি একটা গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন, উঠানে আসিয়া ডাকিলেন,—"ছোটবৌ কৈ গো ?"

"এই যে" বলিয়া বরদাসুন্দরী রান্নাঘরের দাওয়ার নিচে নামিয়া আসিলেন।

বোঝা গেল কর্তাদের কেহই বাড়ি নাই। বসন্তকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে, দামু-ঠাকুরঝি এসেছিল?"

বরদাসুন্দরী বলিলেন—"এসেছিল বৈকি।"

বসন্তকুমারী হাসিয়া কাত্যায়নীব পানে চাহিয়া বলিলেন—"দেখলি?—না এলে ওর ভাত হজম হবে না।"

জা'কে প্রশ্ন করিলেন—"কিছু বললে?"

বরদাসুন্দরী একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে কাত্যায়নীর পানে চাহিলেন।

বসন্তকুমারী হাসিয়া বলিলেন—"আ গেল যা। কাতু জানে, সব শুনেছে আমার কাছে। তোকে কি ব'লে গেল তাই বল না।"

জায়ের অপেক্ষায় না থাকিয়া বসন্তকুমারী নিজেই মুখটা গম্ভীর করিয়া লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিতে লাগিলেন—" 'এইবার দুই বোনে একজোট হলেন, আর কি আমরা থৈ পাবো ঠাকুরঝি?....দেইজি-বালাই, কোকিল-ছাঁয়ের মতন, পুষেই মর....বলে, একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব. দোসর,—ছোট তো কি, বড় বোনটি আবার যা সেয়ানা!'....বল্ না, হাঁ করে রইলি কেন?"

কাত্যায়নীর মুখে কাপড় দিয়া দম আটকাইয়া যাইবার মতো হইয়াছে, বরদাসুন্দরী অত্যন্ত ভীত এবং বিস্মিত হইয়া একবার তাঁহার দিকে একবার জায়ের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কি করে জানলে দিদি? ঠিক এই সব কথাই তো বিনিয়ে বিনিয়ে বলে গেল!"

বসন্তকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আ মর!—আমিই বাড়ি ব'য়ে গিয়ে গুছিয়ে গুছিয়ে সব বললাম, আর জানব না?"

বরদাসুন্দরী আরও বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"সত্যি বললে?"

"ও মা, বলব না?—আজ আমার কত আহ্লাদের দিন, ও উনুন-

মুখীকে ক্ষেপিয়ে পাড়ায় একটা গুলতান তুলব না ?····আমায় কত দরদ দেখিয়ে বললে—'ও যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা বোন ; শুধু ছোট বউকেই চিনেছ, ছোট কত্তা এখনও চিনতে বাকিই আছে। দামু ঠাকুরঝি বরাবরই বলে এসেছে, কিন্তু সময়ে তো হ'লে না সাবধান, এখন'····"

কর্তারা নাই, দামিনীর নকল করিয়া বসন্তকুমারী তিনজনের চাপা হাসিতে বাড়িটা মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

১০

আশ্চর্যের বিষয় এই হইল যে সব চেয়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন রসিকলাল নিজে, আর হঠাৎ। অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিকাশের সঙ্গে কাব্য আলোচনা করিলেন, ওদের যে-সব কাব্য কলেজে পড়ান হয়,—গ্রে'র এলিজি, কোলরিজের দি রাইম্ অব্ দি এনশিয়েণ্ট্ মেরিনার —আরও সব অন্যান্য কবিদের ছাড়া ছাড়া কবিতা। ইংরেজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি খুব অধিক নয়, বহুদিনের অপরিচয়ও, তবু নিজের কবি-মন, খুব উৎসাহভরেই আলোচনায় যোগদান করিলেন। নিজের কবিতাও বিকাশকে পড়িয়া শোনাইলেন।····বিয়ের কথাও উঠিল, অন্তত সপ্তাহ-খানেক পূর্বে তো বিকাশকে ছুটি লইয়া আসিতে হইবে, সেই এখন বাড়ির বড় ছেলে বলিতে গেলে।····বিকাশ তো বড় হইয়াছে, স্বাধীন মতামত হইয়াছে একটা—গিরির সম্বন্ধটা বিষয়ে তাহার মত কি ?

কাব্যের আলোচনায় বিকাশের যে উৎসাহটি শিখায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ একটু যেন স্তিমিত হইয়া গেল, প্রশ্ন করিল—"ছেলেটি দেখেছেন ?"

রসিকলালের মুখটা প্রসন্নতায় দীপ্ত হইয়া উঠিল—“কাতু দিদির দেওর পো, দাদা সব শুনেটুনে চারিদিক ভেবেটেবে কথা দিয়েছেন, এ যে দেখার চেয়েও বেশি হ'ল বিকাশ। তা ভিন্ন নীলমণিদাকে যে অনেকবার দেখেছি—আবে তাঁরই ছেলে তো? না....”

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, যেন ভাবী বেহাইএর সাক্ষাতেই তাঁহাকে লইয়া ঠাট্টা করিতেছেন।

সকালে শরীরটা বেশ ভালো ছিল না, তবু ঘুড়ি কশাইয়া বাহির হইয়া গেলেন। দূরে, বেলের ওদিকে ঝিক্‌নেব বায়েদেব বাড়ি একটা পুরান কেস্ আছে, আগে সেইখানেই গেলেন। পথে হাবাণেব সঙ্গে কথাবার্তা হইতে লাগিল—

“দেহটা খুব যে ভালো আজও এমন নয়, তবে সামনে একটা অতবড খরচ, আর ব'সে থাকা চলে রোজগাব ছেড়ে? বেরুলেই কোন্ না দু'তিনটা টাকা আসছে আজকাল? দাদা যাই বলুক, তুই তো দেখেছিস? ঝিক্‌নেতেই যাচ্ছি আজ, কটা ভিজিটের টাকা বাকি পড়ে গেছে, এবার আদায় কবতে হবে....”

রসিকলাল একটু রাগিযা উঠিলেন, যেন ক্রোশ দেডেক দূরে রায়েদেব শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—“করতে হবে না আদায়? ভিক্ষে তো চাইছি না, নিজের হক্কেব টাকা। দু'কোশ পথ ভেঙে রোগা দেখতে যাচ্ছি, আর টাকাব বেলায়....তুলবি কথাটা, আমি তুলতাম কিন্তু....তা, আমাব সামনেই তুলবি, ভযটা কিসের? না হয তুলবই আমি নিজে; মেয়েব বিয়ে বয়েছে, আর কত খাতিব করব?”

হারাণ বলিল—“তোমায় দিয়ে হবে নি বাবাঠাকুর, বড্ড মরা বাশ তোমার; আমি নিজেই তুলব'খন।”

রসিকলালেব উৎসাহটা নিবিযা গেল, ভিতবে ভিতরে একটা অস্বস্তি

অনুভব করিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহারপর বলিলেন—"আমার সামনে তুলতে তোর কোন রকম ইয়ে হয়, না হয় একলা বিকেলেই আসিস একবার তাগাদা দিতে।"

আর একটু চুপচাপ থাকিয়া বলিলেন—"সেই ভালো, বিকেলেই আসিস'খন, শরীরটার জুত নেই, ওবেলা তো আর বেরুতে পারব না, বসে বসে কি করবি ?"

রায়েদের বাড়ি ষোলটি টাকা ভিজিট পাওয়া গেল। হাতে টাকা আসিয়াছিল, রোগীটিও বেশ সাবিয়া উঠিতেছে, একেবারে আজ পর্যন্ত চুকাইয়া দিল।

রসিকলালের মনে যে কী হইতেছিল, প্রকাশ কবিবার ভাষা পাইতেছিলেন না বলিয়া অনেকটা পথ নীরবেই চলিলেন। এক সময়ে বলিলেন—"লক্ষণটা মিলিয়ে দেখছিস হারাণে ? পাব না কেন ?—পেয়েছি, এক সঙ্গে চার টাকা ছ'টাকা ওবধি পেয়েছি। যেই বিয়ের কথাটি উঠল একেবারে ষোল-ষোলটা টাকা—একটা সিভিল সার্জেনের ভিজিট ! লক্ষণটা মিলিয়ে দেখ্ একবার !"

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন আরো ভরাট হইয়া গেল, আবার চুপ করিয়া গেলেন। টাকাগুলো খুব একটা বড কাজের জন্য পকেটে যেন ছটফট করিতেছে। খানিকটা গিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ভালো কথা মনে পড়ে গেল, একবার চিনিবাসের দোকানে যেতে হবে না ? বিয়ের যা গয়না তা তো দাদা ঠিকঠাক করবে, বাপ হ'য়ে আমার একটা আলাদা না দিলে কি ভালো দেখায় ? তুই-ই বলনা হারাণে ?"

চিনিবাস স্বর্ণকারের দোকানের পথ বাগ্দি পাড়ার ভিতর দিয়া। মোড় ফিরিয়া দুলালের বাড়ীটা নজরে পড়িতেই দেখা গেল দুলালের বউ একটি শিশু-কোলে হা-প্রত্যাশা করিয়া কাহার পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া

আছে। রসিকলাল কয়েক পা অগ্রসর হইবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল, ঝালরের মতো শতছিন্ন যে ময়লা কাপড়টা পরিয়াছিল যেন সেইটাকেই আড়াল করিয়া ফেলিবার জন্য।

রসিকলাল বাড়ির সামনেটা একটু ছাড়াইয়া গেছেন, দুলালের একটা ছেলে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"বামুনডাক্তার গো, বাবা আবার অসুখে পড়েলো।"

রসিকলাল ঘুড়িটা দাঁড় করাইয়া বলিলেন—"কবে থেকে? বেশ তো ভালো হ'য়ে গেছল।"

এই দুঃস্থতম পরিবারটি সবদিক দিয়া তাঁহাকে বেশি দোহন করে বলিয়া রসিকলাল হারাণের কাছেও একটু 'কিন্তু' হইয়া থাকেন। তাহার পানেই চাহিয়া বিরক্তির সহিত বলিলেন—"ভালো একটু পথ্যি করবে না, আমি ওষুধ দিয়ে দিয়ে মরি। আমার ওষুধের তো দাম নেই।"

জ্বরটা খুব বেশি, দুলাল বাহিরে উঠিয়া আসিতে পারিল না, রসিকলালকেই ঘরে গিয়া দেখিতে হইল।

পরশু থেকে জ্বর হইয়াছে, ওর স্ত্রী কাল গিয়াছিল বামুনডাক্তারকে জানাইয়া ঔষধ লইয়া আসিতে, পথেই শুনিল তাঁহার শরীরটা খারাপ, আর যায় নাই। আর কেনই যে তাহার জন্য ঔষধ-পত্র করা, সে আর বাচিবে না। এত করিয়া বারণ করিল—কাজ নেই দা'ঠাকুরকে ডাকিয়া—তা রাস্তা থেকে তাকে এই নরককুণ্ডুতে ডাকিয়া আনা—যাইবার সময় বামনের শাপমন্যি কুড়ান।

দুলালই শ্বাস টানিয়া টানিয়া বলিয়া যাইতেছিল, অন্য বার তাহার স্ত্রী থাকিয়া ঘোমটার আড়াল হইতে বিবরণগুলা দেয়, এবারে সে একেবারেই আড়ালে রহিল, তাহার চাপা কান্নার ধ্বনি আর মাঝে মাঝে জ্বরের এক একটা লক্ষণের কথা শোনা যাইতে লাগিল।

অন্য অন্য বারে রসিকলাল একটু আধটু ধমক দেন, আজ আর দিলেন না। ঔষধ দিয়া পথ্যের কথা বলিয়া পকেট থেকে একটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহারপর হঠাৎ যেন মনে পড়িয়া গেল এই ভাবে বলিলেন—"আর, একটা কথা শুনিসনি বুঝি ?—গিরিব আমাদের যে বিয়ে !"

খুব যেন অন্তরঙ্গ কাহাকে খবরটা দিলেন এই ভাবে স্মিত বদনে দুলালের পানে চাহিয়া রহিলেন। দুলাল ক্লিষ্টস্বরে যতটা আনন্দ আনা সম্ভব আনিয়া বলিল—"হবে ; আর খুব ভালোই হবে দা'ঠাকুর ; ধম্মঠাকুর জাগ্‌গত দেবতা, নক্ষীর মা আর আমি যেতে এসতে নিত্যি মাথা ঠুকি ; আমাদের পাথোনা যে শুনতে হবেই দা'ঠাকুর তানাকে...."

দুয়ারের নিকট হইতে রসিকলাল আবার ফিরিয়া আসিলেন। পকেট থেকে আস্তে আস্তে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দুলালের শিয়রের কাছে রাখিয়া বলিলেন—"আর এই এক আধ খানা কাপড় সবাইয়ের জন্য কিনে নিবি দুলু—সবাইকে গিয়ে ক'দিন কাজের বাড়িতে খাটতে হবে তো ?"

কি যে একটা প্রবাহ নামিয়াছে মনে, শুধু ইচ্ছা হইতেছে বন্যার নদীর মতো চারিদিকে ছড়াইয়া দিই নিজেকে।

চিনিবাসের দোকানে একটা হারের কথা ঠিকঠাক করিয়া ফিরিতে ফিরিতে রসিকলাল কয়েকবার পকেটে হাত দিয়া আবার খালি হাতটা বাহির করিয়া লইলেন, তাহারপর একবার কুণ্ঠা কাটাইয়া দুইটা টাকা বাহির করিয়া বলিলেন—"এই দু'টো টাকা তুই আজ রাখ হারাণে, প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করেছি পর্যন্ত কখনও তো মুখ ফুটে চাইলি নি একবার ! অনেকবারই ভেবেছি, না চাক্, আমারই হাত তুলে দেওয়া উচিত ; তা হয়েই ওঠে না, দেখছিস তো খরচের হিড়িকটা ?....নে ধর—গোটা

পাঁচেক দোব পুরিয়ে ; আজ আপাততঃ এই দুটো রাখ, দাদাকে আর বলে কাজ নাই, ভারী তো দিচ্ছি তার আবার....”

হারাণ বলিল—“তা দাও বাবাঠাকুর। এমনি তো খাচ্ছি পরছি তোমাদেরই, তবুও সবাই ছুতোনাতা করে টেনে নিচ্ছে, হারাণেরই কি সাধ হয় না বাবাঠাকুর আশীর্ব্বাদ বলে হাত তুলে দেয় ? বলিনি,—দেখছি এসছে আর বেইরে যাচ্ছে, এসছে আর বেইরে যাচ্ছে।....দাও, এ দু'টো লক্ষ্মীর পেতেয় তুলে রাখব।”

টাকা দুইটি কপালে ঠেকাইয়া পিরাণের পকেটে রাখিয়া দিল।”

একবার হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—“এই দেখ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। কদ্দিন থেকে গিরি রমেশের দোকানের সেই পুতুলটার কথা বলে আসছে। চল, একবার ওদিক হ'য়েই যাই।”

রমেশ বর্ণনা শুনিয়া এবং ইতিহাস শুনিয়া একটু হাসিল, বলিল—“সে কবে বিকিয়ে গেছে, অ্যাদ্দিন থাকে কখনও ?”

কয়েকটা অন্য পুতুল দেখাইল।

রসিকলালের বুকে একটা বড আঘাত লাগিল, ছেলে বেলায় পুতুলটার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া গিরিবালা বলিতেছে—“বাবা, ঐটে ...।” কচিমুখে অসম্ভব আবদারের লজ্জা এবং আশঙ্কা লাগিয়া আছে ;—ছবিটা স্মৃতির বিদ্যুৎস্ফুরণে জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল একবার।.... সে-গিরিবালা আবদার বুকে করিয়াই মিলাইয়া গেছে, এ-গিরিবালাও যাইতে বসিল।

কিন্তু আজ আঘাতের ব্যথাটুকু আর স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। পকেট থেকে দুইটা টাকা বাহির করিয়া রসিকলাল টেবিলের ওপর রাখিয়া বলিলেন—“না, তুমি সেই রকম একটা পুতুল নিয়ে আসবে রমেশ, যাওয়া-আসা তো আছেই কলকাতায়।”

ষোল টাকার মধ্যে ছয়টি টাকা অন্নদাচরণের হাতে উঠিল। এত বড় একটা অভাবনীয় ব্যাপার, রসিকলাল একদিনে একসঙ্গে ছয়-ছয়টা টাকা দিয়াছেন, জ্যেষ্ঠের মনে পড়ে না। প্রীতিভরে ভাইকে খুব উপদেশ দিয়া বলিলেন—গিরিটার বিয়েটুকু হয়ে যাক তারপর তুই থাক না নিজের খেয়াল-খুশি নিয়ে রসিক, বলতে যাব কিছু? আমারই মাথার ওপর একটা দাদা থাকলে আমি এই জোয়াল ঘাড়ে করতাম নাকি? রাম বলো।"

সন্ধ্যার দিকেও শরীরটা ভালো ছিল না; না থাকিবারই কথা, তবু রসিকলাল একবার পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি গেলেন;—সমস্ত দিনের সেই আবেগের জোয়ারটা যেন ঠেলিয়া লইয়া গেল বলা চলে। যখন পৌঁছিলেন সন্ধ্যাবন্দন সারিয়া পণ্ডিতমশাই বাড়ির সামনের শানের বেঞ্চিটিতে আসিয়া বসিয়াছেন। বেঞ্চের উপর একটা ছোট মাচায় থরে থরে মালতী ফুল ফুটিয়াছে—কতকগুলা শানে, কতকগুলা নিচের জমির উপর ঝরিয়া পড়িয়াছে—জ্যোৎস্নার গায়ে সাদা সাদা বুটির মতো। অন্য স্থানেও জ্যোৎস্না ওঠে, ফুল ফোটে, তাহার গন্ধ ছড়ায়,—কিন্তু এখানে, এই সদাপ্রফুল্ল, আত্মসমাহিত ব্রাহ্মণকে ঘিরিয়া তাহারা একটা অন্য লোকের সৃষ্টি করে।

দূর থেকেই পণ্ডিতমশাইকে বাহিরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রসিকলালের মুখে হাসি ফুটিল। পণ্ডিতমশাইও দূর থেকেই প্রশ্ন করিলেন—"কি, রসিক নাকি? এসো, এসো।"

রসিকলাল পায়ের ধূলি লইয়া সামনের বেঞ্চটায় বসিলেন, হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"শুনেছেন বোধ হয়?"

পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"সমস্ত দিনটা বাড়িতে ছিলাম না, ব্যাপার কি? তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে যেন ভালো খবর এনেছ কি একটা।"

"খুব ভালো খবর"—আনন্দের আতিশয্যে কথাটা কণ্ঠে আটকাইয়া গেল। পণ্ডিতমশাই প্রসন্ন উৎসুক দৃষ্টিতে শিষ্যের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

রসিকলালের মুখটা যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—একটি রাঙা গোলাপ যেন শেষ পাপড়িটি পর্যন্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।—"খুবই ভালো খবর পণ্ডিতমশাই, আপনার গিরির...."

সঙ্গে সঙ্গেই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বেঞ্চের পিঠে মাথা দিয়া শিশুর মতোই হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"উঃ, আমার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল পণ্ডিতমশাই।...."

বাড়ির মধ্যে আরও একটি চিত্তে এই রকম প্রবাহ নামিয়াছিল—যদিও এই রকম আনন্দের ছদ্ম মূর্তিতে নয়।

অনেক সময় দেখা যায় চাওয়ার ঔৎসুক্যের মধ্যে এবং পাওয়ার প্রতীক্ষার মধ্যে কী যে চাহিতেছি তাহার স্বরূপটি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। সেটা ধরা পড়ে, যখন এত প্রাণ মন দিয়া যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, সেটা হাতে আসিয়া পড়ে। তখন নিজের আকাঙ্ক্ষার সবগ্রাসী রূপ দেখিয়া নিজেকেই শিহরিয়া উঠিতে হয়। যতক্ষণ চাওয়ার মেয়াদ, ততক্ষণ না পাওয়ার আশঙ্কার সঙ্গে পাওয়ার সম্ভাবনার একটা সুদৃঢ় আনন্দ মিলিয়া সমস্ত মনকে একটি মাত্র মিশ্র চেতনায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মনের আর বিচার করিবার অবসর থাকে না, সে শুধুই ছোটে তার প্রেয়ের পানে—যতই ছোটে, ছোটার উন্মাদনায় ততই তৃষ্ণাটা বাড়িয়া যায়। ক্রমে সেই তৃষ্ণাটাই হইয়া পড়ে মূল অনুভূতি।

তাহারপর তপস্যার শেষে হয় বর লাভ। উন্মাদনা গিয়া স্নিগ্ধ

শান্তি আর অবসাদের মধ্যে মনটা যেন নিজে থেকে আলাদা হইয়াই বিচারে বসে, যাচাই করে—যাহা পাইলাম সেটিকেও, আর যে পাইল তাহাকেও, অর্থাৎ নিজেকেও।

প্রথম দিনটা সাফল্যের উল্লাসে, বিশেষ করিয়া বসন্তকুমারীর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ানোয়, আলাপ-আলোচনায় ক্বচিৎ নূতন কুটুম্বিতার হাসি-ঠাট্টায় কাত্যায়নী অতটা বুঝিতে পারিলেন না, শুধু সব কিছুর মাঝে-মাঝে মনটা যেন অহেতুকভাবেই ক্ষণিকের জন্য বিষণ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। পরের দিন সকাল হইতেই এই ক্ষণিক বিষণ্ণতা যেন একটি স্পষ্ট বেদনায় রূপ ধরিয়া উঠিতে লাগিল।....কাল ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে একটা একেবারে নূতন ধরণের চৈতন্যে মনটা ভরিয়া উঠিয়াছিল—সকালটি হইয়াছিল ঠিক একটি নূতন জগতের তোরণদ্বার—তার মধ্যে দিয়া দেখা যায় দূর—সুদূর পযন্ত বিস্তৃত, সুখে, তৃপ্তিতে, হাসিতে ভরা একটি সংসার ;—সংসার ! জীবনের অপরাহ্ণ পযন্ত কাত্যায়নী যাহার সন্ধান পান নাই।∴কাল সুখের অলসতায় কাত্যায়নী অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিছানায় পড়িয়া ছিলেন—কল্পনার তুলি দিয়া শুধুই রং ফলাইয়া গিয়াছিলেন। আজ কিন্তু ঘুম ভাঙার পর বিছানাটা—শুধু শুইয়া থাকাটা যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। কাত্যায়নী উঠিয়া বাহিরে আসিলেন।

দাওয়ায় আসিয়াই প্রথমে দেখিলেন গিরিবালাকে। গিরিবালা ওঠেই সবার আগে ; আজ যেন আরও সকালে উঠিয়াছে। খিড়কির পুকুরে মুখ ধুইতে নামিয়াছিল, ঘাটের ঢালু বাহিয়া অর্ধেকটা উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; বস্ত্রাঞ্চলে মুখটা মুছিল, তাহার পর বোধ হয় সামনের গাছে কিছু একটা দেখিয়া স্থির কুতুহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। নবোদিত সূর্যের কয়েকটি রশ্মি আসিয়া গায়ের উপর, মুখের উপর

ছড়াইয়া পড়িয়াছে, চারিদিকের সবুজ আবেষ্টনীর মধ্যে দেহনিবদ্ধ সূর্যরশ্মিতে একটা নূতন ধরণের আভা ফুটিয়াছে। ভোরের স্নিগ্ধ মৌন দৃষ্টির নিচে, এই অদ্ভুত গোলাপি আভায় মণ্ডিত গিরিবালাকে যেন নূতন কোন এক লোকের জীব বলিয়া মনে হয়। এখানকার নয়; আলোর পথ বাহিয়া ও যেন এই সদ্য নামিয়া আসিয়াছে, হালকা চরণ দু'টি এখনও মাটিতে পড়ে নাই। ও যেন এ-মাটির নয়, এ-মাটির বেদনার নয়, পৃথিবী তাহার নিজের মলিন সুখ দুঃখ লইয়া ভালো করিয়া জাগিয়া উঠিবার পূর্বেই, স্পর্শাতীত হইয়া উষার মতোই ও আবার আলোর জগতে মিলাইয়া যাইবে।

কাত্যায়নী একটু আড়ালে ছিলেন, দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুতে ছল ছল করিয়া উঠিল—বেদনাটা খুব স্পষ্ট নয়, তবে মনে হইল সত্যই যেন ও এইবার মিলাইয়া যাইবে। এতদিন ছিল তাঁহার কাছে, তাঁহার বুকের মধ্যে—তাঁহার নিতান্ত নিজেরটি হইয়া;—তবে ছিল একটা হালকা মুক্তির মধ্যে; এইবার তৃষ্ণার আর্তিতে দুই বাহু দিয়া জড়াইতে গিয়া কাত্যায়নী যেন তাহাকে হারাইতে বসিয়াছেন। এ কী সর্বনাশ করিলেন তিনি!....

আবার দিন অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা কাজের চঞ্চলতার মধ্যে গিরিবালার নিত্যকার রূপটি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সেই গিরিবালা—যাহাকে আর পাঁচটা মেয়ের মতোই সংসার পাতিবার জন্য চাওয়া যায়, পাওয়া চলে। কাত্যায়নী আবার তাহাকে আদর-যত্নের তন্তু দিয়া বুকের সঙ্গে জড়াইতে লাগিলেন। অবশ্য তন্তুতে মাঝে মাঝে টান পড়িতে লাগিল—মন যেন হঠাৎ নিজের থেকে সরিয়া দাঁড়াইয়া এক একটা প্রশ্ন করিতে লাগিল—দৃঢ়ভাবে উত্তর চাহিতে লাগিল—সত্যই কি গিরিবালা তাঁহার সংসার পাতিবার মতো?....শাশুড়ির কথা

কাত্যায়নী লুকাইলেন কেন?—ছেলের কথা উঠিতেও কেন এড়াইয়া গেলেন?....তাঁহার অমন নির্মল ভালোবাসায় খাদ মিশিল কোথা থেকে?—কেন দিলেন তিনি মিশিতে?....

প্রশ্ন থেকে কাত্যায়নী যেন পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বসন্তকুমারীর সঙ্গে, ভগ্নীর সঙ্গে, আগামি কাজের যোগাড যন্ত্রের আলোচনায়, আর গিরিবালার ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্রটাকে রঙে রঙে বোঝাই করায় মাতিয়া রহিলেন; আজই যে যাইবেন, আর সময় আছে?—সব ঠিক করিয়া লইবেন না?

এই সব-কিছুর মধ্যে কিন্তু সেই এক প্রশ্ন,—কত আকারে!—উত্তর চাই।....এক ঝাঁক মৌমাছিতে যেন তাঁহাকে খেদাইয়া ফিরিতেছে, জলে ডুব দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সেখানেও যে সেই মৃত্যুরই যন্ত্রণা!

ত্বপুরের একটু আগে বিকাশকে লইয়া সিংহবাহিনী-তলায় পূজা দিতে গেলেন। পূজা সাঙ্গ হইলে প্রণাম করিতে গিয়া যেন গোলমাল হইয়া গেল—'আমায় দাও, আমায় দাও মা, কী আর বেশি চাইছি তোমার কাছে?....আমার বড় তেষ্টা, বড় যন্ত্রণা, বড় জ্বালা—নিজের জ্বালায় বুঝি আমি সব জ্বলিয়ে দিতে বসলাম—বাঁচাও আমায়—তুমি তোমার পদ্ম হস্ত বুলিয়ে আমার এ-জ্বালা মিটিয়ে দাও....শেষের কটা দিন আর আমায় এই তেষ্টা নিয়ে যেন না দগ্ধাতে হয়....'

দিন যত অগ্রসর হইতে লাগিল কাত্যায়নী তত যেন সাধ মিটাইয়া দিনের সমস্ত মধুটিকে নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া পান করিতে লাগিলেন—

"কোথায় গেল বাঁড়ুজ্জে?....সেটি হচ্ছে না, বাপের কাছ থেকে আমি গুনে গুনে গয়না আদায় করব, তেমন কুটুম নয়, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে ছাড়ছে কে?...দাদাকে একবার বলে কয়ে পাঠিয়ে দেবে বড়দি', আমার

ওখানের মোটামুটি ব্যবস্থাটা তাঁকেই গিয়ে একবার ক'রে দিয়ে আসতে হবে, দেওর তো আনাড়ি মানুষ এক....আয় গিবি ; তোর চুলটা আমি বেঁধে দিই আজ....নিজের দিকে একটু চাইবি—গিন্নিত্ব করতে করতে কী যে মেয়ের ছিরি হয়েছে।"

সন্ধ্যার সময় যাত্রা, ঘণ্টাখানের আগে কাত্যায়নী প্রস্তুত হইলেন। উঠানের মাঝখানে একত্র হইয়া প্রণাম-আশীর্বাদের পালা চলিল। ভিতরে যেন একটা ঝড় উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে মুখ ফিরাইয়া নিজের ঠোঁটটাকে নির্দয়ভাবে কামড়াইয়া ধরিতেছেন।....তরী প্রায় ঘাটে ভিড়াইয়াছেন, আর একটু সময়, তাহা হইলেই সব রক্ষা হয়। বিদায়ের ক'টা মুহূর্ত যেন প্রাণপণে হালটাকে চাপিয়া আছেন।

গিরিবালা দুই দিন থেকে একটু দূরে দূরে থাকিতেছে ; আসিয়া কাত্যায়নীকে প্রণাম করিল। কাত্যায়নী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া দক্ষিণ হস্তে মুখটা তুলিয়া ধরিয়া একটু চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর মাথাটা গাঢ় আবেগে নিজের পাঁজরার কাছে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"গিবি...."

উপরি উপরি দুই তিনবার নিজের ঠোটটা কামড়াইয়া ধরিলেন, কিন্তু বাধা মানিল না ; দরদর করিয়া দুই গাল বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বসন্তকুমারী অতটা বুঝিলেন না ; বড় সুখের আলোড়নের পর বিদায়ের সময় হয় ওরকম। তবু বলার খাতিরেই বলিলেন—"ওকি কাতু, আহ্লাদ বুকে করে যাওয়ার সময় ..."

কাত্যায়নী আর পারিলেন না, বসিয়া পড়িয়া বসন্তকুমারীর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ও দিদি, এ যে কী সর্বনেশে আহ্লাদ—তোমাদের জানতে দিইনি....আমায় ক্ষমা করো—আমার এ লোভের কি প্রাশ্চিত্তির বলে দাও আমায়....আমি গঙ্গাপূজোর ফুল

এঁটোকুড়ে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছিলাম দিদি—বলো বলো, আমার কি উপায় হবে ?....”

পাড়ায় কথাটা যখন ছড়াইল, কত লোকে কত ভাবে কত বলিল, কত ভঙ্গীতে হাসিল। দামিনী নন্তীকে দিয়া খোঁজ লইয়া যখন জানিলেন বরদাসুন্দরী বাড়ি নাই, আসিয়া বসন্তকুমারীকে বলিলেন—“আমি আগেই জানতাম বড়-বৌ—বলে মার চেয়ে যার টান বেশি তাকে বলে ডাইন !....নেহাৎ মা সিংহবাহিনীর চোখের নিচে এমন একটা অঘটন নাকি ঘটতে পারে না, তাই নৈলে....”

জীবনে বোধ হয় এই প্রথম বসন্তকুমারী লঘু কৌতুকে দামিনীর সুরে সুর মিশাইলেন না। বেশ দৃঢ় এবং কতকটা রুক্ষ স্বরেই বলিলেন—“অমন কথা বলো না ঠাকুরঝি, অধর্ম্ম হবে। কাতু যে কী রত্ন মুঠোর মধ্যে পেয়েও নিজের ইচ্ছেয় ছেড়ে দিলে তা আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝেছি ; শুধু, মনটা কত বড হ'লে এমন ছাড়ান্ ছাড়তে পারে লোকে সেইটেই বুঝে উঠতে পারছি না।”

তৃতীয় পর্যায়

১

গিরিবালা জীবনে কোথাও অনাদর পান নাই, কিন্তু এটাও ঠিক যে কাত্যায়নী দেবীর মতো অমন হৃদয়ের সমস্ত মধু-ঢালা আদরও কোথাও পান নাই। তাই তাঁহার স্মৃতি গিরিবালার মনে একটা সম্পূর্ণ আলাদা স্থান অধিকার করিয়া ছিল। আর অন্য কারণ থাকিলেও কাত্যায়নী দেবীকে ঘিরিয়াই সমস্ত সিমুরটা বলিয়া সিমুরের কথা বোধ হয় গিরিবালার এত প্রিয় ছিল। কাত্যায়নী দেবীর প্রসঙ্গে মা যেন একেবারেই রূপান্তরিত হইয়া যাইতেন। এবং সেই জন্যই শৈলেনও কৃত্রিম করিয়া প্রসঙ্গটাই তুলিত বেশি। গল্প শুনিতে শুনিতে শৈলেনের মনে হইত না যে একজন প্রৌঢ়া কাহিনী বলিতেছেন, মনে হইত একজন কিশোরী জীবনের প্রভাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।—তাহার চারদিকে প্রীতি আর বাৎসল্য ছড়ান,—বৃক্ষ-বল্লরী-চ্যুত পুষ্পের মতোই সে সেগুলা কুড়াইয়া ফিরিতেছে।....গল্পের দিকে শৈলেনের কান থাকিত না;—সে মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত এই মায়ের মধ্যেই বিকশিত সেই তাহার কিশোরী জননীর পানে। আনন্দ-মাখা এক অদ্ভুত রহস্য শুধু তাহার দেহকে নয়, যেন মনটাকে পর্যন্ত রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিত। ঐ মা তাহার এই মা ই!....গল্প শুনিবে কি এরই সূত্র ধরিয়া জীবন তাহার সহস্র বিস্ময় লইয়া তাহার সামনে উপনীত হইত। ছেলেমানুষের প্রশ্নের মতোই কতকগুলা বোধহীন প্রশ্ন ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিত,—মা যখন কিশোরী, শৈলেন তখন কোথায় ছিল? সে—শুধু সেই কেন—তাহারা সব ভাইবোনে কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন আকারে,—অচিন্তনীয়, একেবারেই অব্যক্ত কোন ধারণামাত্র রূপে ঐ ত্রয়োদশী কিশোরী জননীর মধ্যে

ছিল?—নবজাতা লতার মধ্যে ভাবী লতাসন্ততি যেমন থাকে—মাত্র এক সম্ভাবনার আকারে? না, তাহারা তখন সম্পূর্ণই আলাদা, শুধু এই মহিমময়ীকে মা বলিয়া পাইবার জন্য কোন কঠিন তপস্যায় নিরত? ....শিশুর মতো প্রশ্ন সব, কিন্তু বড় ভালো লাগিত; মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। শিশু এক এক সময় যেমন হঠাৎ সব কিছু ছাড়িয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করে, নির্ণীত করিবার চেষ্টা করে, এই মানুষটিই সব চেয়ে এত আলাদা, সব চেয়ে এত কাছে কেন—সেই রকমের কি একটা ব্যাপার ঘটিতে থাকিত।.... গিরিবালা এক একবার হাসিয়া শৈলেনের পানে চাহিয়া বলিতেন— "তুই এত অন্যমনস্ক হয়ে যাস্ শৈলেন, মেজমাসির গল্প শুনতে শুনতে— অথচ শোনাও চাই বসে বসে। কী অত ভাবিস?"

শৈলেন চুপ করিয়াই থাকিত, একটু বোধ হয় অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া; তবে একদিন দিয়া ফেলিয়াছিল উত্তর, সেদিন বোধ হয় আরও বেশি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল—হাসিয়াই বলিল—"তুমিই অন্যমনস্ক হয়ে আমায় অন্যমনস্ক করে তোল মা। কাতুদিদিমা তোমায় যেন যাদু করে রেখেছেন—তুমি যেন স্পষ্টই আবার তার ছোট বোনঝিটি হয়ে যাও; আমি যেন দেখতে পাই।"

গিরিবালা হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"কেন, বাবা-জেঠামশাইদের কথাও তো বলি, সে সময় তো—"

শৈলেন উত্তর দিয়াছিল, হাসিয়াই,—"তা'হলে বলি মা?—রাগ করবে না না তো?—ওঁদের কথায় তুমি যেন কেমন গিন্নিবান্নি হয়ে যাও—ছোট একটি মা হয়ে যেন বুড়ো ছেলেদের সামলে বেড়াচ্ছ। কাতুদিদিমার গল্পে তোমার যেমন আদর খাওয়া ছোট মেয়ের রূপটা খোলে, তেমন আর...."

দু'জনের হাসিই একটু বেশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পরই গিরিবালা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিলেন—"তা বোধ হয় মিছে বলিস্ নি, কী যে আদর পেয়েছিলাম তাঁর কাছে সে সময় !···· মনে হয় আবার সেই বয়সে ফিরে গিয়ে আর একবার খেয়ে আসি।"

*　　*　　*　　*

পরদিন সকালে রসিকলাল প্রথমেই পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি গেলেন। বেঞ্চের পিছনটায়, বাড়ি আর রাস্তার মাঝখানে একফালি জমির উপর একটা ফুলের বাগান। বাগানের ও-প্রান্তে পণ্ডিতমশাই বেড়ার একটা বাতায় গেরো দিতেছিলেন, নামাবলি গায়ে খড়ম পায়ে সমবয়সী কে একজন যাইতে যাইতে রহস্য করিয়া বলিলেন—"বাগানের বেড়া দেওয়া হচ্ছে, সোমেশ্বর ?—রাম প্রসাদের মতো বেড়া বাঁধতে পার তবে তো।"

পণ্ডিতমশাই হাসিয়া বলিলেন—"সেই চেষ্টাতেই আছি, দেখি যদি আনতে পারি ফাঁকি দিয়ে বেটিকে। এলে কিছু চোখা চোখা সওয়াল আছে।"

"বলে ফেললে, আর সে আসবে ?—ওই সওয়ালের ভয়েই তো আসতে চায় না। কত বড় ধড়িবাজ মেয়ে।"

দুইজনে হাসিয়া উঠিলেন, এমন সময় বেঞ্চের সামনে রাস্তায় রসিকলালের ঘুড়িটা উপস্থিতির সাড়া দিয়া উঠিল, পণ্ডিতমশাই ফিরিয়া দেখিয়া কতকটা যেন চিন্তিতভাবেই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়া বেঞ্চটা ঘুরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রসিকলাল ঘুড়ি থেকে নামিয়া রাশটা হারাণের হাতে তুলিয়া দিলেন, তাহারপর পণ্ডিতমশাইকে প্রণাম করিয়া উৎফুল্ল বদনে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, চোখ দুইটি হালকা দুই বিন্দু জলে চকচক করিতেছে। পণ্ডিতমশাইয়ের মুখে

একটা উগ্র উৎকণ্ঠা লাগিয়া রহিয়াছে—যা আঘাতটা পাইয়াছে রসিক যেন সব কিছুই হইতে পারে।

রসিকলাল সংবাদটা নানারকম ভাষায় মণ্ডিত করিতে করিতে আসিতেছিলেন, যেন সব ভুলিয়া গেছেন। শেষে একটু চাহিয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত চাপা কণ্ঠেই বলিলেন—"আপনার আশীর্বাদ ফলে গেল পণ্ডিতমশাই....আমার কিন্তু বরাবরই আশা ছিল ফলবেই....কেটে গেছে গিরির এ ফাঁড়াটা...."

পণ্ডিতমশাই চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া "অ্যাঁ।"—করিয়া কতকটা অশোভন উচ্চৈঃস্বরেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রসিকলালের দক্ষিণ বাহুটা ধরিয়া দুইজনে আসিয়া বেঞ্চটাতে বসিয়া বলিলেন—"কি ব্যাপার বল সবিস্তারে, সত্যিই আমি ধৈর্য রাখতে পারছি না রসিক—কি যে অবস্থা যাচ্ছে!...."

রসিকলাল আস্তে আস্তে সাধ্যমত নিজের মন্তব্য সহকারে কাল সন্ধ্যার কাহিনীটা বিবৃত করিয়া গেলেন। শুনিতে শুনিতে পণ্ডিতমশাইয়ের চিরন্তন শান্তিটি আবার পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল। শেষ হইলে রসিকলালের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"চলো ঘরে গিয়ে বসি রসিক, তাতটা বেড়ে উঠছে।....ওখানে খুট খুট কিসের শব্দ ওটা!....ও! তোমার সেই পাখোয়াজি সহিস বুঝি?"

হাসিতে হাসিতে দুইজনে ঘরের ভিতর একটি মাদুর-পাতা তক্তাপোষের উপর গিয়া বসিলেন। পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"পা তুলে গুছিয়ে বসো রসিক, গোটাকতক কথা আছে।"

একটু থামিয়া বলিলেন—"আমার মনটাও কাল থেকে বড় খারাপ হয়ে আছে রসিক, অবশ্য তুমি বাপ, তোমার কথাই আলাদা, তবুও কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। সকালে একটু অন্যমনস্ক থাকবার

জন্যেই কাদম্বরীটা নিয়ে বসলাম—কিছুতেই অভিনিবেশ হ'ল না, ঐ দেখো না, পড়ে আছে, তোলাও হয় নি। শেষকালে কাতাটা নিয়ে বাগানে গিয়ে নেমেছি, তুমি এলে।....এ হতেই হবে রসিক, এত বড় অন্যায় কখনও হয় না। আমার গণনায় কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রম ছিল না। ও-কন্যার যেখানে বিবাহ সেখানে স্থির হয়েই আছে; নড়চড় হবার জো নেই। সঙ্কটের কথা তো তোমায় বলেইছিলাম—সাবিত্রীর পাঁচ জায়গায় সম্বন্ধ করতে হয়েছিল, দময়ন্তীর বিবাহেও সঙ্কট উদয় হয়েছিল, এ-সব সঙ্কট কিন্তু কর্পূরের মতো উবে যেতে বাধ্য।....কাল সব কথা শুনে গিন্নি বললেন—'চার পো কলি, এখন সত্য ত্রেতা যুগের কথা ধরে বসে থাকলে চলবে কেন?'....মেয়েছেলে, তাদের সঙ্গে তর্ক করাই অবিধেয়, জানই তো—স্ত্রীয়াহি নাম খল্বেতা নিসর্গাদেব পণ্ডিতাঃ—অর্থাৎ স্ত্রীজাতি আপনা-আপনিই পণ্ডিত—তবে আমার যতটুকু আত্মলব্ধ জ্ঞান তাতে মনে হয় চারপো সত্য যুগ বলেও কোন যুগ কখনও ছিল না, চারপো কলি বলেও কোন যুগ কখনও হবে না। পাপ যদি কোন কালে বেশি গাঢ় হয়ে ওঠে—কালধর্মে, তো পুণ্যও হয়ে উঠবে সেই অনুপাতেই উজ্জ্বল। এই সৌর সংসার সূর্যের আলো-ছায়ার নিয়মেই চলে আসছে; সেই নিয়মেই চলবে—ছায়া যত নিবিড়, আলো ততই প্রদীপ্ত।....তোমার শ্যালীর এই আত্মজয়টা পুরাণের কোন্ আত্মজয় থেকে ন্যূন আমায় বলো না? হয় তো বলবে তিনি লুব্ধ হয়েছিলেন। অত্যন্ত স্বাভাবিক—গিরিবালার মতো মেয়েকে আত্মসাৎ করতে চাইবে—বিশেষ করে তাঁর মতো এক স্ত্রীলোক যে চিরকালটা বঞ্চিতই রইল সংসারে—এ অত্যন্ত প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার। তা না হলে গিরিবালাকে শ্রী আর স্বভাবে অমন মধুর্ব সৃষ্টি করে পাঠাবার কোন সার্থকতাই থাকত না বিধাতার পক্ষে। কিন্তু ঐ লোভের রূপই কি

তোমার শ্যালীর আসল রূপ ?—তিনি যে সেই-লোভকেই মাড়িয়ে এই স্বমহিমায় উঠে দাঁড়িয়েছেন—এই তাঁর প্রকৃত রূপ না দেখতে পেলে কি ওঁর চেয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যই বেশি নয় রসিক ?—"

প্রত্যেক কথাটি রসিকলালের মনে অনুরূপ ধ্বনি তুলিতেছিল, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"আমি ওঁকে ভালো করেই জানি পণ্ডিতমশাই, আমার মত এক মুহূর্তের জন্যও বদলায় নি, তবে একথা ঠিক যে একটু আশ্চর্য হ'য়ে পড়েছিলাম। কিন্তু নানান লোকে নানান কথা...."

পণ্ডিতমশাই কথাটা শেষ হইতে দিলেন না, অধরোষ্ঠে অল্প যেন চাপ দিতে দিতেই বলিলেন—"নানান লোকে নানান কথা।...লোক!—আপামর সাধারণ!—তারা অন্তঃসত্ত্বা জানকীকেও অরণ্যে পাঠিয়েছিল রসিক!—ভুললে চলবে না সে কথা...."

দুইজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন, যেন মহিমার সঙ্গে বেদনায় মণ্ডিত যে প্রসঙ্গটি উঠিয়াছে দুইজনেই সর্বান্তঃকরণ দিয়া সেটাকে অনুভব করিতেছেন। একটু পরে কতকটা যেন আচমকাই মুখটা তুলিয়া পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"হ্যাঁ, যার জন্যে তোমায় ভেতরে ডেকে আনা;—রসিক, পাত্রের সন্ধান আমি পেয়েছি।"

অদ্ভুত কথা। যে-প্রসঙ্গের মধ্যে আর মনের যে অবস্থায় শোনা, আরও যেন অদ্ভুত ঠেকিল কানে; রসিকলাল মুখটা ঈষৎ হাঁ করিয়া পণ্ডিতমশাইয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন, পণ্ডিতমশাই বলিতে লাগিলেন—

"পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। কাল নিজেই আমি সংবাদটা নিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তার আগেই তুমি এলে, আর এমন উল্টা এক সংবাদ নিয়ে এলে যে কথাটাই আর তোলবার অবসর পেলাম না আমি। পূর্বেই বলেছি, তুমি বাপ, তোমার কথা আলাদা, কিন্তু সন্ধানটা পাওয়ার

অব্যবহিত পরেই অমন আঘাতটা পেয়ে আমারও যে কি করে কেটেছে তা অন্তর্যামীই জানেন রসিক। স্নেহে আঘাতের চেয়ে বিশ্বাসে আঘাত যে কোন অংশেই কম নয়, সেইটেই আমি উপলব্ধি করছি কাল থেকে।"

রসিকলাল বলিলেন—"আপনার স্নেহ কি আমার চেয়ে কম পণ্ডিত-মশাই ?—আমি তো বুঝি ?"

পণ্ডিতমশাই সস্নেহে শিষ্যের পিঠে হাত দিলেন, স্মিত হাস্যের সহিত কহিলেন—"নিজের গভীরত্বেই সমুদ্রতল অন্ধকার, তাই সে দেখতে পায় না সে কত গভীর। তবে একটা কথা তোমায় আবার বলব রসিক— বিশ্বাস আমার আঘাত পেয়েছিল বটে তবে টলেনি। সমস্ত বেদনার মধ্যে আমি বরাবর পারছিলাম—এটা দেবের রহস্য মাত্র, পাপ—সে স্বস্থানেই আছে সময়েই আসবে। এক একটা ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে একটু জটিলতা সৃষ্টি ক'রে বিধাতা মানব চরিত্রের এক একটা দিক আমাদের সামনে প্রকাশ করে ধরেন—ভালোর দিক, আবার মন্দের দিকও হতে পারে,—এ তাই হয়েছে। যাক, আসল কথাটা বলি ঃ তোমায় বলেছিলাম দুরদৃষ্টবশতঃ আমার এক সময় উজ্জয়িনী প্রবাস ঘটেছিল, মনে আছে বোধ হয়। প্রথম যখন যাই তখন গাড়িতে আমার একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। বাড়ি সাঁতরায়, তবে আমারই মত ঘর-ছাড়া বাই—একটা কুঠিতে কাজ নিয়ে মিথিলায় বসবাস করছেন। সুরসিক এবং সুপণ্ডিত মানুষ, আর সুপুরুষ। বরং শুধু সুপুরুষ বললে তাঁর বর্ণনাটা সম্পূর্ণ হয় না, একে সুন্দর তায় বরাবর পশ্চিমে সুখ-পরিপণ্ডির মধ্যে কাটিয়েছেন—অমন কান্তিমান পুরুষ আমাদের মধ্যে দেখাই যায় খুব কম। বহুদূর পর্যন্ত একসঙ্গে আর খুব আনন্দে গিয়েছিলাম আমরা ; তারপর পাটনার কাছাকাছি

কোন একটা ইষ্টিশনে নেমে তিনি গঙ্গা পেরিয়ে কর্মস্থলেব অভিমুখে চলে গেলেন।

"প্রায় পনেরো বৎসর পরে হঠাৎ পরশু তাঁর সঙ্গে দেখা। নবদ্বীপ গিয়েছিলাম জানই, ফেববার সময় ত্রিবেণী পর্যন্ত নৌকায় এসে রেল ধরলাম। এমনি বিধির নিবন্ধ, যে-গাড়িটিতে উঠলাম ভদ্রলোকও সেই গাড়িতে বসে আছেন। বহুদিন পরে দেখা হ'লেও সামান্য একটু খটকা কাটিয়েই উভয়ে উভয়কে চিনতে পারলাম। তারপর যতক্ষণ গাড়িতে ছিলেন, দু'জনে মুখোমুখি হ'য়ে আলাপ করে কাটানো গেল। বললেন বড ছেলেটি দেশেই আছে, বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক ক'রে এবং সম্ভব হ'লে একেবারে বিবাহ দিয়েই কর্মস্থলে এইবার নিয়ে যাবেন। নিজের বয়স হ'য়ে এসেছে, এবার ছেলেটিকে কাজে নিয়োজিত করে দেওয়া দরকার। কতদিনের পরিচিতের মত অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা। যদি বিবাহের যোগাযোগ হয় তো আমায় পূর্বেই নিমন্ত্রণ দিয়ে রাখলেন, বললেন সময়ে আবার জানাবেন। গাড়িতে আলাপের একটু অসুবিধে এই যে প্রায় প্রতি ইষ্টিশনেই নূতন লোকের সমাগম হ'তে থাকায় প্রতি ইষ্টিশনে কথাবার্তার মোড় ঘুরে যায়। তায় সময় অল্প আর বলবার কথা অনেক। বিচ্ছিন্নভাবে অনেক রকম কথা হ'ল। গাড়ি যখন অনেকটা এগিয়ে এসেছে, বিদ্যুৎস্ফুরণের মতো একটি কথা আমার মনে উদয় হল—হিমালয়ের পাদমূলে সুদূর মিথিলায় এই তো বর। আমরা যাকে খুঁজছি সে তো এই; একে দেখিনি, কিন্তু এই রকমই পিতাব সন্তান হ'য়ে, দেবদুর্লভ রূপ নিয়ে, এই রকমই কুলশীলের অধিকারী হ'য়ে তো তার জন্ম নেওয়ার কথা। আমার নবদ্বীপ যাওয়া, অকস্মাৎ এই দেখা হওয়া, এমনি কি পনেরো বৎসর পূর্বেকার সেই প্রথম সাক্ষাৎ—সবই যেন দৈব-নির্দিষ্ট বলে মনে হ'ল আমার। 'আমার

হাতেও একটি অতি সুলক্ষণা পাত্রী আছে'—ব'লে প্রস্তাবটা তুলব—একেবারে ঠোঁটে এসেছে, এমন সময় তাঁর যেন হঠাৎ চাঁক হল। অন্য কি একটা প্রসঙ্গ চলছিল, হঠাৎ বিরতি দিয়ে বলে উঠলেন—'দেখুন! এত সুযোগ পেয়েও ভুলে যাচ্ছিলাম।—আপনি তো পণ্ডিত মানুষ, বহু জায়গায় গতায়াত আছে,—আপনার সন্ধানে কোন পাত্রী যদি থাকে। যৌতুক সম্বন্ধে আমার কোনই লোভ নেই, তবে কন্যাটি সুশ্রী, এবং সুলক্ষণা হওয়া দরকার।' "

পণ্ডিতমশাই রসিকলালের পানে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া অর্থপূর্ণ হাস্যের সহিত বলিলেন—" 'সুলক্ষণা' কথাটি লক্ষ্য করবে রসিক। ঠিক্ এই কথাটি আমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল।...বললেন—'কন্যাটি সুশ্রী আর সুলক্ষণা হওয়া চাই, আর সৎবংশের, ব্যস এর বেশি আমার দেখবার দরকার নেই, গরীব কি বড়লোকের মেয়ে, সহুরে কি পাড়াগেঁয়ে আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না'—আমি গিরিবালার কথা স্রেফ চেপে গেলাম।"

পণ্ডিতমশাই থামিয়া গিয়া রসিকলালের পানে চাহিয়া মিটিমিটি একটু হাসিয়া তেজের সহিত বলিলেন—"আগেই অমনি হামড়ে পড়তে যাব কেন হ্যা? মেয়ে আমাদের ফেলনা নাকি? ওঁর সুশ্রী সুলক্ষণা মেয়ে চাই, আমাদের বুঝি কাণাখোঁড়া যা' হক একটা পাত্র হলেই হ'ল—ইস্!....আরে কে আসছে তাতো জানিই, তবে দাপট ছাড়ি কেন? নিম্নু হই কেন?....বললাম—'আছে একটি মেয়ে; তবে সে-মেয়ে হওয়া দুরূহ'....

"বলতেই তো তিনি সঙ্গে সঙ্গে সোজা হ'য়ে বসলেন—'কেন, দুরূহ কেন, পণ্ডিতমশাই?'

"আমি যেন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বললাম—'দুরূহ। আরও

হু'টি মেয়ে আছে হাতে, তবে একটু নিরেশ, তা আপনার বোধ হয় চলে যাবে'।"

পণ্ডিতমশাইয়ের মুখের হাসিটা আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল, বলিলেন—"তোমরা ভাব পণ্ডিতমশাই শুধু কাব্যচর্চা করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে—ষাঁড়ের গোবর। ঘটকালি যা আরম্ভ করলাম দেবর্ষি নারদ খানিকটা শিখে যেতে পারতেন! তোমার বেহাই (বিবাহ স্থির নিশ্চয় রসিক, এ তুমি লিখে রেখে দাও)—তোমার বেহাই একেবারে জিদ ধরে বসলেন—'না, পণ্ডিতমশাই, আমার ঐ মেয়েই চাই, হুরূহ কেন বলুন খুলে, হুরূহ বলে যদি আমি সরে দাঁড়াতাম তো সতেরো বছর বয়সে একবস্ত্রে সাড়ে তিনশো মাইল পাড়ি দিয়ে বিদেশে চাকরি করতে পারতাম না। বলতেই হবে আমাকে।'....আর একটু ন্যাজে খেলালাম তোমার বেহাইকে, তারপর বললাম—"আপনি মাত্র সুশ্রী আর সুলক্ষণা পাত্রী চান, পাত্রীর পিতা চায় একেবারে দেবকান্তি পাত্র, লক্ষণ আর কুলশীলের কথাতো ছেড়েই দিন—সামান্য একটুও খুঁৎ থাকলে পেছিয়ে পড়বে।....অনেক সম্বন্ধই এল গেল—হু'একটা এত বাঞ্ছনীয় যে আমরা চারিদিক থেকে চেপে ধরলাম; কিন্তু উঁহুঃ, নিজের কোট ছেড়ে সে একচুল নড়বার পাত্রই নয়, এ বিষয়ে জনকরাজা ওর চেয়ে ঢের সুবিবেচক ছিলেন মশাই। বড্ড রাশভারি কড়া লোক। তাই বলছিলাম আপনি ওটার আশা ছেড়ে বরং অপর হু'টিকে দেখতে বলেন তো চেষ্টা দেখি।

"যা প্যাঁচ দিয়েছি, পারে কখনও ছাড়তে রসিক?—'আপনি এখুনি নেমে আমার ছেলেকে দেখে নেবেন চলুন পণ্ডিতমশাই; নিজের ছেলের বড়াই করতে নেই, তবে যদি বলেন যে সেরকম ছেলে আপনাদের নজরে পড়েছে এর পূর্বে তো আমি আর একটুও অনুরোধ করব না'।"

নিজের কূট ঘটকালি নীতিতে আর রাসকলালের বেহাইয়ের দুরবস্থায়

পণ্ডিতমশাই বেশ প্রাণ খুলিয়া একটু হাসিয়া লইলেন ; তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলিলেন....“আরে আমার তো অজানা নেই ছেলের সম্বন্ধে, সে যে কী ছেলে হবে সে তো বহুদিন পূর্বেই তোমায় বলে দিয়েছি হে, তবে ঐ যে বললাম—দাপট ছাড়ি কেন ? আর অমন নাতনির বিয়েতে যদি প্রাণ খুলে খানিকটা ঘটকালি না করতে পারলাম....”

পণ্ডিতমশাই আবার হাসিয়া উঠিলেন। রসিকলাল নীরবে শুনিয়া যাইতেছে, তাঁহার বদনে কখন সাফল্যের, কখনও গৌরবের, কখন মাত্র কৌতুকের আলোক খেলিয়া যাইতেছে। এক একবার একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পণ্ডিতমহাশয়ের আত্মগরিমা আজ এতই মুখর যে অবসর মিলিতেছে না। কন্যাকে কেন্দ্র করিয়া গুরু খানিকটা নির্দোষ মিথ্যাচরণে ডুবিয়া গেছেন, প্রসন্ন গৌরবে শিষ্য সেটা উপভোগ করিতেছেন—এমন অদ্ভুত যোগাযোগ পূর্বে কখনও আর হয় নাই। হাসি থামাইয়া পণ্ডিতমশাই বলিলেন—“তাড়াহুড়া করে ছেলে দেখতে যেতে আমার বয়ে গেছে, নাতনির হাত আগে না দেখে থাকতাম তো একটা কথা ছিল বরং, তার চেয়ে শাগগির তোমায় খবরটা দেওয়ার বেশি তাড়া ছিল ; মনে হচ্ছিল গাড়ির বেগ নেই, লাফিয়ে পড়ে ছুটি তেজপুর পানে। আবার হরিপুরে যাবার কথা শুনে গেছলাম কিনা,...ধড়ফড়ানি লেগে রইল। তোমার বেহাইকে বললাম,—‘এই মুহূর্তেই নামা আমার সম্ভব হল না ; তা ভিন্ন, আমি তো আপনার কথায় অবিশ্বাস করছি না ; যার অবিশ্বাস করা একটা বাই দাঁড়িয়ে গেছে, আর যার অবিশ্বাসে আটকাবে, খোদ তাকেই গিয়ে আমি পাঠিয়ে দোব।’

নাও, ঠিকানা-টিকানা ভালো করে নিয়ে এসেছি, তোমার বেহাইটাকে যা’ই বলে আসি না কেন, তুমি সব কাজ ফেলে কালক্ষেপ না ক’রে একবার হয়ে এস দিকিন। আমি যেতাম সঙ্গে, কিন্তু এসেই বেহাইয়ের

এক নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছি ; তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ। যেতেই হবে, বড্ড খ্যাদড়া লোক। শিষ্যের বেহাইয়ের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার ক্ষমতা রাখি বটে, কিন্তু আমার নিজের নাকে আমার নিজের বেহাইয়ের দড়ি।”

আবার হাসিয়া উঠিলেন, হাসি থামিলে বলিলেন—“আমি একবার যাব, বিয়ের আগে একবার দেখে আসব বৈকি, তবে তার আগে তুমি একবার বুড়ি ছুঁয়ে এসো, কথাবার্তা শুরু হ'য়ে যাক। বরং গিরিবালার কুষ্ঠিটাও পকেটে করে নিয়ে যেও ; চান, তাঁদের দিয়ে এসো। অন্নদাচরণকে একবার বলবে ?—বলতে তো হবেই, সেই তো কর্মকতা, তবে তার আগে তুমি চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে এসো।··· না, তুমিই দেখে এসো আগে, কবি-দৃষ্টি এক আলাদা বস্তু হে, যে যতই বলুক, ওখানে আমরা কারুর কাছেই হার মানতে নারাজ।”

২

রসিকলাল আর বিলম্ব করিলেন না। একটা চিকিৎসার জন্য একটু পরামর্শ করিতে কলিকাতা যাইবার নাম করিয়া সাঁতরা যাত্রা করিলেন। খুব প্রত্যুষেই যাত্রা করিয়াছিলেন—পণ্ডিতমশাইয়ের কাছেই লগ্ন ঠিক করিয়া লইয়া। রেল থেকে যখন নামিলেন তখন সাতটা। রেলের ধারে ধারে একটা রাস্তা ধরিয়া অনেকটা যাইতে হয়। তাহার পর রেলের একটা চরখি পড়ে—রেলপথটা পারাপার করিবার জন্য। সেইখানে আসিয়া রসিকলাল একজন ভদ্রলোককে সামনে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন—“ভটচার্যি পাড়া কোন দিকটায় যাব মশাই ?”

ভদ্রলোক গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছেন। বয়স অনুমান পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, গৌরকান্তি, সুপুরুষ, হাতে একটি বড তামার ঘটিতে এক ঘটি জল। অনুচ্চস্বরে একটি স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে ক্ষিপ্রগতিতে আসিতেছেন। সমস্ত শরীবটি শুচিতায় দীপ্ত হইলেও মুখের ভাবটা যে খুব প্রসন্ন, এমন কথা বলা যায় না, দৃষ্টিও বেশ চঞ্চল। রসিকলালের প্রশ্নে দাঁড়াইয়া পডিলেন। মুখে যেন একটা ব্যঙ্গ হাস্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন—"এসে পডেছেন ভটচার্যি-পাডায়, এইখান থেকেই আরম্ভ হ'ল। কার বাডি যাবেন?"

ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় মশাইয়েব বাডি।

ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করিযা প্রশ্ন কবিলেন—"কোথা থেকে আগমন হচ্ছে আপনার?"

"বেলে-তেজপুর থেকে।"

ভদ্রলোক আবার একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন—"কি কাজ?....থাক্, কাজের কথা পবেই হবে; আসুন, আমাবই নাম ভগবতী মুখোপাধ্যায়।"

দুইজনে আবার চলিতে আবম্ভ করিলেন। ভগবতীচরণ মাঝে মাঝে স্তোত্রের খুঁটটুকু ধরিয়া আবম্ভ করিতেছেন, আবাব যেন অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া যাইতেছেন। রসিকলাল কথা কহিবার সাহস পাইতেছেন না। সঙ্গীর ভাবভঙ্গীতে নিজেকে কেমন যেন বিপন্ন বলিয়া মনে হইতেছে। খানিকটা গিয়া ভগবতীচরণ মুখ খুলিলেন, তাঁহাকে কিছু বলা নয়—একটা বাড়ির সামনে রকে বসিয়া প্রায় সমবয়সী একটি ভদ্রলোক তামাক সেবন করিতেছিলেন, ভগবতীচরণ দাঁড়াইয়া পড়িয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"আজ ভদ্রলোকের কাছে বড় অপদস্ত হ'লাম হে রমেশ।"

রসিকলাল যেন ভয়ে-সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেলেন। রমেশ একবার তাঁহাকে দেখিয়া লইয়া, ভগবতীচরণের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"ব্যাপারখানা কি ?—নতুন লোক দেখছি যেন ?"

ভগবতীচরণ আবার ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন, বলিলেন জানাশোনা হ'লে তো কোন কথাই ছিল না, জানতেনই ভটচায্যি-পাড়ার এই রূপই হয়েছে আজকাল। জানেন না বলেই না, পাড়ার মাঝে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল—'ভটচায্যি পাড়া কোথায় বলতে পারেন ?'....অথচ শুনেছ বোধ হয় রমেশ, কর্তাদের আমলে সাঁতরায় এসে কাউকে পরিচয় নিয়ে ভটচায্যি পাড়ায় ঢুকতে হ'ত না।"

কথার ভাবে বোধ হইতেছে দোষটা রসিকলালের তত বেশি নয়, তবুও একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে না পারায় তিনি নির্লিপ্তভাবে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

রমেশ বলিলেন—"একটু ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়েছে বৈকি ; তবু তুমি রয়েছ, অষ্টপ্রহর খিটখিট করছ...."

"আর খিটখিট !"....বলিয়া ভগবতীচরণ অগ্রসর হইলেন। কতকটা নিজের মনেই এবং কতকটা বোধ হয় রসিকলালকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—"খিটখিট করি কি সাধে ? ভটচায্যি পাড়ায় এসে মানুষে জিগ্যেস করবে, কোন্ পাড়ায় এলাম, তবে তো ব্রাহ্মণকেও শূদ্র বলে ভ্রম হবে এবার ! তা হবেও, যা কাল এসেছে। ভগবতীচরণ খিটখিট করে ব'লে এটুকুও বজায় আছে এখনও, যেদিন চোখ বুজবে, সেইদিনই মুন্সিপালিত ঢুকে যদি উচ্ছন্ন না দেয় পাড়া তো...."

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার স্তোত্র পাঠ শুরু করিলেন ; কিন্তু একঠায় পড়িয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।—কোথায় একটু বোধ হয় ছাই কি গোময় পড়িয়া আছে, কোথায় ঝাঁট দেওয়ার মধ্যে একটু

ত্রুটি,—ভগবতীচরণের শ্লোকের সূত্র ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। কখনও পাশের বাড়ির কাহাকেও ডাকিয়া কখনও বা আলগোছেই তিরস্কার করিয়া উঠিতেছেন। সে তিরস্কার যেমন স্পষ্ট তেমনই তীক্ষ্ণ, অল্প একটুও ক্ষমার প্রশ্রয় নাই। কখনও দাঁড়াইয়া আবার সহৃদয় প্রশ্নাদিও করিতেছেন—"তোর মেয়েটি আজ কি রকম আছে সারদা?....ছেলেটি যে পালিয়েছিল, কালকে নাকি ফিরে এসেছে রাঙাখুড়ি?....আছে বাড়িতে?....আচ্ছা এখন থাক, এখনই গিয়ে পূজোয় বসতে হবে, মেজাজটা বিগড়ে থাকবে। বৈকালে পাঠিয়ে দেবে একবার....অর্বাচীন, কোথাকার!"

চলিতে চলিতে পাশের বাড়ি হইতে কখনও কখনও শোনা যাইতেছে—"ওরে ভগবতীচরণ-কাকার নেয়ে ফেরবার সময় হ'ল, দেখ বেরিয়ে একবার, বাইরেটা ঠিক মতো ঝাঁট দিয়েছে কিনা!"...."ওরে, গোয়ালের দিকে কেউ এখন যাস নি বুঝি? দেখ শাগ্‌গির; পস্কের করে দে দু'টো কিছু ধরে গরুটার মুখে; ভগবতীচরণ-দাদার ফেরবার সময় হয়েছে।"

অপর কণ্ঠে অনুযোগ উঠিতেছে—"ক'দিক যে সামলাবে গেরস্ত একসঙ্গে!"

আরও অপরার কণ্ঠে, সম্ভবত ঝিয়ের—"আর ও-আবাগী গরুও যেন টের পায় বাপু, নালিশ মুখে করেই আছে।"

ভগবতীচরণ রসিকলালকে বলিতেছেন—"মিলিয়ে যাবেন।....কিচ্ছু বলব না তো! দু'দিন পরে যা হবে তা আজই হোক, ভগবতীদাদার বেঁচে থাকতে থাকতেই।—রাস্তায় ঘাটে ঝাঁট পড়বে না, দোরে ছড়া পড়বে না, গোয়ালঘরে ঢুকবে শুধু কেঁড়েভরে দুইবার সময়—সমস্ত অনাচার যদি একসঙ্গে না এসে পড়ে!—এসে পড়ে কি, পড়েছে এসে...."

কণ্ঠস্বর যেমন চড়াইয়া দিয়াছেন, বেশ বোঝা যায় শুধু রসিকলালকে

সাক্ষী মানাই উদ্দেশ্য নয়।....বাড়িটার সমস্ত শব্দ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেছে, গরুটার 'নালিশ' পর্যন্ত। মনে হয় যেন তিনজনেই সব কাজ ফেলিয়া তাহার তদারক লইয়া পড়িয়াছে।

বড় কৌতুক বোধ হইতেছে রসিকলালের। রেলের চরখির নিকট হইতে পাড়ায় প্রবেশ করিয়া তিনি যেন একটি নূতন জগতে আসিয়া পড়িয়াছেন। ভগবতীচরণ যাহাই বলুন, রসিকলাল পাড়ার অনেকখানি তো অতিক্রান্ত করিয়া আসিলেন—রাস্তা, ঘাট, বাগান, এমন কি মুক্ত-দ্বার দিয়া অনেক বাড়ির ভিতরেও তাঁহার যেটুকু নজর গেল, কোথাও এতটুকু আবর্জনা চোখে পড়িল না। সব তকতকে ঝকঝকে করিয়া পরিষ্কৃত। শুধু তাহাই নয়,—সব বাড়িতেই পূজার আয়োজন আছে বলিয়া বোধ হইল ; ক্বচিৎ ঘন্টির আওয়াজের সঙ্গে সমস্ত পাড়াটির হাওয়া ধূপ-ধুনা আর মৃদু পুষ্প-সৌরভে বোঝাই হইয়া আছে। কোন বাড়ির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে মন্ত্রপাঠের শব্দ কানে আসিতে লাগিল। শুচিতায়, সৌন্দর্যে, পবিত্রতায় রসিকলালের কবিমনে জায়গাটাকে যেন একটা স্বপ্নলোক বলিয়া মনে হইতেছিল। না পরিচয় লইয়া ভটচায্যি পাড়ায় পৌঁছিয়া যাওয়ার অর্থটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন,—ভগবতীচরণের ধ্যানে এরই একটা পূর্ণতর রূপ আছে নিশ্চয়। সে-পরিকল্পনা যে কী তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে সামনে যাহা কিছু দেখিতেছেন শুনিতেছেন, সমস্ত যেন একসূত্রে গাঁথা ;—রাস্তা চলিতে চলিতে মনে হয় না একটা পাড়ার মধ্যে দিয়া চলিয়াছি,—মনে হয় একখানি বাড়িরই বিভিন্ন অংশ, গৃহকর্তা উঠান বাহিয়া, সন্ধান লইয়া লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।....ভগবতীচরণ আসিতেছেন—স্নান করিয়া ফিরিবার সময় হইয়া গেছে—চারিদিকেই একটা সন্ত্রস্ত ভাব ; কিন্তু বেশ বোঝা যায় সেই সন্ত্রাসের সঙ্গে আছে একটি অপরিসীম শ্রদ্ধা, একটা

পরম নির্ভরশীলতা, প্রাণঢালা দরদ না পাইলে যা সম্ভব হয় না।····এমন পাড়াও দেখেন নাই, আর সমস্ত পাড়ার উপর এমন আধিপত্যও দেখেন নাই। রসিকলালের মনটিও বিস্ময়, সম্ভ্রম, আর শ্রদ্ধায় ভরিয়া আসিতে লাগিল।

কিন্তু তবু একটা অস্বস্তি লাগিয়াই রহিল কোথায় যেন। বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

খুব যে বড বাড়ি এমন নয়, তবে বেশ খানিকটা জায়গা লইয়া। প্রথমেই সবুজ ঘাসে ভরা খানিকটা উঠান। তাহার পর একটি পাকা বৈঠকখানা, সামনে খানিকটা রক, তাহারই একপাশ দিয়া ভিতর-বাড়ি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। ভিতর বাড়ি, বৈঠকখানা, মায় সামনের উঠানটি পযন্ত একটা টানা পাঁচিল দিয়া ঘেরা। ওদিকে পাড়ার লোকদের সন্ত্রস্ত বলিয়া মনে হইতেছিল, এখানে অসিয়া মনে হইল সমস্ত বাড়িটাই যেন নিজেকে সূক্ষ্মতম আবিলতা হইতে বাঁচাইয়া তটস্থ হইয়া আছে।—ভগবতীচরণ স্নান করিয়া ফিরিতেছেন!

দুইজনেই গিয়া রকের উপর উঠিলেন। ভগবতীচরণ বলিলেন—"আপনি গিয়ে বসুন, আমি ততক্ষণ পূজোটা ঝট করে সেরে আসি।··· আর পূজো!—যা বিঘ্ন পদে পদে! মধুও এক্ষুনি এসে পড়বে এই সময় পাড়ায় একটু দেখা-সাক্ষাৎ করতে বেরোয়, ডাকতেও পাঠাচ্ছি।"

নিজে আর ঘরে প্রবেশ করিলেন না, রক থেকে নামিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

বোধ হয় দুয়ারের নিকট হইতেই প্রশ্ন করিলেন,—কৈ রে, হ'ল পূজোর জো'টা?"

বেশ একটি ঝঙ্কৃতকণ্ঠে উত্তর হইল—"নাঃ, হ'য়ে আর কাজ কি? তুমি পাড়া তদারক করে বেড়াও, মেজাজও আগুন হয়ে উঠতে

থাকুক, ঠাকুরও শুকোতে থাকুন।....আজ খুব বেশি বেলা করে ফেলেছ।”

যাহারই কণ্ঠস্বর হোক, সে যেন উন্মুখ হইয়া ছিল। রসিকলাল উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন,—বাড়িতে কলহ-অশান্তি আছে নাকি?....আর কিন্তু কোন তরফেই কোন কথা শোনা গেল না।

বৈঠখানায় একটা বড় তক্তপোষের উপর টানা ফরাস বিছান, গোটাকতক তাকিয়া ধারে ধারে বসান আছে। তক্তপোষের পাশেই একটি লম্বা কাঠের বৈঠকে গোটাকতক হুকা বসানো কোনটাতে একটা কড়িবাঁধা, কোনটাতে তুইটা কোনটাতে বা তিনটা ; গোটাতুই নিরাভরণ। পাশেই একটা আলাদা বৈঠকে একটি সুদৃশ্য আলবোলা। একধারে সায়েব-বাড়ি থেকে কেনা গদি-আঁটা চারখানা ভালো ভালো কেদারা, একটা সাধারণ কাঠের সীট দেওয়া চেয়ার, একটা ভালো আলমারি। তুইখানি থাকে বই,—পদ্মপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য-চরিতা-মৃত, মেঘনাদ বধ কাব্য, এণ্ট্রেন্স ক্লাসের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক, একখানি টেনিসনের বাঁধানো ভল্যুম। বাকি তুইটি থাকের মধ্যে একটিতে পিতল-কাঁসার কয়েকখানি সুদৃশ্য বাসন—তুইখানি রূপারও। একটিতে কিছু কাচকড়া আর মাটির পুতুল। দেয়ালে খানকতক দেবদেবীর ছবি আর তুইখানি বিলাতি ল্যাণ্ড্‌স্‌কেপ্‌।

পরিবারটি পুরাতনপন্থী, ভগবতীচরণই তাহার সাক্ষী, তবুও রসিক-লালের মনে হইল কোন্‌ দিক দিয়া নূতন হাওয়াও যেন একটু একটু প্রবেশ করিয়াছে। রসিকলাল নিজে যে কোন্‌ দিকে বলা শক্ত, তাঁর জীবনের মধ্যে ডাক্তার-বেশে নিজেও আছেন—নূতনের প্রতীক, আবার পণ্ডিতমশাইও আছেন। আসল কথা তাঁর রুচি-মন অভিনবত্ব খোঁজে, নূতনে-পুরাতনে যেখানেই পায়—সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাপ্রবণ হইয়া পড়ে।....

বেশ লাগিতেছে বাড়িটি, পাড়াটি, নূতন সুরে ভরা আজিকার সমস্ত প্রভাতটিই চমৎকার বোধ হইতেছে।....ওই দুয়ার দিয়া, ওই সবুজ দুর্বাদলের ঘাসের উপর কচি পা ফেলিয়া চেলি-পরা বধূ-বেশিনী গিরিবালা প্রবেশ করিল....এই তার বাড়ি—তেজপুরের মেটে ঘরে এতদিন মানুষ হইয়া ওঠা তাঁহাদের সেই গিরিবালা....কেমন দেখায় তাহাকে এখানে?....প্রতিদিনই দেখিতে না পাওয়ার জন্য অথচ নূতন জীবনে প্রতিদিনই বদলাইয়া যাইতেছে বলিয়া কতকটা যেন অপরিচিত, অথচ কত নিজের! শত যোজন দূরে থাকিলেও, শত যুগের অদর্শন ঘটিলেও গিরিবালা কি এতটুকু আলাদা হইবার? আশ্চর্য!.... গিরিবালার হয় তো একদিন এই সামনের আলমারিটা খোলার দরকার হইবে....খানিকটা বড় হইয়াছে, চাবির থোলোটা হাতে লইয়া চাবিটা বাছিয়া লইল....গিরিবালার নিজের আলমারি, সখ হইয়াছে একটা নূতন কি পুতুল রাখিবে, কিম্বা প্রয়োজন হইয়াছে—শৌখিন একটা রেকাবি বাহির করিতে হইবে....

একটা চাকর আসিয়া প্রবেশ করিল। পশ্চিমা চাকর। ভাঙা বাংলায় প্রশ্ন করিল—"বাবু তামাক সাজিয়ে আনবো?"

রসিকলাল সম্মতি দিতে গড়গড়া, একটা কলিকা আর একটা ডিবার মধ্যে হইতে একটু তামাক ও খান দু'এক টিকা লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।....ব্যাঘাত পাইয়া কল্পনার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, তাহার জায়গায় আসিয়া পড়িল একটু দুশ্চিন্তা,—ভগবতীচরণ লোকটি কি রকম?—একটু বোধ হয় কোপনস্বভাব,—একটু নয় বিলক্ষণই। এই অল্পটুকু আসিতেই যতটা দেখা গেল, বেশ উৎসাহ মনে হয় না। আর, এ শুধু রাস্তা দিয়া আসা, অনাত্মীয়দের কোথায় কি ত্রুটি হইয়াছে তাহার খোঁজ লইতে লইতে; নিজের বাড়িতে, পরিপূর্ণতার মধ্যে কি স্বরূপ

ভগবতীচরণের ? ভগবতীচরণকে অতিক্রম করিয়া গিরিবালাকে এ-বাড়িতে আনিয়া ফেলা যাইবে কি ? সেও পরের কথা, আপাতত তিনি এমন কোপনস্বভাব লোকের সঙ্গে কথাবার্তাই বা চালাইবেন কি করিয়া ? একে এমনই শক্ত, তাহার উপর আবার দেখাইতে হইবে তিনি রাশভারি, তিনিও কম কড়া লোক নহেন।—পণ্ডিতমশাই যে রাস্তা একেবারে বাঁধিয়া দিয়াছেন !

একদিকে লোভ, আশা আর একদিকে ভয় ; ভগবতীচরণের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো যদি নেহাতই অসম্ভব না হয় তো খুব শক্ত তো নিশ্চয়ই, সমস্ত রাস্তায় একটি কথা বলিবার সাহস হয় নাই। এদিকটা যতই ভাবিতেছেন, মনটা ততই অস্বস্তিতে ভরিয়া আসিতেছে। শুধু যে মনে হইতেছে পণ্ডিতমশাই আসিলে ছিল ভালো এইটুকুই নয়, নিরুপায় মনটা পণ্ডিতমশাইয়ের উপর এক একবার বিরূপ হইয়া উঠিতেছে,—নিজে আসিতে পারিলেন না অথচ রাশভারি বলিয়া রসিকলালের পরিচয় দিয়া এক ফ্যাসাদ বাঁধাইয়া বসিলেন !....আবার সব ঠেলিয়া গিরিবালা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সে যে আসিবেই, এ যে তাহারই বাড়ি,—পণ্ডিতমশাইয়ের গণনা তো মিথ্যা হইবার নয় ; কাতুদিদির ওখানকার ফাঁড়াটা কাটিয়া গেল কি করিয়া ?—শরতের মেঘের মতো দেখিতে দেখিতে আকাশে যেন মিলাইয়া গেল !

আর ভগবতীচরণ লোকটা ভালোই,—শুদ্ধাচারী, পরহিতব্রতী।.... 'পরহিতব্রতী !'...মনে ওঠামাত্র এই কথাটিকে যেন দশ অঙ্গুলি দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিলেন। গিরিবালা লইয়া পণ্ডিতমশাই যতই জোরের কথা বলুন না কেন, আসলে রসিকলাল কন্যাদায়গ্রস্তই তো ? পরহিতব্রতী লোকেরই তো দরকার তাঁহার।

এই সমস্যা যদি বা মিটিল আর একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়া

ওঠে। ভগবতীচরণের কথার উত্তরে যে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল সে কে? গিরিবালার শাশুড়ি নয় নিশ্চয়, তবে?....

চিন্তায় তাঁহার বাধা পড়িল। সদর দরজা দিয়া আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। ভগবতীচরণের মতোই চেহারা, তবে শরীরটা আরও বলিষ্ঠ, রংটা আরও মাজা। পাত্রের পিতা, আর সন্দেহ নাই। উদ্বেগে রসিকলালের সমস্ত আন্তরাত্মা যেন কণ্ঠে আসিয়া জড়ো হইয়াছে।

ভিতরেই যাইতেছিলেন, বৈঠকখানার দিকে নজর পডায় দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথা থেকে আগমন হচ্ছে মশাইয়েব?"

রসিকলাল উত্তর কবিলেন—"বেলে-তেজপুর থেকে।"

কথাটা যেন আগন্তুককে সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে আকর্ষণ করিয়া লইল, ফরাসে উপবেশন করিতে করিতে বলিলেন—"বেলে-তেজপুর থেকে? পণ্ডিতমশাই পাঠিয়েছেন?"

আগ্রহটা দেখিয়া রসিকলাল অকূলে কূল পাইলেন, উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, পণ্ডিতমশাই পাঠিয়েছেন।"

"নমস্কার। তবে তো....কখন এলেন আপনি?"—ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

রসিকলাল প্রতি-নমস্কার করিলেন, বলিলেন—"মিনিট পনের-কুড়ি হবে। আপনি মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মশাই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ; দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"হয়েছে, তিনি নেয়ে ফিরছিলেন, একসঙ্গেই এলাম।"

মধুসূদনের মুখটি এক মুহূর্তেই শুকাইয়া গেল। ঐ রকম জেদি, কড়া-প্রকৃতির লোক, তাহার উপর গোড়াতেই দাদা তাঁহাকে একলা বসাইয়া গেলেন, অভ্যর্থনায় এত বড় একটা ত্রুটি হইয়া গেল! কয়েক

মুহূর্ত কী যে বলিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না ; তাহার পর দাদার বিলম্বের জবাবদিহি হিসাবে কহিলেন—"দাদা আসবেন এখুনি। আসল কথা, নাওয়ার পরই তাঁর পূজোটা সেরে নেওয়া চাই-ই, মনটা যা'তে কোন রকমে চঞ্চল হ'য়ে না উঠতে পারে আর কি।"

একটু হালকাভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন—"সামান্যতে একটু চটে যান কিনা, রাস্তায় আসতে-আসতেই সেটা টের পেয়েছেন নিশ্চয় ?"

টের যথেষ্ট পাইয়াছেন ; রসিকলাল মধুসূদনের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। হাস্যে যোগদান তো করিতেই পারিলেন না, অস্বস্তির ভাবটা যেন ভিতরে ভিতরে বাড়িয়া গেল। বলিলেন—"আমি ওবেলা আসব'খন একটু ঠাণ্ডা পড়লেই। কাছেই দু'একজন আত্মীয়-স্বজন আছেন।....নিশ্চয়ই, পূজোটা আগে সেরে নেবেন বৈ কি,—মনস্থির করে...."

মধুসূদনের মুখের ভাবটা এমন হইল যেন যেটি আশঙ্কা করিয়াছেন, ঠিক সেইটি ফলিয়া গেছে। বলিলেন—"উঠলেন ? না ; সে কি হয় ? এতক্ষণ যখন দয়া করে বসেছেন....এসে যদি আবার দেখেন আপনি নেই তাহলে আমার ওপর যে....পূজোর পরেও এক একদিন মেজাজটা বিগড়ে থাকে কিনা...."

পূজোর পরেও !....দাদার ভালো করিয়া পরিচয় রসিকলাল এতক্ষণ পান নাই,—ভিতরের আতঙ্কে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ! একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"ওঠা....মানে, ওবেলা তো আসছিই.... বাড়িটা দেখা রইলই...."

একটা অসহ্য অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, থাকা একেবারেই চলে না ; অথচ ভালো একটা ছুতাও জোগাইতেছে না, মনের এরকম গোলমেলে অবস্থায়....

মধুসূদন নিজেও দাঁড়াইয়া উঠিলেন—"না; সে কোন মতেই হতে পারে না; একটু তামাকও খেলেন না; দাদা আমার আর কিছু বাকি রাখবেন না; ভয়ানক বদরাগা লোক, আপনি জানেন না। তায় আসতে আসতে আজ আবার আরও বেশি চটে রয়েছেন...."

তাহার কারণটাও রসিকলাল কতকটা নিজে!—"জো নেই থাকবার মশাই; বাড়িটা একবার শুধু দেখে নিতে এসেছিলাম—সেটা হয়ে রইল, আবার আসছিই তো বিকেলে"—বলিয়া আবার একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া পা বাড়াইয়াছেন,—বেয়াড়ারকম রাগা আর একবগ্‌গা লোককে লইয়া মধুসূদনের অবস্থাটা বর্ণনার বাহিরেই—এমন সময় এক হাতে গোটাকতক গোলাপ আর গন্ধরাজের চারা লইয়া ও অন্য হাতে একটি মেয়েকে ধরিয়া একটি যুবক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিল। মধুসূদন ক্ষণমাত্র কি চিন্তা করিয়া লইয়া ডাক দিলেন—"বিপিন, এ দিকে এসো একবার, গাছগুলো ঐখানেই রেখে দাও।"

রসিকলাল আর এক পা বাড়াইয়াছিলেন, যুবকের পানে নজর পড়িতেই থামিয়া গেলেন। উঠান বাহিয়া আসিতে যতটুকু সময় লাগিল ঠায় চাহিয়া রহিলেন। ঐটুকু সময়ের মধ্যে বিস্ময় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কী একটা অনিবচনায় ভাবে তাঁহার মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিল। মধুসূদন চকিতে একবার দেখিয়া লইলেন।

যুবক দুয়ারের কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"কি বাবা?"

মধুসূদন বলিলেন—"একে প্রণাম করো।"

যুবক একটু কুতূহলী দৃষ্টিতে ক্ষণমাত্র রসিকলালের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া মধুসূদনকে প্রশ্ন করিল—"ডাকছেন আমায়?"

"তোমার জেঠামশাইয়ের পুজো হ'ল কিনা দেখো তো একবার।"

যুবক চলিয়া গেলে রসিকলালের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"এইটিই আমার বড় ছেলে।"

দরকার ছিল না, তবুও রসিকলালের পক্ষে ফিরিয়া আবার বসাটা সহজ করিয়া দিবার জন্যই বলিলেন—"না, একটু বসে যেতেই হবে আপনাকে।"

বেশ ভালো করিয়া গড়গড়া প্রভৃতি ধুইয়া পশ্চিমা চাকরটা তামাক আনিয়া হাজির করিল।

৩

দুই বৈবাহিকের প্রথম সাক্ষাৎ দুই পরিবারের মধ্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা,—এই বৈঠকখানাকেই কতবার হাস্যমুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

মধুসূদন বলেন—"আরে, আমার কাছে পণ্ডিতমশাই গেয়ে রেখেছেন, মস্ত বড জিদে, রাগী, রাশভারী লোক, দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে অথচ একলাটি বসিয়ে দাদা পূজো করতে লেগে গেছেন, পনের কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে....আমার তো আক্কেল গুড়ুম। মুখের দিকে চেয়ে দেখি মুখ একেবারে বর্ষার মেঘের মতো থম-থম করছে। হবে না? একে মানী লোক, এমনি তটস্থ হয়ে থাকতে হয়, তার ওপর এই অভ্যর্থনা!....আমি কি করে জানব, বেহাই এদিকে দাদার গতিকগাতাক দেখে একেবারে থ' মেরে গেছেন?....দেখছি—মানী লোকের যতই মান ভাঙাবার চেষ্টা করি, সে ততই ভেতরে ভেতরে ওঠে ক্ষেপে—বেহাই যে ওদিকে দাদা আসবার আগেই পিঠ বাঁচিয়ে পিঠ্‌টান দিতে চান্‌....

হাসির হররা ওঠে....

রসিকলাল লজ্জিতভাবে হাসিতে হাসিতে বলেন—"আমি তো ছিলাম সামলে-সুমলে একরকম,—'রাগী, বদরাগী, আজ আবার বেশি চটে আছেন'—এইসব বলেই তো বেহাই আমায় আরও ঘাবড়িয়ে দিলেন।....সাত্ত্বিক মানুষ, নেয়ে মনটি শুদ্ধ করে পূজোয় বসবার জন্যে আসছেন, আর হবি তো হ' আমিই ভটচার্যি-পাড়ার কথা জিগ্যেস করে দিয়েছি খিঁচড়ে মনটা। হয় সাহস আর বসে থাকতে ?....বেহাইয়ের পিঠ শক্ত, অমন দাদা থাকলে হয়ই শক্ত, সবার তো আর তা নয়...."

হাস্যের তরঙ্গ আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে।

ভগবতীচরণ যখন প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। রসিকলাল গড়গড়া সেবন করিতেছিলেন, সদ্যত্যক্ত নলটার মুখ দিয়া ধোঁয়ার একটা ক্ষীণ রেখা বাহির হইতেছে, মধুসূদন মাথাটা নিচু করিয়া ফরাসের উপর নখ দিয়া ধীরে ধীরে আঁক কাটিতেছেন।.. ভিতরকার কথাটা এই যে মধুসূদন আর ঘাঁটাইতে সাহস পাইতেছে না, ওদিকে ছেলেটি চোখে দেখা পর্যন্ত রসিকলালের সমস্যা আরও ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে—ছাড়িয়া যাওয়াও অসম্ভব, বসিয়া থাকাও দুষ্কর।

ভগবতীচরণ আসিয়া সম্পূর্ণ কাঠের যে চেয়ারটি তাহার উপর উপবেশন করিলেন। পায়ে খড়ম, গায়ে একখানি রেশমের নামাবলি। মুখের পানে চাহিয়া রসিকলাল একটু বিস্মিত হইলেন। পূজার পূর্বের সেই একটা বিরক্তির ছাপ, দৃষ্টির সেই চাঞ্চল্য আর ক্রমাগতই ছিদ্রান্বেষণের কৌতূহল—সেসব যেন একেবারেই নাই, তাহার জায়গায় বেশ একটি স্থির প্রসন্ন ভাব।....সাঁতরার লোকেরা ভগবতীচরণের এই

দু'ধরণের রূপের সঙ্গে খুব পরিচিত; বলে,—ভগবতীঠাকুর গঙ্গা থেকে শুধু দেহটাকে স্নান করাইয়া আনেন, পূজায় করান আত্মার স্নান, তখন তাঁর পূর্ণরূপ ফুটিয়া ওঠে।

মধুসূদন রসিকলালকে যে বলিয়াছিলেন,—দাদার মেজাজ এক একদিন পূজার পরও বিগড়াইয়া থাকে সেটা সম্পূর্ণ বানাইয়া বলিয়াছিলেন, নিজের গঞ্জনার কথা বলিয়া রসিকলালকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য।

ভগবতীচরণ মধুসূদনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মধু নিশ্চয় শুনেছ, ইনি বেলে-তেজপুর থেকে আসছেন?"

মধুসূদন যেন একটা জড়তা কাটাইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"হ্যাঁ, আলাপ পরিচয় হ'ল। ইনিই মেয়ের বাপ।"

"বাঃ, বড় আনন্দের কথা।"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু আলাপে একটু বেশি মেতেছিলে বলে বোধ হচ্ছে। ওঁর এখনও জামাজোড় খোলা হয় নি, হাত-পা ধোওয়া হয় নি। প্রজাপতি যদি যোগাযোগ ঘটান তো অভ্যর্থনা-সৎকার সম্বন্ধে বৈবাহিককে একটু নিরাশই হতে হবে দেখছি।"

—বেশ পণ্ডিতী চালের ঘর-কাঁপান একটি হাসি হাসিয়া উঠিলেন। তাহাতেই ঘরের গুমোট ভাবটা একেবারে কাটিয়া গেল। রসিকলাল মধুসূদন—এঁরা দু'জনেও কতকটা লজ্জিত ভাবে হাসিতে যোগদান করিলেন। চাকরটাকে ডাকিবার জন্য মধুসূদন উঠিলে ভগবতীচরণ বলিলেন—"আর আহারও উনি এখানেই করবেন,—সাঁতরা আর বেলে-তেজপুর এপাড়া ওপাড়া নয়।"

বৈঠকখানা হইতে ভিতরে যাইবার একটা দুয়ার আছে; সেইটা খুলিয়া মধুসূদন চাকরকে ডাক দিলেন, আহারের কথা শুনিয়া নিজেই

ভিতরে যাইতেছিলেন। ভগবতাচরণ বলিলেন—"সে সব আমি বলে এসেছি, তুমি ব'স এসে।"

পশ্চিমা চাকরটা আসিয়া, জুতা খুলিয়া খড়মে পা বসাইয়া, জামা উড়ানি আলনায় টাঙাইয়া রাখিয়া স্নানাদির সরঞ্জাম করিয়া দিল এবং তাহারপর বেশ পরিপাটিভাবে তৈলমদন শুরু করিয়া দিল। এই সবেরই ফাঁকে ফাঁকে উভয় পক্ষের খানিকটা বংশ পরিচয় হইয়া গেল, খানিকটা পারিবারিক পরিচয়ও। যদিও আসল কথাটা পাড়া হইল না, তবুও সমস্তই বেশ অনুকূল বলিয়া বোধ হইতেছে, একটি প্রীতি আর আত্মীয়তার ভাব সংলাপকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছে। তেলমাখা শেষ হইয়া আসিলে ভগবতীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন--"আপনি তাহলে এবার স্নানাহ্নিক সেরে নিয়ে একটু জলযোগ করে নিন।" তাহারপর নিজের পেটে হাতটা একবার বুলাইয়া বলিলেন—"আমারও জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছেন, তাঁকে ঠাণ্ডা না করলে অব্যাহতি নেই। আসছি আমি এক্ষুনি।"

সেই ধরণেরই অপেক্ষাকৃত মৃদু হাস্য করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন। তখনই আবার ফিরিয়া আসিয়া দুয়ারটা একটু খুলিয়া মধুসূদনকে বলিলেন—"একটু দেখো মধু ওঁকে, কুটুম্বিতার পূর্বেই কুটুম্বিতার ত্রাস জন্মে দিও না যেন।"

হাসিতে হাসিতেই দুয়ার ভেজাইয়া চলিয়া গেলেন।

একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে খানিকক্ষণ কাটাইতে হইয়াছিল বলিয়াই পরস্পরে মনের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া দুই বেহাইয়ের আলাপ, আর সেই আলাপের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেশ জমিয়া উঠিল। মধুসূদনের আশ্চর্য বোধ হইতেছে পণ্ডিতমশাই যে লোকের পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহার কাছে সে লোক কই? এ-তো যতই দেখিতেছেন, যতই

শুনিতেছেন, ততই নিতান্ত একটি শিশুর মতো সরল প্রকৃতি তাঁহার সামনে উদ্ঘাটিত হইয়া উঠিতেছে। মধুসূদন নিজে সতর্ক লোক, একটা গোটা নীলকুঠির প্রায় হর্তা-কর্তা-বিধাতা,—একদিকে সাহেব আর অন্য দিকে আমলা প্রজা থেকে সামান্য মজুরটির পর্যন্ত মেজাজ, গতিবিধি আর চরিত্রের হিসাব রাখিয়া চলিতে হয়; তবুও এই অনাড়ম্বর মনের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বিবাহ লইয়া তাঁহার আগ্রহের কথা তো প্রকাশ করিয়া ফেলিলেনই, তাহা ভিন্ন অন্য বিষয়েও কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে পারিলেন না। নিজের ঘটনাবহুল জীবনের অনেক কথাই এই নবপরিচিতের নিকট ব্যক্ত করিয়া ধরিলেন। তাহাতে এও প্রকাশ হইয়া পড়িল যে দূর বিদেশে, নিতান্ত এক পাড়াগাঁয়ে বাঙ্গালী বলিতে সপরিবারে এক তিনিই, অনেক সুবিধার সঙ্গে অসুবিধাও বিস্তর, পথও বেশ সু-কর নয়;—আরও অনেক কথা, বৈষয়িক হিসাবে যা'সব লুকাইয়াই রাখা সঙ্গত ছিল,—বিবাহ যেখানে নির্বাসনেরই নামান্তর, কে আর জানিয়া শুনিয়া সেখানে অগ্রসর হয়? এক ঝোঁকে সমস্ত বলিয়া গিয়া বোধ হয় একটু ভয়ও হইল, পাকা বিষয়ী মনই তো? একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই রসিকলালের মুখের পানে দু'একবার চাহিলেন—কোন ভাবান্তর উপস্থিত হইল কিনা লক্ষ্য করিবার জন্য। পণ্ডিত-মশাইয়ের পরামর্শ মতো এইখানে একটু 'রাশভারী' হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল রসিকলালের, বলার রাস্তা ছিল—'তাই তো মশাই, একটু ভাবিয়ে তুললেন যেন....দেখতে হচ্ছে ভেবে চিন্তে একটু....এতটা যে তাতো জানতাম না'....অন্তত—"পণ্ডিতমশাইকে একবার জিগ্যেস করে দেখি, বিচক্ষণ লোক তিনি...."

সে-ধরণের তো কিছু বলিলেনই না, বরং মনের আনন্দে একেবারে উল্টা কথা বলিয়া দিলেন; ঈষৎ হাস্যের সহিত মধুসূদনের মুখে সমস্তটা

শুনিয়া গিয়া বলিলেন—"আমি তাই মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিলাম—পণ্ডিত-মশাই বললেন কিনা—'রসিক, মেয়ের সবই ভালো—পিতৃকুল, শ্বশুরকুল উভয় কুলই সমুজ্জ্বল করবে, তবে ঐ এক কথা—মেয়ের বিবাহ বহুদূরে, হুট করে যে চাইবে একবার দেখে আসি মেয়েকে সেটি হবার জো নেই'.... আচ্ছা কাছে-পিঠে হিমালয়ের কোন অংশ পড়ে কিনা বলতে পারেন কি?"

রসিকলাল স্মিত হাস্যের সহিত চাহিয়া আছেন,—মধুসূদন মনে মনে একটু হিসাব করিতে করিতে বলিলেন—"দাঁড়ান, তা কাছেই বলতে হবে বৈকি, শীতকালে আকাশ একটু পরিষ্কার থাকলেই আমরা বরফঢাকা চূড়াগুনো দেখতে পাই ; একটু বৃষ্টি হয়ে গেলে যেদিন আকাশ বেশি পরিষ্কাব থাকে, ঝলমল করতে থাকে।"

বসিকলাল উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন,—"বললাম না ?—অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে ; বললেন 'হিমচক্রের মধ্যে তোমার গিরিব বিয়ে হবে'....মেয়ের নাম হ'ল গিরিবালা—হিমচক্র হ'ল হিমালয়ের পঞ্চাশ ক্রোশ পর্যন্ত জায়গা, এর পরেও মেয়ে আমার দূরদেশে পড়ল বলে দুঃখু করা চলে ? আপনিই বলুন না ?"

পণ্ডিতমশাইয়ের একটা কথা মধুসূদনের মনে পড়িয়া গেল—"সামান্য একটু খুঁৎ থাকলে পিছিয়ে পড়বে....ওর চেয়ে জনকরাজা ঢের সুবিবেচক ছিলেন মশাই।"

আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করিলেন—"তাহ'লে আপনার আর অমত নেই, ধরে নিতে পারি তো ?"

রসিকলাল পণ্ডিতমশাইকে একেবারেই ভুলিয়া গেলেন, হাসিয়া খুব বিজ্ঞের মতো বলিলেন—"অমত ! এখন ভালোয় ভালোয় আপনাদের জিনিস আপনাদের দিয়ে নিশ্চিন্দি হতে পারলে বাঁচি মশাই ; এ যেন পরের বোঝা মাথায় করে রয়েছি।"

স্নান-আহ্নিকের পর জলযোগ করিতে করিতে কথাটা আরও এক ধাপ অগ্রসর হইল। প্রসঙ্গটা উঠিল ঘিয়ের কথা লইয়া। মধুসূদন বলিলেন—"হালুয়া, লুচি, নিমকি ওসবই ওখানকার ঘিয়ে ভাজা, স্বাদটা একটু লক্ষ্য করে দেখবেন।"

রসিকলাল লুচিতে মুড়িয়া খানিকটা হালুয়া মুখে তুলিতেছিলেন, বিস্মিত-আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—"তাই নাকি! বাঃ এ তো চমৎকার যোগাযোগ! গিরিকে গিয়েই বলতে হবে,—গিরি, তোর আসল শ্বশুর-বাড়ির ঘি খেয়ে এলাম···সাঁতরা যদিও মূল, তবু সেই তো এখন কার্যত ওর আসল শ্বশুরবাড়ি? কি বলেন?

এমন সরল প্রকৃতির মানুষকে পণ্ডিতমশাই অত উগ্র বলিয়া পরিচিত দেওয়ায় মধুসূদনের মনে মাঝে মাঝে একটা প্রশ্ন না জাগিতেছিল এমন নয়। আপত্তি করিবেন কি,—রসিকলালই তো বরং কথাটা আগাইয়া লইয়া যাইতেছেন। পণ্ডিতমশাই তাহা হইলে অমনভাবে বলিলেন কেন?—হয় তো রসিকলালকে বেশি অন্তরঙ্গভাবে জানেন না, নয় তো যে অত কড়া তার একটু উগ্রত্বেরও তো পরিচয় পাওয়া যাইত। কথাবার্তার মধ্যে এইটুকুও এক সময় পরিষ্কার হইয়া গেল। রসিকলাল বলিলেন—"আর কি করে যে আমি কাটান্ দিয়ে আসছি তা পণ্ডিতমশাই নিশ্চয়ই বলে থাকবেন আপনাকে। ভালো ভালো সব সম্বন্ধ এসেছে। ঝুলোঝুলি, রসিক ঠিক তার গোঁ ধরে বসে আছে। এই তো দু'দিন হয় নি—আমার শালি—নিজের শালি আমার, তার বৈমাত্র দেওরপোর জন্যে বাড়ি এসে সে হত্যে দেবার মতো; মেয়ের গর্ভধারিণীকে, জেঠাইকে, এমন কি আমার দাদাকে পর্যন্ত হাত ক'রে নিলে—মেয়েমানুষ এসব বিষয়ে কি রকম পোক্ত জানেনই তো; আমি সেই নিজের কোট ধরে বসে আছি। দাদা আমায় বাইরের ঘরে ডেকে পাঠালেন, একলা,

জানেনই বড্ড একবগ্‌গা লোক আমি,—বললেন—'গিরির বিয়ের ঠিক করে ফেলেছি আমি, কাতুর দেওরপো'র সঙ্গে।

—ভয়ঙ্কর রোখা লোক দাদা, অস্বীকাব করব না, আমিও এখন পর্যন্ত সব সময় মুখ তুলে কথা কইতে ভরসা পাই না,...স্পষ্ট বললাম—'ওখানে গিরির বিয়ে দাদা! তোমরা যে অবাক করলে—।'...'কেন, আপত্তিটা কি শুনি? তোর মেয়ে ব'লে তোর জোর?'

ভয়ানক একরোখা লোক, একবার যা ঠিক করে ফেলেছেন সে-সম্বন্ধ নড়চড় করে কার সাধ্যি। তা আমিও তো কম যাই না, বললাম—"জোরের কথা হচ্ছে না, তুমি থাকতে আব আমার কিসের জোর? তবে গিরির কুষ্ঠিটা একবার দেখো ওখানে কি ওর...."

দুয়ার খুলিয়া ভগবতীচরণ প্রবেশ করিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"জলযোগ হ'ল আপনার একটু?....কুষ্ঠিব কথা হচ্ছিল?"

কল্পনায় দাদার সঙ্গে স্পষ্টভাবে কথা বলিতে পারায় রসিকলালের মনটা আরও স্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, মধুস্থদনের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তা বলতে গেলে একরকম কোষ্ঠীবিচারটুকুই শুধু বাকি আছে...."

মধুস্থদন বলিলেন—"আমি তোমায় বলছিলাম না দাদা? যদি স্থবিধে হয় তো বিয়েটা একেবাবে দিয়েই যাব। দিন পনেরো তো এখনও হাতে আছে ছুটির, একটা আটুই একটা তেরোই দিন আছে বলছিলে না তুমি? আজ ছউই হ'ল, আটুইটা তো হতেই পারে না, যদি সম্ভব হয় তো তেরোই...."

ভগবতীচরণ হাসিয়া উঠিলেন, অনেক বিবাহ দেওয়াইয়াছেন, তাঁর অত ত্বরিত আর অত অসতর্ক হইলে চলে না, বলিলেন—"তুমি যে শিশুর মতো কথা কইছ মধু! আমাদের হিন্দুর বিবাহ, এ তো বর-কনে কোন

রকমে গির্জায় একবার গিয়ে উঠতে পারলেই হ'ল না। উভয় পক্ষের ভালো রকম করে পরিচয় নিতে হবে, ছেলে দেখা আছে, মেয়ে দেখা আছে, ভালো করে কোষ্ঠীবিচার আছে, আশীর্বাদ আছে···যেগুনো করণীয় সব করতে হবে তো ?"

প্রবল আবেগের মধ্যে উপদেশের আকারে প্রায় এই ভৎ'সনাটুকুতে উভয়েই যেন ভিতরে ভিতরে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন ; রসিকলাল, ভগবতীচরণ আসিয়াই কোষ্ঠীর উল্লেখ করায় কোষ্ঠীটা প্রায় বাহির করিয়া দিতে যাইতেছিলেন, চাপিয়া গেলেন।

ভগবতীচরণ রসিকলালকে প্রশ্ন করিলেন—"কি বলেন ? এগুনো সব তো করতেই হবে ?"

রসিকলাল সঙ্গে সঙ্গে খুব ভারিক্কে হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তা করতে হবে বৈ কি, হিন্দুর ঘর ! "তা করতে হবে না ? বাঃ !"

মধুসূদন বলিলেন—"না, আমি বলছিলাম, যেগুনো দরকারি সেগুনো সেরে যদি দেখা যায় সে যোগাযোগ হচ্ছে তো এই ঝোঁকেই কাজটা সেরে যেতাম একেবারে, আবার সেই চার শ মাইল ঠেলে আসা সহজ নয় তো ? না আটুই হ'ল, তেরোই রয়েছে, না—তেরোই, আরও না হয় হপ্তা'খানেক ছুটি বাড়িয়ে নিলাম।"

ভগবতীচরণ বলিলেন—"তাতে আপত্তি করছি না, সম্ভবের মধ্যে যতটা তাড়াতাড়ি পারো করো না তুমি। ছেলে উনি দেখে যাচ্ছেন, তুমি একদিন গিয়ে মেয়ে দেখে এসো। ইতিমধ্যে কোষ্ঠীবিচার হোক, কোষ্ঠীনা কি এনেছেন উনি সঙ্গে করে ? না হয় গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন।"

রসিকলাল একটু যেন স্মরণ করিবার ভঙ্গীতে বলিলেন—"কোষ্ঠীটা কি দিয়াছে সঙ্গে ? আনলেই হতো তবে আমি আবার বারণ করে দিলাম,

বললাম—'দাঁড়াও, আগে দেখাশুনা হোক, পরিচয়াদি হোক, তাড়াতাড়ি তো কোষ্ঠী নিয়ে বসলেই চলবে না।....দাঁড়ান্ দেখি, দিয়ে দিয়েছে কি না ভুল করে।"

উঠিয়া যে পকেটগুলায় না থাকিবার কথা সেইগুলায় প্রথমে দেখিলেন, তাহারপর কোটের বুক পকেট থেকে কতকটা নির্লিপ্তভাবেই কোষ্ঠীটা বাহির করিয়া ভগবতীচরণেব হাতে দিয়া বলিলেন—"যাক, দিয়েই দিয়েছে দেখছি।"

ভগবতীচরণ কোষ্ঠীটা মনে মনে পাঠ করিতে লাগিলেন, ইহারা দুইজনে মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ভগবতীচবণের মুখে এক একটি সূক্ষ্ম বেখা ফুটিয়া তখনই মিলাইয়া যাইতেছে। রসিকলাল বিশেষ কিছু বুঝিলেন না, তবে মধুসূদন দাদাকে চেনেন, তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না যে কোষ্ঠীটায় খুবই অসাধারণ কিছু একটা আছে, মুখে বিস্ময়, প্রশংসা আর আনন্দেব ভাব উঠিতে না উঠিতেই জ্যেষ্ঠ সংবৃত কবিযা লইতেছেন। শেষ করিয়া অনুচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—কোষ্ঠীটি বেশ ভালোই দেখছি। কে তোয়ের করেছেন ?"

রসিকলাল নাম বলিলেন।

"বেশ পণ্ডিত লোক। এইবার একবার বিপিনের কোষ্ঠীর সঙ্গে দেখতে হবে। আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি, তোমবা ততক্ষণ গল্প সল্প করো।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ভগবতীচরণ আবার প্রবেশ করিলেন।

ভগবতীচরণ অভ্যর্থনা-আতিথ্যে যতই মুক্তচিত্ত, আর কৌতুকপ্রবণ হন, বিষয়-সম্পর্কীয় কথায় খুব সংযত ; এটাও ভুলিবার লোক নন যে

তাঁহারা বরপক্ষীয়। যখন প্রবেশ করিলেন, মধুসূদন লক্ষ্য করিলেন খুব যেন একটা বড় আনন্দ আর আবেগকে চাপিবার চেষ্টায় মুখটা একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ভগবতীচরণ যেন একটু কাঁপিতেছেন। চেয়ারে আসিয়া বসিতে মধুসূদন প্রশ্ন করিলেন—"কেমন দেখলেন দাদা?"

"উঁ?" বলিয়া ভগবতীচরণ মাথা নিচু করিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন—"তোমার যদি এতই তাড়া থাকে তো একটা শ্রম আমি লাঘব ক'রে দিতে পারি।"

দু'জনে উৎসুক নেত্রে তাহার পানে চাহিলেন। ভগবতীচরণ আর বরপক্ষীয়ের গাম্ভীর্যটা রক্ষা করিতে পারিলেন না; নিজের মনের আনন্দটাকে যেন পূর্ণ মুক্তি দিয়াই রসিকলালের পানেই চাহিয়া বলিলেন—"আমাদের আর মেয়ে দেখবার প্রয়োজন হবে না, একেবারেই গিয়ে আশীর্বাদ করব।"

দু'জনে বিস্মিতভাবে চাহিতে বলিলেন—"অদ্ভুত যোগাযোগ, প্রায় শতাধিক বিবাহ আমি নিজের হাতে দিয়েছি, এমনটি চোখে পড়েনি।"

বিস্মিত-প্রফুল্ল দৃষ্টিতে খানিকটা মধুসূদনের মুখের পানে, খানিকটা রসিকলালের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহারপর রসিকলালকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এখন আমার একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে।"

কথাবার্তার এরকম আকস্মিক পরিবর্তনে, রসিকলালের মনটাও যেন হঠাৎ চড়াসুরে বাঁধিয়া দিয়াছে, ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন—"সে কি, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, অনুরোধ করবেন!"

ভগবতীচরণ বলিলেন—"তাতে দোষ নেই, সম্বন্ধটা একবার দাঁড়িয়ে গেলে তো হুকুমই করবো—যেমন মধুকে করি।....মিলিয়ে দেখলাম, এদের যেমন রাশিচক্র তাতে গ্রহ-সংস্থানে সামনের এই আট তারিখের

দিনটাই প্রশস্ত। বড় সুন্দর যোগাযোগ, আমার আর একটুও খুঁৎ রাখবার ইচ্ছে নেই। তাই বলছিলাম যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে তো আপনি ছেলেকে আজই আশীর্বাদ করে যান—দু'টো থেকে চারটের মধ্যে একটি লগ্ন আছে ভালো।"

একটু থামিয়া রসিকলালের মুখের পানে চহিয়া বলিলেন—"তার মানে পরশু একদিনেই মেয়ে আশীর্বাদ, গায়ে হলুদ, বিবাহ,—তাও দুপুর থেকে নিয়ে রাত্রি একটার মধ্যে।"

এতবড় একটা কাজ একটিবার মাত্র আসিয়া একেবারে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন—রসিকলালের জীবনে ইতিপূর্বে কখনও এমন ঘটে নাই; বাড়ি গিয়া জাঁক করিয়া বলিবার কথা। এতটা উত্তেজিত হইয়া গিয়াছেন ভিতরে ভিতরে যে বন্দোবস্তটার মধ্যে যে কতটা অসঙ্গতি-অসুবিধা আছে একবার ভাবিয়া দেখিতে পারিলেন না। আগ্রহ সহকারে বলিলেন—"এতো অতি উত্তম প্রস্তাব। যোগাযোগ ভালো থাকে একদিনেই সব সেরে নিতে হবে।"

ভগবতীচরণ বলিলেন—"অসুবিধে হবে বেশ একটু, তবে কি জানেন?—আমরা হ'লাম ঋষির বংশধর মশাই, কাজের মধ্যে লগ্ন আর মন্ত্রটা ঠিক থাকলেই হ'ল, আড়ম্বর যতটা হ'ল, হ'ল;—যা হ'য়ে উঠলো না, তার জন্যে আপশোষ কিসের?"

৪

কয়েক বৎসর পূর্বেকার কথা, এক সময়ে নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই গিরিবালার মন খেলাঘরের পুতুলের-সংসার থেকে গুটাইয়া আসিল। সে কিন্তু নির্ঝঞ্ঝাটে হইতে পারিল না, দেখিল দুইটি শিশু তাহার জন্য

যেন অপেক্ষা করিয়াই বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, বাপ আর জেঠামশাই।
···মা ছোট ভাইটির কল্যাণে 'মঙ্গলবার' ব্রত করেন—অর্ধোপবাস, মুখটি বাৎসল্যের বেদনায় যেন শুকাইয়া থাকে সমস্ত দিন। মনে হয় মা যেন আরও বেশি করিয়া মা হইয়া ওঠেন।····গিরিবালা একদিন জেঠাইমাকে একান্তে পাইয়া কোলে মুখ গুঁজিয়া আবদারের সুরে বলিল—"আমিও মঙ্গলবার করব জেঠাইমা।" জেঠাইমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"সে কি রে, তুই কার জন্যে মঙ্গলবার করতে যাবি?" গিরিবালা আরও মাথাটা গুঁজিয়া বলিল—"জেঠামশাইয়ের জন্যে।" সবার হাসিতে অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল, জেঠামশাইয়ের আদরে অনেকক্ষণ পরে চুপ করিল।

অনেকদিন পূর্বেকার কথা! তাহারপর কবে এক সময় গিরিবালার অন্তরের মা'টি কুণ্ঠিত চরণে এ দুই আধার থেকেও সরিয়া আসিল। সেবা উদ্বেগ সবই রহিল, কিন্তু সেই জিনিসটি রহিল না যাহার জন্যে 'মঙ্গলবার' করিবার আগ্রহ জাগিতে পাবে। এই সময় একটি অসহায় বিড়ালশিশু কোথা থেকে আসিয়া জুটিয়া গিরিবালাকে আবার প্রায় পুতুলখেলার যুগে টানিয়া লইয়া গেল। বাবা জেঠামশাইয়ের মত সে স্পষ্ট 'মা' বলিয়া ডাকিয়া সঙ্কোচ জাগাইতে পারে না বটে, তবে নিজের দৈন্যে, অসহায়তায় গিরিবালার মধ্যেকার মাতৃত্বকে নানাভাবে উদ্‌বৃক্ত করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি আবার সে নিজেই পাঁচ ছয়টি শিশুর জননী।

গিরিবালা পা ছড়াইয়া রাঙিকে কোলে লইয়া আদর করিতেছে, তাহার সন্তানগুলির লাঙ্গুলের পতাকা উডাইয়া চারিদিকে লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় রসিকলাল—"গিরি কোথায় গো?"—বলিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কন্যার দিকে নজর পড়িতে হাসিয়া

বিড়াল-পরিবারকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, খেয়ে নে আদর যত পাবিস, আব কটা দিনই বা ? বৌদিদি কোথায রে গিরি ?"

অন্নদাচরণ নিজের ঘবে ছিলেন, ডাকিলেন—"রসিক এলে ?—একবার এদিকে এসো।"

বসিকলাল গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কার মুখে শুনলে ?"

বসিকলাল কিছু বুঝিতে না পাবিযা বিমঢভাবে মুখেব পানে চাহিয়া রহিলেন। অন্নদাচবণ বলিলেন—"ও। ঐ কথাটা বললে কিনা গিরিকে, আমি ভাবলাম বুঝি শুনেছ তাহলে।....ইয়ে, গিবির কথাবার্তা ঠিক করে ফেললাম, হরিপুবে ; পবশু দেখতে আসবে।"

সমস্ত ব্যাপাবটি নিম্নরূপ—

রসিকলাল প্রত্যূষে সাঁতরা যাত্রা করিলেন, বেলা প্রায় নয়টার সময় নিকুঞ্জলাল অন্নদাচবণকে ডাকিযা পাঠাইলেন। নিজে তিনি পূর্বদিন সন্ধ্যার পর হরিপুব হইতে ফিবিয়াছেন।

দৃশ্য প্রায় পূর্ববৎই, বাঁ হাতে হুকা লইয়া তামাক খাইতেছেন, পাশে মকদ্দমাব কতকগুলি নথিপত্র জড়ো করা ; আপাতত সামনে বেশ দীর্ঘ একটি কোষ্ঠীর উপব ঝুঁকিয়া তদ্গতচিত্তে কি অনুধাবন করিতেছেন। অন্নদাচরণ আসিতে একটু চোখ তুলিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলে—"ব'স।"

আবার সেইভাবেই ঝুঁকিয়া বহিলেন।

একটু পরে সোজা হইয়া বসিয়া আত্মগতভাবেই বলিলেন—"বাবাঃ, রাজারাজড়ার কুষ্ঠিই হোল পঞ্চাশ হাত।"

অন্নদাচরণের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা দোষই

বা দিই কেমন করে ?—কলসি দিয়ে তো আর সমুদ্র মাপা যায় না।....
কৈ দাও।”

—ডান হাতটা বাড়াইয়া দিলেন।

অন্নদাচরণ একটু বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন করিলেন—“কি দাদা ?”

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—“কুষ্ঠিটা সঙ্গে আনতে বলে পাঠালাম যে ; নন্তীটা বুঝি ভুলে গেল বলতে ? ওটা ঐ রকম।”

অন্নদাচরণ আগ্রহভরে প্রশ্ন করিলেন—“পারলেন ঠিক করতে কোনখানে দাদা ?”

নিকুঞ্জলাল গম্ভীরভাবে বলিলেন—“যে-কোনখানে ঠিক করলেই যদি নিকুঞ্জলালের মনস্তুষ্টি হোত তো এতদিন কবে হয়ে যেত অন্নদা, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, নন্তীর চেয়ে গিরিকে বরং বেশি করেই দেখেছি ; কখনও কম করে দেখি নি। আর যতদিন নিজের মনে সামান্যও খুঁৎখুঁতুনি ছিল, তোমায় বরাবর জিগ্যেস করে গেছি—‘ওহে অন্নদা পাত্রটি এই রকম, দেখো যদি পছন্দ হয় ;—কিন্তু কৈ, এবারে তোমায় তো জিগ্যেস করতেও গেলাম না....”

অন্নদাচরণ নিকুঞ্জলাল দ্বারা এদিকে বরাবরই উপকৃত হইয়া আসিয়াছেন, সামনে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহাও নিকুঞ্জলালেরই হাতে, একটু লজ্জিতভাবে কতকটা খোসামোদের ভাষাতেই বলিলেন—“সে কি কথা দাদা, আপনি থাকতে আমরা কে ?—জিগ্যেস করছেন সে ছোট ভাইয়ের পরামর্শ নেওয়া হিসাবে ; আমি রসিককে জিগ্যেস করি না ? তাই বলে সব পরামর্শই নিতে হবে এমন কোন কথা আছে ?”

নিকুঞ্জলাল হুঁকায় মুখ বসাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন —“তুলনাটা খুব সঙ্গত হ’ল না ;—তোমার রসিকের সঙ্গে পরামর্শ করা আর আমার তোমার সঙ্গে পরামর্শ করায় অনেক তফাৎ,—তুমি হ’লে

একজন....যাক্, জিগ্যেস করি নি, আর করতে গেলে হাতছাড়াও হয়ে যেত, তোমায় একটা আভাস দিয়েছিলাম এর পূর্বে।"

আবার হুঁকায় মুখ দিয়া আড়চোখে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অন্নদাচরণ বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকায় একটু স্পষ্টভাবেই হাসিয়া বলিলেন—"ঐ দেখো, ভোলানাথ ভাই আমার ভুলে বসে আছেন;—কেন, সেবারে হরিপুরের রাজাব প্রসঙ্গে বললাম না—আরও একটা বড মতলব ঠাউরে আছি?"

অন্নদাচরণের হঠাৎ দাকণ ঔৎসুক্যে কিছু ভাবিবাব শক্তি পর্যন্ত যেন নষ্ট হইয়া গেছে, নিকুঞ্জলাল বিজয়ের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"এবারে মতলব হাঁসিল কবে এসেছি। রাজি।"

"কে?....কার সম্বন্ধে দাদা?"

অন্নদাচরণের প্রশ্ন করিতেও স্বরটা কাঁপিয়া গেল।

নিকুঞ্জলাল অবিচলিত কণ্ঠেই বলিলেন—"শোন কথা অন্নদার! খোদ পরেশ ছাড়া আর কার সম্বন্ধে মাথাব্যাথা আমার?....বছরখানেক হোল রাণী মারা গেলেন...."

অন্নদাচরণ বাকরুদ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, দৃষ্টিও যেন ভাবলেশহীন।

নিকুঞ্জলাল ভান করিয়াই হোক আর প্রকৃতই হোক একটু আতঙ্কের সহিত প্রশ্ন করিলেন—"ভুল করলাম নাকি অন্নদা? আমি তো মনে করলাম ভালো একটা...."

অন্নদাচরণ সেইভাবেই বলিলেন—"না,....ভুল....মানে, কথাটা কখনও ভেবে দেখি নি দাদা।"

প্রৌঢ় চল্লিশ বৎসরের....হয়তো আরও ঢের বেশি....বিপত্নীক—হয়তো বহু পত্নীকই—কে জানে অত ভিতরের কথা?....এ দিকে রাজা! ....হরিপুরের রাজবাড়ী!....

অন্নদাচরণের চিন্তাটা কোন একটা জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না....অত্যন্ত আকস্মিক, কখনও যদি কল্পনার মধ্যেও আনিতেন তো যা হোক একটা মতামত লইয়া যৎসামান্যও প্রস্তুত থাকিতেন।....বলিলেন—"একটু ভেবে দেখি দাদা।"

নিকুঞ্জলাল গম্ভীরভাবে, বেশ ক্ষুণ্ণ হইয়াই বলিলেন—"বেশ দেখো।"

কিন্তু পাকা খেলোয়াড় লোক, এ সমস্তই তাঁহার পূর্ব হইতে গণনা করিয়া রাখা। বেশি এবং নিরুপদ্রবে ভাবিয়া দেখিতে অবসর দিবার পাত্র নন তিনি। অল্প একটু বিরতি দিয়াই বলিলেন—"কিন্তু সেখানে যে রাজ্যে তার সমারোহ পড়ে গেছে—বড্ড ভুল করলাম তো।"

অন্নদাচরণের মনে ঝঞ্চা উঠিয়া মনটাকে তোলপাড় করিয়া দিতেছে ; যদিও বাহিরে তাহার মাত্র এইটুকুই প্রকাশ যে দৃষ্টিটা কোনখানেই নিবদ্ধ করিতে পারিতেছেন না।...রাজ্যে সমারোহ।—রাজ্যে সমারোহ! —রাজ্যে!—কথাটার মানে যেন একপ্রকার ধরিতে পারিতেছেন—ঝঞ্চার মধ্যে ক্ষণিক বিদ্যুজ্জ্বলকে।...তাঁদের গিরিবালা—এখন পর্যন্ত গায়ে একখানি ভালো গহনা ওঠে নাই। যে দিন কানের ওই হালকা দুল জোড়াটি পরিল—কী খুশী!—জেঠামশাই যেন সর্বাঙ্গ সোনা দিয়া মুড়িয়া দিয়াছে।...একখানা ভালো কাপড়ই কি দিতে পারিয়াছেন? স্মৃতি মথিত করিয়া হঠাৎ একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল অন্নদাচরণের মনে,—এই এইবারেই সিংহবাহিনী পূজার সময় ;—নন্তীতে আর গিরিবালাতে একসঙ্গে সিংহবাহিনী তলা থেকে ফিরিতেছে ;—দুই-সখী, কত অন্তরঙ্গ, কিন্তু কত তফাৎ সাজসজ্জায়!....গিরিবালা নন্তীর কাপড়ের আঁচলটা তুলিয়া ধরিয়া কি বলিতে বলিতে আসিতেছে—দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু যেন মনে হয় মুখে একটু লজ্জা, একটু মেয়েমানুষের লোভ...

দুপুর বেলা মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"নন্তীর কাপড়টার দাম সতেরো টাকা !···বাবাঃ, সতেরো টাকা দাম !"

খানিকক্ষণ পরে হাত বুলাইতে বুলাইতেই বলিল—জামাটা কিন্তু চার টাকাতেই হয়েছে···জেঠামশাই, ঘুমুলে ?"

অন্নদাচরণ আর বলিতে পারিলেন না—জাগিয়া আছেন।

নিকুঞ্জলালের হুঁকার একটানা আওয়াজ হইতেছে, মাঝে মাঝে এক একটা টান দীর্ঘতর। সময় যেন আপন মনে নির্বিকারভাবে বহিয়া চলিয়াছে—কে নিজের কাজ গুছাইতে পারিল, কে পারিল না—এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নাই।

অন্নদাচরণের চিন্তাটা একটু যেন দানা বাঁধিতেছে, তবে ঐদিক ঘেষিয়া,—কবে গিরি বঞ্চিত হইয়াছে, অভাবের সংসারে কবে মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে—এই সব। ওরই সূত্র ধরিয়া একটা বিশেষ দিকে চলিল,—দ্বিতীয় পক্ষের কথাটা তো তিনি এর পূর্বে ভাবিয়া দেখিয়াছেন, হ্যাঁ, এবার মনে পড়িতেছে;—ভাবিয়া দেখিয়াছেন ও-সম্ভাবনার কথাটা—মনে পড়িতেছে ভাবিয়া এই সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছিলেন যে স্ত্রী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, আর, একটিকে হারাইয়া দ্বিতীয় পক্ষের পাত্ররা একটু বিবেচনাপ্রবণ, একটু মমতাপ্রবণ হয়—কন্যা একেবারে গৃহিণী হইয়া প্রবেশ করে বলিয়া, বিশেষ করিয়া যদি এক আধটা সন্তান থাকে তো একেবারেই জননী হইয়া প্রবেশ করে বলিয়া সোজাসুজি খানিকটা প্রতিপত্তি, খানিকটা মর্যাদার মধ্যে গিয়া দাঁড়ায়। মন্দ কি ?····তারপর এই রাজত্ব,—পুরাদস্তুর রাজত্ব না-ই হোক, একটা জমিদারি তো বটেই····

নিকুঞ্জলাল হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া বলিলেন—"পরেশ আমার সঙ্গেই এক জন গোমস্তা পাঠিয়ে দিয়েছে, কুষ্ঠি-ঠিকুজি মিলিয়ে কি

ফলাফল হোল বলে পাঠাবার জন্যে। অবশ্য মেলানো আমার বহু পূর্বেই হয়ে গেছে, নইলে এগুতাম না—গিরিবালার কুষ্ঠি আমার মুখস্থ ···দেখো ভেবে, নয় শুধু এটা ফেরৎ দিয়ে দিই।"

হুঁকার শব্দ আবার আরম্ভ হইল।

স্বপ্নশ্রুত কথার মতো নিকুঞ্জলালের কথাগুলা কানে কি একটা মোহ বিস্তার করিতেছে। 'গোমস্তা!'—জমিদারির সঙ্গে আর কোন নাম বোধ হয় এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়ানো নয়—অর্থে, প্রতিপত্তিতে জমজমে একটা গোটা জমিদারির রূপ যেন সামনে দাঁড় করাইয়া দেয়। অন্নদা-চরণ অনুভব করিতেছেন—লোকটাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা মনে বলবতী হইয়া উঠিতেছে,—তিনি মাত্র একবার হ্যাঁ বলিলেই যে-গোমস্তা গিরিবালার সামনে মাথা নত করিয়া দাঁড়ায়।

অন্নদাচরণের মনের ঝড় শান্ত হইয়া আসিতেছে। নিকুঞ্জলালের হুঁকার টান নিশ্চিন্ত আর মন্থর হইয়া আসিয়াছে,—মাছ ক্লান্ত হইয়া আসিলে ছিপের ঘুর্ণির পাকটা যেমন শ্লথ, নিশ্চিন্ত আর মন্থর হইয়া আসে। তবু পাকা খেলোয়াড়—ডাঙায় না ভিড়াইয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইবার লোক নয়; বলিলেন—"না; অমত হয় তাও ব'লে দাও, মনসাতলার রাজবাড়ির একটি মেয়ে নিয়ে এখন কথা চলছে—চুলটা একটু কটা বলে মনে খুঁৎ ধরিয়ে আটকে রেখেছি, সেইটেই ঠিক করুক। গোমস্তা চলে যাক এখুনি। না, মনে একটা খুঁৎখুতুনি রেখে তোমায় আমিও মত দিতে বলব না। আমি একটু খাটো হলাম পরেশের কাছে—বেশ একটু, তা····"

অন্নদাচরণ এতক্ষণে কথা কহিলেন, বলিলেন—"একবার বাড়িতে বলে দেখি দাদা, মানে···"

নিকুঞ্জলাল মুখ থেকে হুঁকাটা বেশ খানিকটা সরাইয়া লইলেন, স্বরটা

বেশ রুক্ষ করিয়াই বলিলেন—"এবার আমায় রাগতে হ'ল অন্নদা। তুমি আমায় দাঁড়িয়ে অপমান করাতে বসেছ, করাও, লোকের উপকার করবার প্রবৃত্তিটা আমার এইখানেই শেষ হোক, কিন্তু এর মধ্যে মেয়েছেলে ডেকে এনে আমার অপমানটা বাড়িও না। আমি জানি তোমার ভাইঝি, তোমায় জোর আছে। তুমি হ্যাঁ, না—যা বলবে সেইটেই শেষ কথা; সেই ভরসাতেই আমি এ বোঝা ঘাড়ে করেছিলাম। তোমার নিজের মতিস্থির না থাকে, স্পষ্ট বলে দাও, বুঝব...."

অন্নদাচরণ মিনতির কণ্ঠে বলিলেন—"দাদা, আপনি রাগ করলেন; আমার সত্যি মতিস্থির নেই; আমায় জিগ্যেস করাই আপনার ভুল হয়েছিল। আপনি নিজের মতেই কাজ করুন।"

অনেকক্ষণ একেবারে চুপচাপ গেল। নন্তা আদেশ অনুযায়ী আর এক ছিলিম তামাক দিয়া গেল, নিকুঞ্জলাল কখনও দ্রুত, কখনও মৃদু লয়ে টানিয়া যাইতে লাগিলেন, অন্নদাচরণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। এত পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন যে পাছে স্ত্রীর পরামর্শ লইতেছেন বলিয়া নিকুঞ্জলালের সন্দেহ হয়, নিজে না গিয়া নন্তাকেই কুষ্ঠিটা আনিতে পাঠাইয়া দিলেন।

নন্তা চলিয়া গেলে নিকুঞ্জলাল একবার উঠিয়া বাড়ির ভিতর গেলেন। মুখটা একটু ভার-ভার রহিয়াছে। ভিতর থেকে যখন ফিরিলেন, হাতে একটি ছোট বাণ্ডিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"গোড়াতেই মনটা খিঁচড়ে দিলে ভাই, সব কথা আনন্দ করে বলবারই অবসর পেলাম না। তোমাদের জন্যেই করে মরি, আমার আর কি স্বার্থ বলো? এই ধরো, একশ' টাকার ক'রে পাঁচখানা নোট আছে। হাত গুটিও না, ধরো, এর মধ্যে এতটুকু অপমানের কিছু নেই। আমি তোমায় জানি না—

যে অপমানের টাকা হাতে তুলে দোব? আর তোমার সে-টাকায় অপমান সে-টাকায় কি আমারই মান বাড়বে? আড়াইটি হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল, স্পষ্ট বললাম—"তুমি তাকে চেন না পরেশ, তোমার একটি পয়সায় সে হাত দেবে না। সে হলদে রঙে কাপড় ছুবিয়ে, নো-শাঁখা দিয়ে মেয়েকে বিদেয় করবে। এর অতিরিক্ত তার ক্ষমতাও নেই, সে করবেও না, বড় খাড়া লোক।' তখন হার মেনে বললে—'বেশ, একটা রফা করুন, লোক খাওয়ান,—এই সবে তাঁর সাধ্যমত তিনি খরচ করবেন, কিন্তু আমার একটা মর্যাদা আছে তো?—বরযাত্রী সেই রকম নিয়ে যেতে হবে—আমার মর্যাদা রক্ষার জন্যে গ্রামেও তাঁকে সেই ভাবে নেমন্তন্ন করতে হবে, তা ভিন্ন আশীর্বাদের একটা বড় হাঙ্গাম আছে—এ-সবের জন্যে যে অতিরিক্ত খরচটা, সেটা তিনি ঘাড়ে করতে যাবেন কেন?'....অনেক তর্ক, পাকা লোক, একেবারে পরাস্ত কবতে পারি কখনও?—শেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এই কটা টাকায় এনে ঠেকাতে পারলাম। নাও, সে তো ভুলও বলে নি কিছু—সত্যি তার মর্যাদাটুকুও রক্ষা হওয়া চাই, আর তার জন্যে তুমিই বা দণ্ড সইবে কেন?"

নন্তী ফিরিয়া আসিল, বলিল—"আসল কুষ্ঠিটা পাওয়া যাচ্ছে না। বড় কাকী বললেন—বোধ হয় সিমুরে পড়ে আছে। এই একটা ছিল, দিলেন।"

রাশি-চক্রটার নকল, নিকুঞ্জলাল হাতে লইয়া বলিলেন—"দেখি, এইটেতেই এখন কাজ চলবে—তুমি ওটা আনিয়ে রেখ সিমুর থেকে। আর, ও কিছু দেখতে হবে না, গিরির কুষ্ঠি-ঠিকুজি আমার কণ্ঠস্থ, আমি গণনা ঠিক করে তবে কথা পেড়েছি। তবুও আপাতত এই দুটোই পাঠিয়ে দিই, যেখান থেকে পারুক সন্দেহ মিটিয়ে নিক।"

কয়েকবার হুঁকা টানিয়া যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে এইভাবে বলিলেন—"হ্যাঁ, ঠিক কথা, পরশু আশীবাদ করতে আসছে সব। এটা আমি নিজেই জোর করে করালাম, একটা পাকা কথা তো হয়ে থাক,—রাজারাজড়ার মন, বিশ্বাস কি ?"

৫

দাদাব মুখে সংবাদটা শুনিয়া বসিকলাল শূন্য দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া বহিলেন, একটু পবে প্রশ্ন কবিলেন—"পবশু আশীর্বাদ করতে আসবে,—পরশুই ?"

অন্নদাচরণ কিছু বিস্মিত হইলেন না ; আর সব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ছাড়িয়া আশীর্বাদের সময়ের কথাটাই যে বড হইবে ভাইয়ের কাছে ইহাতে একটু হাসি পাইলেও আশ্চর্য হইবাব কিছু নাই। বলিলেন—"বস' রসিক ঐখানটায়। বুঝেছি আশীর্বাদটা একটু তাডাহুড়োর মধ্যে হচ্ছে, কিন্তু যাতে সেটা সামলে যায়, তার ব্যবস্থা হয়েছে। সব ভেবেটেবে দেখলাম রসিক, সামান্য একটু দোজপক্ষের আর একটু বয়েস হয়েছে বলে এমন সুবিধেটা পায়ে ঠেলা যুক্তিযুক্ত নয়। একটি বছর-সাতেকের ছেলে আর একটি বছর-তিনেকের মেয়ে, প্রথম পক্ষের এই আছে। কী আর এমন বলো ? মেলা নয়, তবে এক-আধটা ছেলেপিলে থাকাই ভালো ব'লে যেন আমার মনে হয়—একেবারে মা হয়ে ঢুকলে কদর বাড়ে খানিকটা। বয়েস—তা হয়েছে, তবে যতটা বয়েস তার চেয়ে একটু বেশি বড়ই দেখায়। ভেবে দেখলাম নিকুঞ্জদাদা যা বললে, সেটা নিতান্ত অগ্রাহ্যির কথা নয়,—ভোগে আছে, শরীরের বাড়বাড়ন্ত আছে,

বয়সের তুলনায় একটু বড় দেখতে হবেই। নিকুঞ্জদাদা নিজেকে দেখিয়েই বললে—'দেখো না, নিত্যি পেটের অসুখ, তার ওপর আবার সেই পেটের চিন্তাতেই দুনিয়া ঘুরে বেড়ানো ; চিকিৎসা নেই, শরীরের একটু তোয়াজ নেই—চুয়াল্লিশ বছরের মানুষটা চব্বিশ বছরের ছোকরা হয়ে রয়েছি।'....তা দেখলাম মিছে বলেন নি নিকুঞ্জদাদা, আমরা কি পাই বাড়তে যে বড দেখাবে?....তারপর দেখো বাড়িটা একেবারে ছিমছাম ; একটি বুড়ো বোন আছে, তীর্থে তীর্থেই ঘুরে বেড়ায়...."

রসিকলালের মনে হইতেছে বহুদূর হইতে যেন একটু গুনগুনানি ভাসিয়া আসিতেছে—মাঝে মাঝে এক একটা কথা তাহার হইয়া উঠিতেছে স্পষ্ট—'সামান্য একটু দোজপক্ষের....বয়েস—তা হয়েছে.... পেটের চিন্তাতেই....বুড়ো বোন....'

—এলোমেলো, কোন একটা মানে ধরা যায় না, মানে ধরিবার উৎসাহও নাই মনের যেন।

অন্নদাচরণ বলিয়া যাইতেছেন—"তবু মন খুঁৎখুঁৎ যে একটু না করে এমন নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার অন্য দিকটাও দেখতে হবে তো?—অবশ্য ঐ যে রাজা রাজা হাঁক পড়ে গেছে ওটা কিছু নয়। ও কথাটা তোমার কাছে এ-যাবৎ ভাঙিনি, আজ ভাঙছি। রাজা—নিজের জমিদারিতে সবাই রাজা, সেই হিসেবে। আমিও ঐ কথাটাই ধরেছিলাম —দেখছি একটা লোক অযাচিত ভাবে অনুগ্রহ করে যাচ্ছে, তাকে ছোট করতে যাই কেন? আর, আগে যাই করুক, এখন নিজের জেনেই এতটা করছে, নিকুঞ্জদাদাকেই বা আমার খেলো করবার কি দরকার? রক্তের সম্বন্ধ না হোক, পুরুষানুক্রমে একটা সখ্যও তো রয়েছে ওঁদের সঙ্গে? উনি যদি গেয়ে বেড়ান উনি রাজগুরু তো পারতপক্ষে জোগান্ দেওয়াও দরকার আমাদের নয় কি? বিষয়ী লোককে আবার সব দিক

বজায় রেখে চলতে হবে তো?....কিন্তু ভেতরকার কথা তা নয়। এবার গিয়ে আমি কতক কতক খবর নিয়ে এলাম তো? ভাগাভাগি হয়ে এখন পরেশের ভাগে হাজার পনের দাঁড়ায়; লাটের দেন, খরচ খরচা বাদ দিয়ে সাত আট হাজার টাকা বাঁচে বছরে। এই; কিন্তু এও কি সোজা হল?....বংশটা বনেদি—এক সময় বোধ হয় কেউ ছিল রাজা, তাই সব সরিকেই রাজা....”

একটা উত্তর পাইবার জন্য থামিলেন। না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বল তুমি?”

রসিকলাল শূন্য দৃষ্টিতেই উত্তর করিলেন—“অ্যাঁ”

অন্নদাচরণ ভাইয়ের মুখের পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“বলছিলাম, যতটা খবর পেলাম খরচ খরচা বাদ দিয়ে বছরে নিট্ হাজার সাত আট বাঁচে,—সেও তো কম হল না?”

রসিকলাল বলিলেন—“না, কম কি করে?....বলছিলাম আশীর্বাদটা কিছুদিন পেছিয়ে দিলে হোত না?”

অন্নদাচরণ বুঝিলেন এতদূর তাতিয়া পুড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভাইয়ের কাছে এতবড় গুরুতর কথাটা পাড়া ঠিক হয় নাই, একে চঞ্চল মনই। হাতে যা টাকা রহিয়াছে তাহাতে একটা পাকা দেখা মেটানোর পক্ষে দুইটা ঘণ্টাই যথেষ্ট, কিন্তু সে কথা আর তুলিলেন না। বলিলেন —“সে তোমায় ভাবতে হবে না, তবে কালকের দিনটা আর বেরিয়ে কাজ নেই; দরকারও আছে, পরামর্শও আছে। এখন তুমি হাত পা ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হও গে। হ’ল, যা করতে গিয়েছিলে?”

“হ্যাঁ, হয়েছে।”—শুষ্ককণ্ঠে কোন রকমে জবাবটা দিয়া রসিকলাল চলিয়া গেলেন।

ভয়ে তাঁহার হাতপা কাঁপিতেছে। সন্ধ্যা হইয়া গেছে, বিড়াল

ছাড়িয়া গিরিবালা বিছানা গুছাইতে আরম্ভ করিয়াছে। রসিকলাল ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৌদি' কোথায় রে গিরি ?—ও কোথায় ?"

হরিচরণ একটা পড়ার বই লইতে ভিতরে আসিয়াছিল, বলিল—"তাঁরা দুজনেই নিকুঞ্জজেঠার বাড়ি গেছেন বাবা, ডেকে আনব ?"

"ডেকে আনবি ?....আচ্ছা যা....শীগগির একছিলিম তামাক সেজে আন তো মা গিরি।"

বিছানার চাদরটা ফেলিয়া দুইটা হাত পিছনে দিয়া বিছানার উপরই বসিয়া পড়িলেন।

গিরিবালা একটু আড়চোখে বিস্মিতভাবে চাহিল, তাহারপর কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে যাইবে, রসিকলাল হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"কি করি এখন বল দিকিন গিরি ?"

সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"থাক্ তামাক, এক্ষুনি আসছি আমি। বৌদিকে তোর কিছু বলে কাজ নেই।"

দাদা আওয়াজটা যাহাতে না টের পান এই ভাবে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে যাইতেছেন, তাঁহার কথা যে এতক্ষণ কেন মনে পড়ে নাই। কবিতার মিল নির্ণয় থেকে সংসারের খুঁটিনাটি পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে।...আর তিনিই না বলিয়াছিলেন যে সঙ্কট আসিবেই ; দময়ন্তীর বিবাহেও আসিয়াছিল, কিন্তু কাটিয়া যাইবে ?....সত্যই তো বিবাহ যেথায় হইবার পাকা হইয়া, হইয়া গেছে, ওদিক দিয়া আর ভয় কি ?....এখন এই সময়টুকু কাটাইয়া উঠিতে পারিলেই হয়, পণ্ডিতমশাই আছেন।....মনটা অনেক শান্ত হইল।

পথে মনে পড়িয়া গেল পণ্ডিতমশাইয়ের তো আজই দশটার গাড়িতে

কৃষ্ণনগরে যাইবার কথা ছিল। তবুও অগ্রসর হইলেন, যদি কোন কারণে আটকাইয়া গিয়া থাকেন—নিতান্ত যদি কোন কারণে। আসিবার সময় ঘুরিয়া চিনিবাসের দোকান হইয়া আসিলেন, নহিলে তো দেখাই করিয়া আসিতেন পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে।

পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রীর সহিত দেখা হইল। কণ্ঠস্বরকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আজ সকালের গাড়িতে চলে গেছেন পণ্ডিতমশাই মা ?"

"কৈ, আর যেতে পারলেন বাবা ?"

বিশ্বের যত আশা একটি মুহূর্তের মধ্যে যেন আসিয়া জড়ো হইয়াছে। প্রশ্ন করিতে সাহস হইতেছে না ; পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী একটু বিরতি দিয়াই অনুযোগের কণ্ঠে টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিলেন...."সকালের গাড়িতে আর কৈ যেতে পারলেন ? একজন শিষ্যি এসে পড়ল। এই বিকেলের একটু আগে বেরুলেন, সমস্ত রাত যারপরনেই নিগ্রহ—নৈলে নাকি সময়ে পৌছন...ওকি, তোমার শরীরটা খারাপ নাকি রসিক ?"

রসিকলাল, অবসন্নভাবে শানের একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়াছেন, বলিলেন—"না মা, অনেকটা হেঁটে এলাম কিনা, এক গ্লাস জল দিন তো।"

একটু মিষ্টি সংগ্রহ করিয়া জল আনিতে একটু বিলম্ব হইল, পণ্ডিত-মশাইয়ের স্ত্রী আসিয়া দেখিলেন রসিকলাল চলিয়া গেছেন।

রসিকলালের নিকুঞ্জদাদার কথা মনে পড়িয়া গেছে। এমনি লোকটাকে এড়াইয়া চলেন, বিশেষ যে কোন কারণ আছে তা নয়, শুধু খুব বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গ কেমন অস্বস্তিকর বলিয়া মনে হয়। দেখা হইলে নিকুঞ্জলাল ভালো উপদেশই দেন। সেইজন্য আরও ভয় হয়। কিন্তু মনে পড়িল এ সমস্যায় আপাততঃ নিকুঞ্জলালই একমাত্র লোক যে

বাঁচাইতে পারে। অবশ্য বাঁচানো মানে আশীর্বাদটা পিছাইয়া দেওয়া। আর আশীর্বাদটা কাল একজন লোক পাঠাইয়া পিছাইয়া দিলেই ত' বিপদটা কাটিয়া যায়, কেননা পরশু সাঁতরা থেকে ওঁরা আসিলেই—রসিকলাল সামনে থাকিতে পারুন বা নাই পারুন ওখানকার আশীর্বাদের কথা, আরও সব কথা, আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। অবশ্য যে কোন অবস্থাতেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তবে হরিপুরের লোকেরা আসিয়া পড়িলে যে দৃশ্যটা দাঁড়াইবে তাহা কল্পনা করিতেও রসিকলালের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

নিকুঞ্জলাল স্থায়ী পেটের দুর্বলতার জন্য সকাল সকাল আহার করিয়া শয়ন করেন, বিলম্ব হইয়া যাইতে পারে বলিয়া রসিকলাল আর অপেক্ষা করিলেন না।

নিকুঞ্জলাল বাহিরেই ছিলেন, এবং একলাই ছিলেন। খুব আদর করিয়া বসাইলেন, বাছা বাছা উপদেশ দিলেন—সংসারটা কি, এখানে কবিতারই বা কি মূল্য, টাকারই বা কি মূল্য, এইবার একটু সুবিধা ভগবান করিয়া দিলেন—নিকুঞ্জলাল তো নিমিত্তমাত্র—একটা বড সহায় হইল, এইবার নিজের কাজ গুছাইয়া লওয়া। একটি ভাইঝি তো বিবাহের উপযোগী হইয়া উঠিল—মামার বাডি থাকে বলিয়া মামারা তো সব ভার উঠাইয়া লইবে না, তা ভিন্ন আবার কন্যা হইবে, তাহাদেরও বিবাহ দিতে হইবে, ভগবান তো রোজই সুবিধা করিয়া দিতেছেন না—পুরুষকারও চাই—ভগবান গীতায় কত জায়গায় সে কথা কতভাবে বলিয়া গিয়াছেন....

রসিকলাল মাথা নিচু করিয়া সব শুনিয়া গেলেন, শেষকালে প্রশ্ন করিলেন—"বলছিলাম আশীর্বাদটা কিছুদিন পেছিয়ে দেওয়া যায় না?"

হুঁকা নিকুঞ্জলালের হাতে ছিল, খুব দ্রুত বোল তুলিতে লাগিলেন,

শুরই মধ্যে কয়েকবার আড়চোখে রসিকলালের পানে চাহিয়া লইলেন, তাহারপর কহিলেন—"হয়, তবে তোমার দাদার পরামর্শে পরশুই ঠিক করেছি। অবশ্য তুমিই হচ্ছ মেয়ের বাপ, এখানে তোমার মতের সামনে দাদার মত কিছু না, তা বল তো না হয়...."

রসিকলাল বলিলেন—"না, তা'হলে থাক। দাদা যখন বলেছেন...."

চলিয়া গেলে নিকুঞ্জলাল দুয়ারের পানে মুখটা ঘুরাইয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন—"সাতগেঁয়েব কাছে মামদোবাজি। এখুনি হাঁড়ি আলাদা করিয়ে দিতে পারি জানেন না।"

রসিকলাল বাগান পারাইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। মনের অবস্থা একেবারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দাঁড়াইয়াছে। বেশ রাত হইয়া গেছে, কিন্তু বাড়ি ঢুকিতে সাহস হইতেছে না। যেভাবে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, গেলেই একটা জবাবদিহির মধ্যে পড়িয়া যাইতে হইবে। অথচ মনটা পরশুকার ব্যাপার লইয়া এমন ব্যাপৃত রহিয়াছে যে একটা জবাবদিহি গড়া হইয়া উঠিতেছে না। কেমন যেন একটা জিদও ধরিয়া গিয়াছে, একটা উপায় না করিয়া ফিরিবেন না—নহিলে পরশু যে সর্বনাশ।

একবার একটা কথা মনে পড়িয়া মনটা যেন উল্লসিত হইয়া উঠিল—একটা চিঠি পাঠাইয়া দিলে কেমন হয়?—নিকুঞ্জদাদা লিখিতেছেন.... লেখা চেনা?—না হয়, বড় ব্যস্ত, অন্যকে দিয়া লিখাইতেছেন—"হঠাৎ কোন কারণে আশীর্বাদটা কয়েকদিন বন্ধ রাখিতে হইল, পরে তারিখ জানাইতেছি...." চিঠির চেয়ে টেলিগ্রাম?—সেই ভালো—সঙ্গে সঙ্গে পঁহুছিবে, আর—আর হাতের লেখার হাঙ্গাম নাই!—ঠিক, একটা টেলিগ্রাম—"আশীর্বাদ স্থগিত রহিল, পত্রে সব জানাইতেছি।"—পরশু তো এই করিয়া কাটুক....

সঙ্গে সঙ্গেই মনটা অবসন্ন হইয়া পড়িল—না, চলিবে না ওসব—কোন মতেই চলিবে না—নিকুঞ্জদাদার কাজ—এ সামান্য সম্ভাবনার কথা আর আন্দাজ করে নাই সে ?....চলিবে না—চলিবে না—শুধু ধরা পড়িয়া একটা কেলেঙ্কারি....

ভাংচি ?—না, নিকুঞ্জদাদা জানে রসিক এ-সবই করিবে, আট ঘাট বাঁধা আছে।....যে দিকেই দৃষ্টি যায় নিকুঞ্জদাদা দাঁড়াইয়া—হুঁকা হাতে, মুখে ক্রুর হাসি....পদে পদেই ঠোক্কর খাইয়া রসিকলাল যেন ক্রমেই দিশাহারা হইয়া উঠিতেছেন।

নিশিতে পাওয়ার মতো পথ ঘুরিতে ঘুরিতে এক সময় হঠাৎ হারাণের কথা মনে পড়িয়া গেল।

রাত্রি বারোটার কম নয়, সমস্ত গ্রাম নিষুপ্ত, রসিকলাল হারাণের বাড়ির সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত দিনের মেহনতে, উদ্বেগে শরীর একেবারে অবসন্ন। দুইবার ডাকিতে গিয়া কথা বাহির হইল না, গলা একেবারে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে তৃতীয়বারে যখন শব্দটা বাহির হইল তখন নিজেই যেন চমকিয়া উঠিলেন। হারাণের ছেলে আর মা বাহির হইয়া আসিল। এত আশ্চর্য তাহারা জীবনে কখনও হয় নাই। প্রয়োজন শুনিয়া উত্তর করিল—হারাণে তো তাঁহাদের বাড়িই গেছে, সাতু আর নিকুঞ্জলালের ঝি আসিয়া ডাকিয়া লইয়া গেছে। রসিকলাল বলিলেন—"ও, তাহলে গেছে ? আমিই ডেকে পাঠিয়েছিলাম, ডেকে অন্য জায়গায় চলে গেছলাম।"

এ উপস্থিত-বুদ্ধিটুকু যে কোথা থেকে জোগাইল, নিজেই বিস্মিত হইয়া গেলেন, চিন্তা করিবার ক্ষমতা তখন আর একেবারেই নাই।

বোধ হয় খুব চরমে আসিলে বুদ্ধির এই রকম এক একটা ঝলক খেলিয়া যায়।

"বেশ, তোরা শুগে যা,"—বলিয়া ফিবিয়া একটু অগ্রসর হইয়াছেন, হাবাণের সঙ্গে দেখা।

হারাণ যেন ভূত দেখিয়াছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল, তাহারপর কথা কহিল—"ছোট বাবাঠাকুর। আমি সমস্ত গাঁ ঘুরে বেইরেছি, কোথায় ছেলে? বাড়িতে যে ভেবে সারা হচ্ছে সবাই।"

বসিকলালেব ভাবটা ঠিক উল্টা—হারাণকে দেখিয়াই অর্ধেক ভাবনা যেন চলিয়া গেছে, অনেকটা শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"সে হচ্ছে, আগে তোর সদর ঘরটা খোল দিকিন একটু; এক গেলাস জল, আব একটু তামাকের ব্যবস্থা কর। তোর মা ছেলে সব জেগে আছে, যেন টের না পায়।"

ঘরটা বেশ খানিকটা তফাতে; হারাণ খুলিয়া দিয়া কুলুঙ্গিতে একটা টেমি জ্বালিয়া দিল, ক্ষীণ আলোয় ঘরটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেই রসিকলাল একটা স্মিত হাস্যের সহিত চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়া লইলেন, বলিলেন—"ঠিক সেই রকম আছে দেখছি।"

হারাণ বলিল—এদানি পূবদিকে একটা জানালা ফোটালাম, আর সব সেই রকমই আছে।....দাঁড়াও বাবাঠাকুর, তোমার সেই মোড়াটা বের করে দিই।"

চৌকির নিচে হইতে একটা মোড়া বাহির করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সামনে পাতিয়া দিল। বলিল—"তোমার সেই মোড়াটা বাবাঠাকুর।.... শুধু জল খাবে?"

রসিকলাল মোড়াটার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিলেন, বলিলেন—"কি আছে?....আজ কতদিন পরে এলাম বল দিকিন এ ঘরে?"

হারাণ বলিল—"তা হল বৈকি, সেই কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে যাবার আগে এসতে, তারপরে এই।....তা আছে, আজ রামীর শ্বশুববাড়ি থেকে তত্ত্ব এয়েছেল, কিন্তু সে-সব মার ঘরে, জানাজানি হয়ে যাবে। আমার ঘরে বোধ হয় মুকুন্দ-মোয়া আছে, রামীর ছেলেটা রেত-বিরেতে বায়না ধরে কিনা, ওর দিদিমা জুগিয়ে রাখে।"

"তাই আন। গোল করিস নি কিন্তু।"

বহুদিন পূর্বের সেই স্কুল-জীবন, আর স্কুল-ছাড়া নিরুদ্বেগ জীবনের একটা দিন এই নিশুতি রাতে কেমন করিয়া আসিয়া গিয়াছে। —একেবারে হারাণের মাকে লুকাইয়া খাবাব সংগ্রহ করা পর্যন্ত। হারাণ তখন ছিল নিত্যসঙ্গী, প্রণয়-সুহৃদ্—বনবাদাড, সুদূব পল্লী ঘুরিয়া আসিয়া এই ঘরটা ছিল আশ্রয়।....কত কথা মনে পড়ে, এমন সব কথা যা আজিকার দিনের সমস্ত ঘটনা, এই নিদারুণ উদ্দেশ্য লইয়া মধ্যরাত্রের অভিযান—সব যেন হালকা করিয়া দিয়াছে! হারাণ তাহার অশ্বপাল, কিন্তু আজ দারুণ সমস্যায় পড়িয়া তিনি সেই নিত্যসঙ্গী সুহৃদ্ হারাণের কাছে আসিয়াছেন।....কেমন একটা ভরসা হইয়া গিয়াছে তাহাকে দেখিয়া পর্যন্ত—মনে হইতেছে একটা বিহিত হইবেই।....অদ্ভুত ধরণের একটা নিশ্চিন্ততার ভাব আসিয়া গেছে মনে। গোটাচারেক মোয়া খাইয়া বড় পেপেঁ-ঘটি থেকে ঢকঢক করিয়া একঘটি জল খাইলেন। হুঁকাটা হাতে লইয়া বলিলেন—"নে, এইবার বোস এই খানটায়, চ্যাঁচাতে পারব না তো। বড় যে পরামাণিকের মাথা বলে গুমোর করিস কথায় কথায়—একটা হদিস বাৎলা দিকিন, কেমন পারিস...."

সাঁতরা থেকে লইয়া হরিপুর পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার এক একটি করিয়া বলিয়া গেলেন হারাণের কাছে, মায় নিজের আশা, আশঙ্কা, টীকা-টিপ্পনী সমেত।

হারাঁণের মনে একটা অন্তঃশীলা বহিতেছিল,—বাবাঠাকুর এতদিন পরে তাহার বাড়িতে আসিয়াছে, একটু পায়ের ধূলা লইবার প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল—নিশ্চয় উচিতও লওয়া। কিন্তু আড়ম্বর করিয়া কিছু করার স্বভাব নয় বলিয়া কেমন একটা লজ্জা করিতেছিল, সবটা শুনিয়া একটা অছিলা পাইয়া পায়ে মাথা ঠেকাইয়া ধূলি লইয়া বলিল—"পায়ের ধুলো দেও বাবাঠাকুর, গিরিদিদিমণির তাহলে, অন্য জায়গায় ঠিক করে এলে ?....আজ সমস্ত দিনটা যে কিভাবে কেটেচে তা...."

রসিকলাল একটু রুক্ষভাবে বলিলেন—"এই দেখ, তু'বেটার তো ঐ দোষ ! আগে পরশুর দিনটা সামলাতে পারবি কিনা তাই বল, দেখছিস কি একটা বেতর সমস্যা মাথায় করে...."

হারাণও বেশ মৃদুভাবে জবাব দিল না, বলিল—"সমিস্তে সমিস্তে তোমার একটা বাই ; তা হক কথা বলব,—এগুনে য্যাখন ছড়া নিকতে, চিলের সঙ্গে ঢিল মিলবে কি কিল মিলবে ভেবে ভেবে সারাদিন এপাড়া ওপাড়া ছুটোছুটি করে বেডাতে।....তারা এসলে, তবে তো সমিস্তে ?.... নাও, বামুনকে বাড়িতে 'ওঠ' বলতে নেই, তবে বাড়িতে।তানারা সবাই যে কী করে কাটাচ্ছে !...."

সমস্যার কি সমাধান অবশ্য বলিল না, তবে অন্যান্য গল্প করিতে করিতে মনিবকে বাড়ি পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেল।

৬

কাজের বাড়ি ; মাত্র পাকা দেখা হইলেও অন্নদাচরণ বেশ ভালোভাবেই নিমন্ত্রণ করা স্থির করিয়াছেন, যাহাতে পয়সা বাঁচানো লইয়া নূতন কুটুমের কাছে একটা বদনাম না ওঠে। কিন্তু সমস্ত উৎসব

চাঞ্চল্যের মধ্যেও বাড়িটা যেন থমথমে হইয়া আছে। স্বামী কর্মঠ হইয়াও একরূপ অকর্মণ্য,—বরদাসুন্দরীকে সাধ্যমত মনের ভাব গোপন করিয়া চলিতে হয়। মুখে বেশ একটা হাসি ধরিয়া রাখিয়াছেন, প্রকৃতও হইতে পারে—গিরিবালার এতটা সুখ, এ তো কল্পনাতীতই তাঁহার পক্ষে; যদি কৃত্রিমই হয় হাসিটা তো এমন ভাবে ফুটাইয়া রাখিয়াছেন যে তাহার অন্তরালে যে কী আছে বোঝা অসম্ভব। অশ্রু লইয়াও একবার ধরা পড়িয়াছেন। দামিনী সর্বেসর্বা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার দাদারই কীর্তি তো? একবার কাজেই হ'ক, অকাজেই হ'ক, খোঁজ লইতে গিয়া দেখিলেন ভাঁড়ার ঘরের একটি কোণে একটা হাঁড়ির সরা উঠাইয়া লইয়া বরদাসুন্দরী আঁচলে অশ্রু মোচন করিতেছেন। দামিনী রাগিয়া উঠিলেন—"দেখো কাণ্ড! হ্যাঁলা ছোট বউ, সবে পাকা দেখা, তাও শেষ হয়নি এখনও, আর তুই কিনা মেয়ের জন্যে কাঁদতে বসলি?"

বরদাসুন্দরী আর একটু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের সহিতই বলিলেন—"না, মনটা কেমন একবার উথলে উঠল তাই....নৈলে বড়ঠাকুরের আশীর্বাদে আজ তো আমার হাসবারই দিন ঠাকুরঝি।"

বসন্তকুমারীর প্রকৃতিটাই অন্যরূপ, মনের ভাবও ভালো করিয়া চাপিতে জানেন না, রাখিয়া-ঢাকিয়া কথাও বলিতে পারেন না। যেদিন প্রথম অন্নদাচরণ প্রণামীর টাকা ঘরে আনেন সেই দিনই তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল;—এই একটি মানুষ, নিকুঞ্জলালের সম্বন্ধে যাঁহার মত কখনও পরিবর্তিত হয় নাই। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পাইতেছেন একটা ভীষণ চক্রান্ত চলিতেছে, শুধু যতটা দেখিতে পাইতেছেন তাহার চেয়েও সেটা কত ভীষণ সেটুকু বুঝিতে পারিতেছেন না। ব্যর্থ ক্ষোভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, একটু পাড়া বেড়াইয়া, একটু বা দেখাশুনা করিয়া;

মুখে একটা হাসি তাঁহারও আছে, কিন্তু সে হাসিকে হাসি বলিয়াই যে লোকে মানিয়া লইবে এমন তাঁহার উদ্দেশ্যও নয়, আশাও নয়।

একবাব পাঁচসাতজনের জমায়েতের মধ্যেই কে একজন বলিল—“যাহ’ক নিকুঞ্জদাদা একটা কাজের মতন কাজ করিলেন।”

বসন্তকুমারী পায়েসের জন্য কিসমিস বাছিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই কহিলেন—“তা আর একবার বলতে ?—কুঁড়ে ঘর থেকে টেনে নিয়ে রাজ-সিংহাসনে বসাতে চললেন। কাঙ্গালকে যে দিনই শাকের ক্ষেত দেখিয়েছিলেন সেই দিনই বুঝেছিলাম একটা বড় সৌভাগ্যি কপালে নাচছে।”

সবাই একটা না একটা কাজ লইয়া ছিল, নিম্ন দৃষ্টিতেও একটু মুখ চাওয়া-চাওয়া হইল, স্মিত হাস্যও কয়েকটা মুখে ফুটিল নানা অর্থে, কেননা নানা অর্থ করিবার লোক ছিল।

দামিনীও ছিলেন। হটিবার পাত্রী নহেন, একটা ছুতা করিয়া বসন্তকুমারী উঠিয়া গেলে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—“অনেক কিছুই দেখতে হ’ল !....কেন যে দাদার থাকা পরের কথায় !...তাও বলি,—গিরি যদি তোমার পেটেই জন্মাত, শাকের ক্ষেত তো লুকিয়ে রাখত না দাদা তোমাদের কাছ থেকেও।”

অন্নদাচরণ কাজের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছেন। জিনিসপত্র আনা, লোকজন জোগাড় করিয়া বাড়ি, উঠান পরিষ্কার করানো, ভিতরে আসিয়া একটু আধটু খোঁজ লওয়া, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেলে কোন জিনিসের ফরমাস দিয়া আসা; যখন কিছুই হাতে থাকিতেছে না, গিয়া নিকুঞ্জলালের কাছে বসিতেছেন,—পরামর্শ হইতেছে, শুধু কালকের কাজ লইয়া নয়, আসল কাজ লইয়া—তাহারই বা আর কটা দিন হাতে আছে ?

অন্নদাচরণ নিজেকে কোন মতেই খালি থাকিতে দিতেছেন না, খালি থাকিলে যে চিন্তাটা মনে উঁকি মারিতেছে তাহার সম্মুখীন হইতে পারিতেছেন না। কাহার সঙ্গে যেন বোঝাপড়া করিতে করিতে ওঁর কেমন এমনই একটা জিদ দাঁড়াইয়া গেছে—উনি গিরিবালার ভালো করিবেনই ; নানা বাধা, নানা দুর্বলতা আছে—সবকেই কাটাইয়া উঠিতে হইবে। বেশ বুঝিতেছেন, কাটাইয়া উঠিতেছেনও।

শুধু কাল কথাটা প্রকাশ হওয়ার পর থেকে গিরিবালার মুখের পানে ভালো করিয়া চাহিতে পারিতেছেন না।

বিকেল বেলা বসন্তকুমারী হরুকে দিয়া অন্নদাচরণকে নিকুঞ্জলালের বাড়ি হইতে ডাকিয়া আনাইলেন, প্রশ্ন করিলেন—"ভয়ঙ্কর ব্যস্ত আছ বলে এতক্ষণ জিগ্যেস করি নি, ঠাকুরপো যে সকাল থেকে বাড়ি নেই সেটা জানো ?"

কণ্ঠস্বর নিতান্ত শান্ত, শুধু দু'একটা কথায় একটু যেন ব্যঙ্গের ঝোঁক পড়িল। অন্নদাচরণ বসন্তকুমারীকে সাধ্যমত এড়াইয়াই আসিতেছেন সমস্ত দিন, অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"বাড়ি নেই ! কাল যে আমি তাকে বাড়ি থেকে বেরুতেই বারণ করলাম !"

সেইরকম মসৃণ অল্প ব্যঙ্গের কণ্ঠেই উত্তর হইল—"অবাধ্য তো আছেই, নইলে দাদা পাঁচটা বিচক্ষণ লোকের পরামর্শে যা করছে তাতে অমত করতে যায় ? কিন্তু সে কথা থাক, এখন····"

অন্নদাচরণ হুলের বিঁধুনিটা অনুভব করিতেছেলেন, তবুও রাগটা চাপিয়াই বলিলেন—"অমত ! তাকে জিগ্যেস করি নি ? সে রাজি হয় নি ?"

বসন্তকুমারী এতক্ষণ পর্যন্ত দু'টো কথা বলিবার সুযোগ পান নাই, জ্বালাটা আরম্ভ হইয়াছে বুঝিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, একটু হাসিয়া

বলিলেন—"হুঁঃ, কথা বলছ যেন তার রাজি অরাজির কথা জানো না তুমি,—'না' বলে একটা ধমক খেয়ে 'হ্যাঁ' বলেছে, 'হ্যাঁ' বলে ধমক খেয়ে তক্ষুনি সেটাকে 'না' করেছে, এই তো দেখে আসছি আজ এই ষোল বচ্ছর ধরে...."

অন্নদাচরণ রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন—"বাজে কথা রাখো; তোমার বাজে কথা কইবার ফুরসৎ আছে, আমার নেই। ঘুড়িটা আছে কিনা খোঁজ নিয়েছ?"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"নেই।"

অন্নদাচরণ আর নিজেকে সংযত করিতে পারিলেন না, বেশ উচ্চ কণ্ঠেই বলিয়া উঠিলেন—"বোঝ, বোঝ একবার কাণ্ডটা! ধুম পড়ে গেল আজই তার রুগী দেখবার!....হবে না তাকে আসতে, আমি একাই...."

বসন্তকুমারী মুখের কাছে হাতটা লইয়া গিয়া চাপা গলায় বলিলেন—"চুপ করো; আর শত্রু হাসিয়ে কাজ নেই, একে তো কে যে শত্রু আর কে যে বন্ধু চেনা দায় হয়ে উঠেছে; যা করছ করগে, অদিষ্টে যা হবার হবে।"

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িল। নিকুঞ্জলালকে অন্নদাচরণ নিজেই বলিলেন—"নিকুঞ্জলাল হু কা হইতে মুখ সরাইয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন—"তাই নাকি! তুমি অবাক করলে যে। দেখো, দেখো খোঁজ নাও।"

অন্নদাচরণ ফিরিয়া যাইতে নিকুঞ্জলালের একটু যেন কি রকম ঠেকিল; কথায় আতঙ্কের সুরটা যেন তত প্রবল নয়। মনের সন্দেহ ভাবিয়া আর ও লইয়া মাথা ঘামাইলেন না।

রাত্রি হইয়া গেলেও যখন রসিকলাল আসিলেন না তখন সকলের

আলাদা করিয়া হারাণের কথা মনে পড়িল। সাতকড়ি আর হরু হারাণের বাড়ি গিয়া খবর আনিল হারাণও আজ সকাল হইতে বাড়ি নাই, বলিয়া গেছে, বিশেষ কাজে শ্বশুরবাড়ি যাইতেছে ; কাল ফিরিয়া আসিবে।

অন্নদাচরণ ঘরে শুইয়াছিলেন, শুনিয়া "হুঁ" করিয়া একটা শব্দ করিলেন।

যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল, উৎসবের আনন্দ ধীরে ধীরে মুছিয়া গিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন পুরী একটা আসন্ন বিপদের প্রতীক্ষায় থরহরি-কম্প হইয়া রহিল।

বিপদটা সকালে দেখা দিল সম্পূর্ণ এক অপ্রত্যাশিতভাবে—

পরদিন আটটা থেকে দশটার মধ্যে আশাবাদের লগ্ন, হরিপুব থেকে সকলের ভোরেই আসিবার কথা। ব্যবস্থা হইয়াছে—সন্ধ্যার পর গাড়ি থেকে নামিয়া ডুমজুড়েই কাটাইয়া অল্প রাত থাকিতে যাত্রা কবিবেন, যাহাতে সূর্যোদয়ের পরেই বেলে-তেজপুরে পহুঁছাইয়া যান। এদিক থেকে কয়েকজন মাইল দুয়েক দূরে সাতনলায় গিয়া বসিয়া আছে, সেখান হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবে।

সূর্যোদয় হইল, বেলা বাড়িয়া চলিল, কাহারও দেখা নাই। এক একজন করিয়া জন চারেককে সাতনলায় ছুটাইয়া দেওয়া হইল, সেখান থেকেও জন দুয়েক আরও অগ্রসর হইয়া সন্ধান লইতে গেল। কোন খবরই নাই।

আটটা বাজিয়া গেল, নয়টা, দশটা। অন্নদাচরণ পাগলের মতো হইয়া গেছেন। গ্রামের প্রত্যেক ভদ্র গৃহস্থের কর্তাকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। অবশ্য পাড়াগাঁয়ে মধ্যাহ্ন-নিমন্ত্রণ মানে বেলা চারটের ব্যাপার, তবু আশীর্বাদ সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য সকলে আসিয়া গিয়াছে।

গোলমালের কথা শুনিয়া আরও সব জুটিয়া আরও গোলমাল বাড়াইয়া দিতেছে। অন্নদাচরণ প্রবীণদের একবার এর হাতে ধরিতেছেন, একবার ওর পায়ে ধরিতেছেন—"আমি কি করি?....রসিক কোথায় গেল?....একি—কি হ'লো?"

সামনে সান্ত্বনা পাইতেছেন তবে পিছনে নানারকমের টীকা-টিপ্পনী চলিতেছে—"বামন হ'য়ে চাঁদে হাত!....ওহে, বিদ্যাসাগরের কাকপক্ষী আর ময়ূরপুচ্ছের কথাটা পড়েছ তো?—হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ...."

ঘোষাল মশাই-ই পরিবারটিকে আন্তরিক স্নেহ করেন। প্রথমেই বেগতিক দেখিয়া একবার আড়ালে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—"বলেছিলাম বাপু, নিকের পাল্লায় প'ড় না; দেখলে তো? আমি আশঙ্কাই করছিলাম পুরণ ঝাল ও মোক্ষম ভাবেই মেটাবে। দেখছি নিকেই সর্বেসর্বা, আমরা আমল পাচ্ছি না তাই বলিনি, নৈলে যতটুকু খোঁজ পেয়েছি, তাতে তো দেখছি অনেক গলদ ভেতরে। যাক; আপাততঃ নেমন্তন্নটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। দুটোর সময় একটা লগ্ন আছে। নেমন্তন্নটাকে রাত্তিরে ঠেলে দেওয়া যাক, হরিপুর থেকে লোক আসে ভালোই, না আসে এমন অবস্থাতেও রাত্তিরে যারা খেতে আসবে তাদের খাইয়ে দিলেই হবে।... দুঃখ করে আর করবে কি? হয়ে পড়ল একটা কেলেঙ্কারি, সামলাতে হবে তো?....মেয়েটার খবর কি?"

অন্নদাচরণ ঘোষাল মশাইয়ের হাতটা ধরিয়া ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"কাকা, পরশু থেকে আমি তার মুখের দিকে চাইতে পারিনি।"

ঘোষালমশাই স্নেহভরে পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"বিপদের সময় উতলা হয়ো না অন্নদা। আমি সাধন আর শিবুকে টিপে দিয়েছি, তারা

রান্নার হাঙ্গামাটা সামলে রাখবে। আমি নেমন্তন্নটা সামলে নিচ্ছি বুঝিয়ে সুজিয়ে, তোমার ওদিকে যাওয়াটাও ঠিক হবে না। তুমি একটু ভেতরে চলে যাও, মেয়েদেরও একটু দেখা দরকার।....নিকে হারাম-জাদাকে দেখছি না যে? কাঁচা মাথাটা ধড় থেকে ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছে করছে, উঃ!"

অন্নদাচরণ বলিলেন—"নিকুঞ্জদাদা, সাতনলায় ওদের এগিয়ে আনতে গেছেন, রাজগুরুও সঙ্গে আসবেন, তাই...."

ঘোষালমশাই দাঁতে দাঁতে পিষিয়া বলিয়া উঠিলেন—"রাজগুরু! রাজগুরু! রাজা!—এখনও তোমার মোহ যায়নি অন্নদা!"

অন্নদাচরণ বলিলেন—"কি করি কাকা, আমি যে কী ভাবে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি!—আজ আমায় অপমান হতে হ'ল, এটা ফাউ, যদি এইটুকুর ওপর দিয়েই আমার প্রায়শ্চিত্ত হ'ত কাকা, দুঃখ ছিল না, কিন্তু গিরিকে আমার জলাঞ্জলি...."

এমন সময় সাতনলায় যাহারা গিয়াছিল তাহাদের কয়েকজন ফিরিয়া আসিল। খবর দিল নিকুঞ্জলাল একটা পালকি করিয়া স্বয়ং ডুমজুড়ে গেছেন। বলিয়া দিয়াছেন দুইটার সময় একটা 'দিন' আছে, আশীর্বাদের বন্দোবস্ত যেন ভাঙ্গিয়া দেওয়া না হয়।

ভিতরের অবস্থাও খুব জটিল, টীকা-টিপ্পনীতে অনেক নখে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে, ধারাল ঠোঁটে পানজর্দার ঘন ঘন শান পড়িতেছে; দুই তরফেই, কেননা ঘোষাল গিন্নির মত মানুষও আছেন, বলিতেছেন—"টাকার শ্রাদ্ধ! তাও যদি মেয়েটা পরিত্রাণ পায় তো বুঝব। বাপ-জেঠার লোভের প্রাচিত্তির অন্নর ওপর দিয়েই হ'ল।...."

দামিনী গম-গম করিয়া ফিরিতেছেন। ঘোষাল গিন্নিকে ভয় করেন, সরিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছেন—"প্রাশ্চিত্তির হচ্ছে তার, যে গায়ে পড়ে পরের উবগার না করে থাকতে পারে না।…এর মধ্যে কারচুপি আছে অনেক, বহুদিন থেকেই আঁচ পাচ্ছি। দু'টোর সময়ও যদি তারা না এসে পড়ে তো বুঝব, সেই বিটলে বামন গিয়ে ভেঙে দিয়েছে। ঐ বসিক,—ভয় ক'বে বলছি না তো!"

বেশ স্পষ্ট ঝগড়া বাধিবার কথা, কিন্তু বাধিতেছে না। বরদাসুন্দরী ওদিক দিয়া যানই না, ক্রমাগত আড়াল খুঁজিয়া খুঁজিয়া চোখের জল মুছিতেছেন।

বসন্তকুমারী মাথাব ব্যথা লইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়াছেন। সত্য বা ভান মাত্র বলা দুষ্কর।

গিরিবালা শুষ্কমুখে ক্রমাগতই নিজেকে সবার চক্ষু হইতে আড়াল করিয়া ফিবিবার চেষ্টা কবিতেছে, ভালমন্দ বুঝাটা অনেকটা তাহার সাধ্যাতীত, তবে তাহাকে ঘিরিয়াই যে এতটা বিক্ষোভ এইটেতেই তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। আড়াল চায় কিন্তু এত লোকে ভরা উৎসব বাড়িতে সেটা সম্ভব নয়—বিশেষ করিয়া সে-ই যখন উৎসবের কেন্দ্র। নিরিবিলি ভাবিয়া জেঠাইমার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, দেখিল জেঠাইমা শুইয়া। এই লোকটিকে সে সব চেয়ে বেশি এড়াইয়া আসিতেছে; তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিবে, জেঠাইমা ডাকিলেন—"কে, গিরি? শোন্।"

গিরিবালা পাশে গিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন—"উঠে বস।"

গিরিবালা উঠিয়া পায়ের কাছে বসিল, সঙ্গে সঙ্গেই কোথা দিয়া কি হইল তাঁহার গায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কোলে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বসন্তকুমারী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শুধু গিরিবালার মাথার উপর দিয়া, পিঠের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্তটা ধীরে ধীরে টানিয়া যাইতে লাগিলেন, তাহারপর বলিলেন—"তোকে শেষ করলে গিরি—দু'জনে মিলে—আমি মেয়ে মানুষ কিছুই করতে পারলাম না।" অশ্রু নাই, কোনরকম আবেগও নাই।

এই সময় বাহিরের কলরবে একটা যেন জোয়ার আসিল, একেবারে অন্য ধরণেরই গুলতন—"এসেছে।....এসে গেছে।....বর এসেছে!"

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা যেন নূতন ভাবে সজীব হইয়া উঠিল—কৌতূহল-ভরে ছুটাছুটি, ত্রস্ত প্রশ্ন, অস্পষ্ট উত্তর; কতকগুলা ছেলেমেয়ে জোয়ারের কুটাকাটার মতই হুহু করিয়া বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাদের কাকলিতে বাড়িটা ভরিয়া দিল—"দেখেছি....কি সুন্দর বর!...কি সুন্দর পুরুত! খোট্টা চাকর!...."

বসন্তকুমারী শুইয়া ছিলেন উঠিয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা কণ্ঠে বিস্মিত শব্দ উঠিল—"ওমা, কাতু যে!!"

কাত্যায়নীর কণ্ঠেই উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন—"বড়দি কোথায়?"

তাঁহার পিছনে পিছনে একটি ছোট দল বসন্তকুমারীর ঘরের সামনে আসিল; চৌকাঠ ডিঙাইতে যাইয়াই কিন্তু সকলে থমকিয়া দাঁড়াইল, কাত্যায়নী পর্যন্ত।—

বসন্তকুমারী একেবারে সিধা হইয়া বসিয়া আছেন। মুখটা রাঙা টকটকে, চোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে, কোলের উপর উবু হইয়া শুইয়া গিরিবালা; বসন্তকুমারীর একখানি হাত তাহার মাথার উপর,—

আলগাভাবে রাখা নয়, কতকটা যেন খামচাইয়া ধরিয়া আছেন। দৃষ্টি হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত অচঞ্চল।

অদ্ভুদ সাদৃশ্যে কাত্যায়নীর ধাঁ করিয়া একটা ছবির কথা মনে পড়িয়া গেল, বিকাশ কবে একবার দেখাইয়াছিল,—একটি সিংহী থাবার নিচে নিজের শাবককে চাপিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়া আছে।

তিন দিনের চাপা কণ্ঠস্বরকে মুক্তি দিয়া বসন্তকুমারী কাত্যায়নীকে লক্ষ্য করিয়া গর্জাইয়া উঠিলেন—"নিজে গিলতে পারলি নি, দেখতে এসেছিস অন্য কোন্ রাক্ষসের পেটে গেল?—হবে না তোদের মনস্কামনা পূর্ণ। ডাক, কে আমার কাছ থেকে গিরিকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাকে।"

এমন সময়—"ওগো শুনছ—কোথায় গেলে?"—বলিতে বলিতে অন্নদাচরণ আসিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। ঘরের কাছে একটু বেশি ভিড় দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিলেন—"তোরা একটু সর্ তো·····. ওগো শুনছ?—রাজপুত্তুর এনেছে রসিক—রসিক নিজে—আজই বিয়ে·····"

ভিড়কে, বাড়ির মধ্যে আরও সবাইকে এবং স্ত্রীকে শুনাইতে শুনাইতে দরজার সামনে আসিয়া তিনিও হতভম্ব হইয়া গেলেন, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন—"একি!"

স্বামী-স্ত্রীকে একত্র দেখিয়া বড়রা সরিয়া গেল, বসন্তকুমারীও মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিলেন। একটা ধাক্কা খাইয়াছেন, কিন্তু আবেগটা সহজে যাইবার নয়, অন্নদাচরণ বলিয়া চলিলেন—"রসিক ঠিক করলে! বাপ যে, আমার গুমর করলেই চলবে না তো।·····বর দেখবার জন্যে এতবড় কাজের বাড়িটা খালি হয়ে গেছে—ঘোষালকাকার বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম·····আশীর্বাদ পর্যন্ত সেরে এসেছে রসিক!·····"

খুব শক্ত করিয়া বাঁধা তার হঠাৎ আলগা হইয়া গেলে যেমন হয় অনেকটা সেইরকম হইল,—কিছু শুনিবার বুঝিবার ক্ষমতা হারাইয়া বসন্তকুমারী অবশ ভাবেই আবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িলেন।

"দেখো, শুলো! যার বাড়িতে আজই কাজ সে আরাম করে···· কাতু, তুই এসে দেখ্ দিদি; আমার আর এখন মান-ভাঙাবার····"

শেষ করিবার পূর্বেই হুঁস হইল। "বৌমা কোথায়? পুতী, বৌমা কোথায় রে?—একবার বল্ তো মা দোরেব পাশে এসে দাঁড়াতে···"

বলিতে বলিতেই ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

৭

কয়েকদিন পবে পণ্ডিতমশাই ফিবিয়া আসিয়া যখন বসিকলালেব কাছে সব বিবরণ শুনিলেন, উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"শিবের বিয়েতেও নানা উৎপাত হয়েছিল, দুঃখ বয়ে গেল আমাব দেখা হোল না, এমন আটক পড়ে গেলাম।"

এদিককার গোলমালটা একটু থিতাইয়া আসিলে টের পাওয়া গেল রসিকলালের আবাব দেখা পাওযা যাইতেছে না। খোঁজাখুঁজি ছুটাছুটির আর একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। হারাণও আসে নাই এখনও, সে ফিরিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য সাতকড়ি তাহার বাড়িতে ছুটিল।

গিয়া দেখিল কাকা হারাণের সদর ঘরে বসিয়া হুঁকা টানিতেছে; সামনে, নিজের হাঁটু দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া হারাণ ঊর্ধ্বমুখে বসিয়া। সাতকড়ি কাহাকেও দেখিতে পাইবে মোটেই আশা করে নাই,

আর কেহ দেখিয়া পাছে খবরটা আগে দিয়া ফেলে’ এই ভয়ে ফিরিয়াই ছুট দিয়াছে, রসিকলাল ডাকিলেন—“সাতু, শোন্!”

সাতকড়ি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া দাঁড়াইলে জিজ্ঞাসা করিলেন —“দাদা খুব বকাবকি করছে?”

সাতকড়ি কাকার স্বভাবটা অনেকখানি বুঝিতে পারে এখন, বলিল —“না তো, খুব স্থখ্যেত করে বেড়াচ্ছেন বরং, তুমি যাবে না?”

“বলবি হারাণের বাড়িতে একটা অসুখের খবর পেলাম, দেখেই চলে আসছি।”

হারাণ হাতটা একটু ঘুরাইয়া বলিল—“সে তুমি রামির-মার নিমোনিয়া হয়েছে ব’ল না; গিরিদিদিমণির এমন বিয়ে হচ্ছে, হারাণ আর তোয়াক্কা রাখে না।”

রামির-মা হারাণের স্ত্রী। বারণ করিয়া রসিকলাল অন্য একটা কিছু বলিবার পূর্বেই সাতকড়ি একছুটে গলির বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাতকড়ি চলিয়া গেলে হারাণ আবার গুছাইয়া বসিয়া বলিতে লাগিল—“ডুমজুড়ের সেই বৈকুণ্ঠ পরামানিকের ওখানে গেনু। আমার খুড়শ্বশুর হয়, দেখতেই জিগুলে—‘কুটুম এত ভোরে যে? বাড়ির খবর সব ভালো তো’?”

বললাম—‘বাড়ির খবর একরকম ভালোই আপনার ছিচরণের আশীব্বাদে, তবে এক অন্য বিপদে পড়া গেছে হঠাৎ।’

তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বললাম—হরিপুরের ওনার আর নিকুঞ্জঠাকুরের য্যাতো সয়তানির কথা জানতুম তার ওপর দুপোঁচ রং চড়িয়ে। শেষে বললাম—‘কাল সকালে আশীব্বাদ, আজ সন্দের গাড়িতে এইখেনে নেমে তানারা নিশ্চয় রাত কাটাবে, একটা ব্যবস্থা তোমায় করতে হবে, নৈলে গরীব বামন দুটো দলের চাপে পিষে মারা

যায়। ও-দলের। আবার পশ্চিমে থাকেন, একটু বদরাগী, আর কি যে বলে—বেশ শক্ত-সমত্থ।'

শুনে খুড়শ্বশুর বললে—'এই তুশ্চু কথা?'

তা, তানার বলবার হক আছে কিনা বাবাঠাকুর।—ডুমজুড়ে পাঁচটি দোকান আছে, পাঁচটিই নরহরি ভটচায্যির। ভটচায্যিমশাই থাকেন হাবড়ায়, পাঁচটি দোকানই শ্বশুরমশাইয়ের তদারকে। অবিশ্যি লোকে জানে পাঁচটি দোকান পাঁচজন ভেন্ন ভেন্ন লোকের; কিন্তু ভেতরের গোপনীয় কথাটা এই।....এখন ধরুন আমতার আদালতে মোকদ্দমা, গাড়ি থেকে চারজন সাক্ষী নামল। ওপক্ষের লোক এসে ধরলে—'বৈকুণ্ঠ, এই যৎ সামান্যি নাও, সাক্ষী ক'টিকে একটু আটকে রাখতে হবে বাপু।'....সে সাক্ষী আর সেদিন আদালতের মুখ দেখতে পাবে নাকি বাবাঠাকুর?....এই রকম দশজনের উবগার করে করে শ্বশুরমশাইয়ের হাত পেকে গেছে।....আমার কাছে সব শুনে বললে—'এই তুশ্চ কথা?'

তারপর দু'একবার গুড়ুক টেনে বললে—'তবে সেখান থেকে ক'জন আসছে, কে কে আসছে, কার কি রকম ভালো মন্দ অব্যেস একটু জানলে সুবিধে হতো; তা আমার তো নড়বার উপায় নেই, এক্ষুণি একটা গাড়ি আছে, দোকানের খদ্দের নামবে; তুমি হরিপুরে চলে যাও কুটুম, দেখ কতটা খবর যোগাড় করে আনতে পারো।'

আজ দু'জনেরই ফুরসুৎ কম, তা ভেন্ন মনটাও ঐ দিকে পড়ে রয়েছে, খুব সাটে বলে যাই বাবাঠাকুর, আর একদিন খুঁটিয়ে শোনাব'খন। শ্বশুরের পরামর্শেই জাতব্যবসার সরঞ্জাম নিয়ে সেই গাড়িতেই হরিপুর চলে গেলাম; তিনিই যোগাড় করে দিলে, বললে—'কুটুম, আমাদের বাপ পিতামো'রা অনেক বুদ্ধি খরচ করেই আর সব ব্যবসা ছেড়ে এই

খেউরির ব্যবসাটি বেছে নিয়েছেল—দাড়িতে ক্ষুর ঠেকালেই মান্‌ষের আঁতে সুরসুরি লাগে, আপনি থেকেই গপ্প করি গপ্প করি—'বাই চাগে, পেটে কথা রাখতে পারে না।'

নিভ্যুল কথা বাবাঠাকুর, ঘাঁঘি লোক কিনা, ভুল বলবার পাত্তর নয়, আপনি বরং মিলিয়ে দেখবেন। মোট কথা, আমি সেই গাড়িতেই হরিপুরে গেনু, আর এর মুখে তার মুখে সব খবর নিয়ে ওদেরই সঙ্গে সন্দের গাড়িতে ফিরে এনু, অবিশ্যি ওদের দলে নয়, গা লুকিয়ে লুকিয়ে। আগে-ভাগেই নেমে আড়াল থেকে শ্বশুরমশাইকে সব চিনিয়ে দিনু। খুব মোটামুটি একটা পরচেও দিয়ে দিনু—'দাড়ির ডগায় গেরো বাঁধা উটি কুলগুরু, উটি পুরুত, পাকানো চাদর গায়ে উটি আর পক্ষের সুমুন্দি নীলমণিবাবু, পাশেই উটি সুমুন্দির ছোট সুমুন্দি, তেলের কুপোর মত উটি দাওয়ানজি, তার সঙ্গে পিপের মতন যে লোকটি কথা কইছে সে হ'ল বাবুর পিসেমশাই—কত্তা হ'য়ে এসেছে...'

খুড়শ্বশুর একবার তাক্যে দেখে বললেন—'কত্তামি ভাঙচি। নেশাটেশা কার কি অব্যেস খোঁজ নিয়েছ? তাতে কাজের সুবিধে হয়।'

বন্নু—'না, যারা ওদিকের তাদের যে আসতেই দিলে না, কম হারামজাদা! এদের একটু আপিন হ'ল, একটু সিদ্ধি হ'ল, এই পয্যন্ত।'

ত্যাতক্ষণে সেকেন্‌ কেলাস থেকে নেমে সবাই এগ্যে এয়েচে, সামনে পিসে। শ্বশুরমশাই গিয়ে খুব নিচু হ'য়ে গড করে বললে—'পাতপ্রণাম হই, ঘরটর চাই হুজুরদের রেতে থাকবার জন্যে?'

পিসেমশাই গোঁফজোড়া ফুলিয়ে বললে—'নরহরি হারামজাদার দোকান নয় তো?'

শ্বশুর আর একটা গড় করে হেসে বললে—'নরহরিঠাকুরের দোকানের'নোক হ'লে ভদ্দর-নোকের সামনে এসে দাঁড়াতে পারতুম? মনে সে ধম্মবল পেতুম?—এইটেই ভেবে দেখুন না কেন হুজুর?'

পিসে বললে—তা'হলে 'চল্, এগো।'

সামনের দোকানটাতে না তুলে, আর একটু এগিয়ে গিয়ে একেবারে চার নম্বরটাতে তুললে, আমিও একটু ঘুরে গিয়ে খদ্দের হ'য়ে উঠনু।'

ওপরে একখানা ঘর, নিচে দু'খানা। সামনে দোকান।

সবাই এসে উঠলে খুড়শ্বশুর জিগ্যেস করলে—'ওপরে আপনারা কে কে থাকবেন?'

গোল বাধাবার জন্যেই প্রত্যেক দোকানে একটি করে ওপরে ঘর আছে, পরে খুড়শ্বশুরের মুখে শুনলাম কিনা। কথাটা খুব সোজা বাবাঠাকুর;....যে ওপরে ঠাঁই পাবে না সে-ই মনে করবে মানহানি হোল, চটে গিয়ে কাজ পণ্ড করবার চেষ্টা করবে।...সবাই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। পিসে বললে—'আর ওপরে ঘর নেই?'

খুড়শ্বশুর বললে—'আর একটি আছে, তবে আপনাদের যুগ্যি নয় হুজুর। চিলে-কোঠার সঙ্গে একটা ছোট খুবরি আছে।'

পিসে বললে—'আমরা চারজন চিলে কোঠায় সেঁদুচ্ছি, নীলমণিবাবু আর ওনার সুমুন্দি ভালো ঘরটা দখল করুন।'

অবিশ্যি ওর মানে হয় উলটো। নীলমণিবাবু মুখটা একটু বেঁকিয়ে বললে—'তা কি হয়? আপনি হলেন কত্তা, উনি দাওয়ানজি, উনি কুলগুরু, উনি পুরুত। আমাদের চিলে কোঠারও দরকার নেই। আমরা নগণ্য মনিষ্যি নিচেই বেশ থাকব।'

খুড়শ্বশুর আমায় পরে বললে বাবাঠাকুর—'কুটুম, যখন শুনলাম পিসেও আছে আবার সুমুন্দিও আছে তখনই জেনে গেছি বাজি মাৎ'....

কথাটা বুঝতে পারলেন না—বাবাঠাকুর ? পিসে আর সুমুন্দিতে কখনও বনে না,—বনতে পারেই না।—সুমুন্দি মনে করে—আমি খোদ সুমুন্দি, আমার কাছে দাঁড়ায় কেটা ? পিসে ভাবে—আরে গেল! তুই যার সুমুন্দি বলে মাটিতে পা দিচ্ছিস না, খোদ তার বাপ যে আমার সুমুন্দি! কাজেই গোলমাল বেধে যায় বাবাঠাকুর।

এদিকে পিসে আবার বাড়িতে একটু মুরুব্বির মতন থাকতে চায় বলে দাওয়ানজির সঙ্গে খাতির থাকতে পায় না। দাওয়ানজি বললে—“আমিও নিচেই যাই, কম্মচারী মানুষ, ওপরে থাকাটা শোভা পায় না।'

থাকবার বিলিব্যবস্থা করে দিয়ে, আহারাদির বিলি করে, থাকাথাকি নিয়ে বেশ একটা মনকষাকষি বাধিয়ে খুডশ্বশুর জিগ্যেস করলে—কোথায় যাওয়া হবে হুঁজুবদের ?—গোরুর গাডির ব্যবস্থা করব কি পালকির ?'

পিসে বললে—'আমাদেব যা হয় হবে ; আগে ওদের জন্যে একটা পালকির ব্যবস্থা কর, নইলে মান ভাঙবে না।—যেতে হবে বেলে-তেজপুর।'

খুডশ্বশুর এই ধবণেব কথাবার্তাই খুঁজছিল, নেমে এসে নিচের ঘরে ঢুকে একপাশে হাঁটু মুড়ে বসে বললে—'মশাইদের জন্যে শওয়ারির কি ব্যবস্থা করা যায় ?'

সুমুন্দি মুখ গোঁজ জরে জিগ্যেস করলে—'কত্তাদের কি ব্যবস্থা হ'ল ? তাঞ্জাম ?'

খুড়শ্বশুর একটু মুচকি হাসলে, বললে—'ওপরের ওনারা যে মর্যোদার নোক দেখছি তাতে তাঞ্জাম হলেই হতো ভালো। দু'খানা বাছাবাছা পালকির হুকুম দিলেন।'

সুমুন্দির সুমুন্দি মুখটা কুঁচকে জিগ্যেস করলে....'আর আমাদের জন্যে ?'

খুড়শ্বশুর হাত জোড় করে বললে—'হুঁজুর গোলাম গরীব নোক একটি এই দোকানের উপর নিভ্ভর করে কোনরকমে চলে যায়। বড় নোকেদের সেবা করি, কিন্তু কথায় থাকি না, বিশেষ করে ওনাদের ভাবটা একটু যেন কেমন কেমন বুঝছি কিনা।'

এই সুমুন্দিতে ছাড়বে না, খুড়শ্বশুরও বলবে না। শেষকালে কাঁচুমাচু করে বললে—'ওনারা কিছু বললেন না, তাই আমি পেরথমটা ভাবলাম বুঝি আপনারা নিজের ব্যবস্থা নিজে করবেন। তারপর আবার ভাবলাম একটু জিগ্যেস করেই নিই, ইনিই যেন কত্তা দেখছি। তাইতে আপনাদেরই জিগ্যেস করতে হুকুম করলেন। বললেন—'জিগ্যেস করগে লবাব বাহাদুরদের পালকি চাই কি গোরুর গাড়ি হলেই হবে'।....যা শুনলুম তাই বললুম হুজুর, গরীব নোক, অত ভালোমন্দ বোঝবার খ্যামতা নেই।'

সবটা খুঁটিয়ে বলবার ফুরসুৎ নেই বাবাঠাকুর, মোট কথা একদিকে খুড়শ্বশুর আর একদিকে দাওয়ানজি—দুই জনায় মিলে এমন গরম করে তুললে যে সুমুন্দি দিব্যি গেলে বসল—'আমি যদি এ আশীর্বাদে যাই তো আমার অতি বড় কোটি দিব্যি রইল।'

তানার সুমুন্দি যাত্রার দলের দুর্ব্বাসা মুনির মতন পৈতেটা বের করে বললে—'আমি যদি আর একদণ্ড ওদের সাথে এ দোকানে থাকি তো আমার নাম গজু চাটুজ্জেই নয়।'

—হবেই কিনা বাবাঠাকুর, নৈলে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় আর বলেছে কেন শাস্ত্রে ?—ও আবার তোস্য সুমুন্দি কিনা।

খুড়শ্বশুর সুমুন্দিকে বললে—'আমার একজন খদ্দের গেল বলে নয়, কিন্তু কাজটা কি ওনার ভালো হবে ? আর যে রকম রোকা লোক দেখছি শোনবেনও না। তা, অন্তত আপনি বাবু চোখ কান বুজে সয়ে

যান। 'মানী লোক ওনারা, আপনি সুদ্দু চলে গেলে ওঁদের অপমানের আর হিসেব থাকবে না।'

সুমুন্দি পৈতেটা ছিঁড়েই দিব্যি করতে যাচ্ছিল,—নিজের শালার কাছে তো খাটো হতে পারে না বাবাঠাকুর,—দাওয়ানজি তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে। খুড়শ্বশুরকে বললে—'যদি ফিরে যেতেই চান এঁরা তো যেতে দাও হে বাপু, শেষে একটা অনর্থ হবে? ইনি আবার ভয়ানক অভিমানী, তুমি বাইরের নোক জান না তো।'

সবই তো নিজেদেরই দোকান, খুড়শ্বশুর তাড়াতাড়ি দু'জনাকে অন্য দোকানে সরিয়ে ফেললে। ফিরে এসে আমায় বললে—'কুটুম, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতন সংসারটা বড় পাজি জায়গা. এখুনি বোধ হয় দু'জনার মত বদলে যাবে, আমার এতটা মেহনতই সার হবে। এই নাও, তুমি বেশ মিহি করে এই সিদ্ধিটুকু পিষে ফেলো দিকিন, খানকতক কচুরি করে খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিগে, জেদটা আঁকড়ে বসে থাকবে'খন। ভোরেই একটা টেন আছে, চাপ্যে বাড়িমুখো করবার যোগার ক'রে দিয়ে আসি গে।'

ওদিককার ব্যবস্থা পাকা করে খুড়শ্বশুর এ-চারজনকে নিয়ে পড়ল। কচুরিটা সুমুন্দিদের ভালো লেগেছিল বলে মাত্তোর দু'খানা বেঁচেছিল, খুড়শ্বশুর দাওয়ানজির ঘাড় দিয়ে চালিয়ে দিলে একে মোটে দু'খানি, তায় দাওয়ানজি কম্মচারী মানুষ, একটা ভয় আছে, ভাঙানো গেল না। খুড়শ্বশুর বললে—'চলুক চার জনেই তাহ'লে, আর ভাবতেও পারি না মেলা, মানুষের শরীল তো?'

খাওয়া-দাওয়ায় রাত করিয়ে দেছল, ওনাদের উঠতে একটু বিলম্বই হ'য়ে গেল বাবাঠাকুর। মানে, এনারা য্যাখন পালকিতে চড়ল ত্যাখন সুমুন্দি জোড়া ওদিকে হু'টো ইষ্টিশান পেইরে গেছে। পিসে খুব

একচোট চটল, দাওয়ানজি বললে—'খোদ কত্তা ওনাদের আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় চড়াচ্ছেন, আপনি আর কি করবেন ?'

আট-আট বেয়ারার দু'খানা পালকি, একটাতে চড়ল পিসেমশাই আর গুরুঠাকুর, একটাতে চড়ল দাওয়ানজি আর পুরুত। পালকি য্যাখন আধ পোটাক রাস্তা এগ্যে গেছে, আমিও দুগ্‌গাস্‌সিহরি বলে খুড়শ্বশুরের পায়ের ধূলো নিয়ে বেইরে পরনু। খুড়শ্বশুর বলে দিলে—'কুটুম, তুমি এইরকম তফাতে তফাতেই থেকো। পৃথিমীতে কাউকে বিশ্বেস নেই, শেষে তোমাকেও ফাঁসিয়ে দেবে,—নিরীহ মানুষ, মাঝেপড়ে খানিকটে নাকাল হবে।"

মনে মনেই বললুম—'হারাণ পরামানিককে নাকাল করবে সে এখনও মায়ের পেটে।....ওনাকে অবিশ্যি বললুম—'না ; কিসের মাথা ব্যথা কন্না আমার ?'

সুতুনীর খালের ধারে য্যাখন পৌছুল, সবে সুয্যি উঠেছে। বড় নদীর-লতুন জল নেমেছে, বেয়ারারা পালকি নাব্যে কেনারায় থুলো। ওদের মুখপাত ছেল চরণ বেয়ারা ; জিগ্যেস করলে 'হুজুরেরা পালকি সুদ্ধু পার হবেন, কি পুল দিয়ে পেইরে যাবেন, কি হেঁটেই এইটুকু সেরে নেবেন ?—আমরা তো বলি—'হেঁটে গেলেই ছেল ভালো, জল এক কোমরের বেশি হবে না।'

আমি ত্যাতক্ষণে এসে একটা ঝোঁপের আড়ালে বসেছি। পিসে তো এক কোমর জল ভেঙে পার হ'বার কথায় চরণদাসকে শুধু মারতে বাকি রাখলো—অসম্মানের কথা কিনা বাবাঠাকুর। দাওয়ানজি পালকিতে পেরুতে রাজি হো'ল নি, পুল পেইরে যাবে ঠিক করলে। পিসে, গুরুঠাকুর আর পুরুত পালকি সুদ্ধু পেরুবে ; চারজন চারজন করে আটজন বেয়ারা এগুনে পিসে আর কুলগুরুঠাকুরকে পার করে এসে অন্ত

পালকিঁতে পুরুতমশাইকে নিয়ে যাবে। পিসে বললে—'পালকিতে যদি একটুও জল লাগে তো তোদের এক একটাকে আমি আস্ত পুঁতব নদীর মধ্যে হারামজাদারা।'....ভয়ঙ্কর রোখা লোক বাবাঠাকুর, নৈলে জমিদারের পিসে হতে পারে?

পুল না হাতী, বোধ হয় দেখেইছ তুমি বাবাঠাকুর। এ পার থেকে ওপার পয্যন্ত একসারি বাঁশের খুঁটি পোতা আছে, তার সঙ্গে দু'সারি বাঁশ ওপর নিচে করে এমুড়োওমুড়ো বাঁধা, একটা ওপরে পা দিয়ে একটা ধরে পার হও—বৈতরুণী বলে আমি পদে আছি। সে-পুল দিয়ে দাওয়ানজি পার হতে চাইত না বাবাঠাকুর; মোটা মানুষ, তায় এ-সবে অব্যেস নেই তো?—আমার যা আন্দাজ, সুমুন্দিদের নিয়ে খুড়শ্বশুরের কেরামতিটা দেখে ওনার একটু খটকা নেগে গেছল বোধ হয়; জমিদার সেরেস্তার দাওয়ান, ঝানু নোক তো বাবাঠাকুর? কত দেখেছে কত শুনেছে। অবিশ্যি খুড়শ্বশুরের সাথে একরকম একজোট হয়েই সুমুন্দিদের সরালে, তবুও তিনি কয়েকবার আড়চোখে তানার দিকে ফিরে ফিরে দেখলে যেন।

পা টিপে টিপে দাওয়ানজি য্যাখন পুলটার আদ্ধেকের কাছাকাছি গেছে, পুরুতমশাই কেনারা থেকে জিগ্যেস করলে—'আমিও তা'হ'লে আসব না কি?'

বেচারি বুড়ো হয়ে এসেছে, অতটা ঠাওর করতে পারে নি, দাওয়ানজির ত্যাখন পা বেশ একটু একটু কাঁপতে নেগেছে। তিনি বাঁশটা বুক দিয়ে জইড়ে ধরে, ঘুরে না দেখেই বললে—'আসুন না, এ তো নেতান্তই কিছু নয়, যেন মনে হচ্ছে ছাতের ওপর হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছি।

হ্যাঁ, হাত সাফাই বলতে হবে বাবাঠাকুর খুড়শ্বশুর বললে কিনা, কুটুম, মানুষের অদেষ্ট না বালির বাঁধ।—এদেরই বাপ-পিতেমোরা এক

সময় ডাকাতি করে খেতো, কপাল ভেঙেছে, আজকাল ডুলী বেয়ারাগিরি ক'রে কোন রকমে দিন গুজরান করছে।....দাওয়ানজি পুলের ঠিক আধা-আধি পৌঁছে পুরুতঠাকুর কতটা এগুলো দাঁইড়ে সাড়া নিচ্ছে, এমন সময় পিসের পালকি মাথায় করে এরা নদীর কোলে পৌছুল। ঠিক নিচে পৌঁছেই সামনের একজন বলে উঠল—'সামলে, পেছল!....চরণদাস বলে উঠল—বাঁশের খুঁটি ধরে ফেল্ সবাই, অপরে আপনারা একটু কসে ধরবেন!'....দাওয়ানজি বললে—'খবরদার, বাঁশ ধরবি নে, নড়ছে।'.... পিসে আর কুলগুরুঠাকুর ভেতর থেকে চেঁচ্যে বললে—বাঁশ কসে ধর, খবরদার, পালকি দুলছে'....জোয়ান জোয়ান আটজনের নাড়া খেয়ে পুল তখন বেশ দুলতে নেগেছে বাবাঠাকুর। দাওয়ানজি ত্যাখন দু'টো হাত আর গলা দিয়ে বাঁশটাকে আঁকড়ে ধ'রে নাগরদোলার দোল খাচ্ছে আর পরিত্তাহি চেঁচাচ্ছে—'বাঁশ ছাড় হারামজাদারা; শাগ্‌গির বাঁশ ছেড়ে দে!' .....এদি-ক—'পেছল, সামাল! পেছল সামাল!'—ক'বে পালকিতে রীতিমত ঝাঁকানি লাগ্যেছে। ভেতর থেকে পিসে বলছে—'খোঁটা বাগ্যে ধরিস, গুরুঠাকুর রয়েছেন।'....ওপরে পুরুতঠাকুর চেঁচ্যাচ্ছে, 'আমায় ফিরে যেতে দে, পালকিতেই পেরুব-ধীরে সুস্তে'....দাওয়ানজি বলছে, 'ছাড় খোঁটা, আমি বুকে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছি না আর!'....সবারই গলা চিরে যাচ্ছে বাবাঠাকুর, এমন সময় খুব জোরে—'সামাল! সামাল!'—বলে এমন একটি রাম-ঝাঁকানি দিলে বাবাঠাকুর, দাওয়ানজি গুলতি দিয়ে পাড়া পাকা আমটির মতন পুলের ওপর থেকে এক্কেবারে পালকির মাঝখানটিতে,—সঙ্গে সঙ্গে পালকির ছাদ ভেঙ্গে ওঁদের দু'জনসুদ্ধু এক কোমর জলে...."

রসিকলাল শুনিতে শুনিতে শেষের দিকে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"মারা গেল না কিরে!"

হারাণ বলিল—"খুড়শ্বশুর ছাঁপোষা মানুষ, পাঁচটা কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করে, বেহ্ম-হত্যে ক'রে কি পাপের ভাগী হতে পারে? কিছু একটা হ'লে তো তানারই পাপ লাগতো? বেয়ারা সবাই তো নিরীহ মানুষ; সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না কারুর, যেমন বলেছে করে গেছে। তবে পালকি যখন টেনে তুললে—উরি মধ্যে একটু আন্দাজ করেই তুললে বাবাঠাকুর—ত্যাখন তিনজনেই বেশ খানিকটা করে ঘোলা জল খেয়ে কপালে চোখ তুলেছে, দাওয়ানজি ছাদ ফুড়ে ওনাদের দু'জনার মাঝখানটিতে যেয়ে সভা কবে বসেছিল কিনা।....হ্যাঁ, নেশানা বটে বাবাঠাকুর। গপ্পই শুনে এসেছি অ্যাদ্দিন, গিরি দিদিমণির কল্যেণে স্বচক্ষে পেত্তক্ষ করনু।

ওদিকে পুরুতঠাকুর হালকা মানুষ, ছিটকে তিনপাক খেয়ে একটা কেয়াবনের ঝোঁপের মধ্যে প'ড়ে....

এমন সময় সাতকড়ি, হরু এবং আরও কয়েকজন ছেলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—"শাগগির ডাকছেন তোমাদের!...."

হারাণ বলিল—"কেন, রামির-মার নিমুনিয়ার কথা বল নি?"—

সাতকড়ি বলিল—"সে তো সেখানে আলপনার পিটুলি বাটছে, শুনে বললে—যে বলেছে তারেই নিমুনিয়া ধরুক আগে।"

৮

বড় দিদিমাকে শৈলেনের বেশ মনে পড়ে। আঁটো-সাঁটো গড়নের মানুষটি, নাকে রাঙা-পাথর বসান একটি নথ। খুব রহস্যপ্রিয় ছিলেন; সোনা, পান্না আর হাসিতে মুখখানি সদাই ঝলমল করিত। এদিকে

সংসারের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধটা ছিল ছাড়াছাড়া ঠিক অবহেলা নয়; আসলে সমস্ত গ্রামটা ছিল তাঁহার সংসার,—কাহার অসুখ, কাহার প্রসববেদনা উঠিয়াছে, কাহার বাড়িতে আনন্দের ভোজ, কাহার বাড়িতে অভাবের অনশন—এই সামলাইতেই বড়দিদিমার দিন কাটিয়া যাইত; কখন কখনও রাত্রিও। তবে নিজের সংসার সম্বন্ধে একটা শক্তি তাঁহার খুব প্রবল ছিল,—কোথাও একটু সূক্ষ্মতম ত্রুটি হইলেও তাঁহার চোখটা সেখানে গিয়া পড়িত, সেটুকু সংশোধন করিতে বড কডা হইয়া উঠিতেন, দরকার পড়িলে স্বামীও বাদ পড়িতেন না। তাহারপর আবার সেই ঔদাসীন্য। সংসারটা চালাইতেছেন ছোটদিদিমা,—শ্যামাঙ্গী, খুব টানা-টানা চোখ, কর্মঠ, স্বল্পবাক। রাগিতেন শুধু স্বামীর ঢিলেপনা লইয়া, সে-রাগও হাসিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেন।....এই রাগটুকুও মেয়ের মধ্যে আসিয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল,—শৈলেন মাকে কখনও রাগিতে দেখে নাই, উনি আবার প্রায় রাগিবার আগেই হাসিয়া ফেলিতেন।

বড়দিদিমার সংসারে একটু টান হইত যখন শৈলেনরা মামার বাড়ি যাইত। নাতিদের দেখা-শোনা, ধোওয়ানো-মোছানো, একটা বড় থালায় ভাত লইয়া নিজের হাতে খাওয়াইয়া দেওয়া,—সঙ্গে সঙ্গে চলিত নাতিদের লইয়া সেকালের দিদিমাদের ঠাট্টা।...."কি জ্বালা, গিরি, তোর মেজছেলেটা যে কোন মতেই আমার আঁচল ছাড়তে চায় না! আমায় নিয়ে দাদামশাইয়ের সঙ্গে শেষে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই বাধাবে নাকি.... দুদিনের জন্যে এসে একি মায়ায় আবদ্ধ করা বল্ দিকিন?"

আসল কথা বড়দিদিমাকে তো এমনই ভালো লাগিত শৈলেনের, তাহার উপর ছিল তাঁহার গল্প,—রূপ-কথা, আবার রূপকথার চেয়েও আশ্চর্য কথা সব।—

"তোর বাবা যখন উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনও আমি বিছানায় শুয়ে। মাথাটা ছেড়েছে, কিন্তু লজ্জায় আর আপশোষে আমি মুখ তুলতে পারছি না। মনে একটা আগ্রহ রয়েছে অথচ ভাবছি—কাতুর মতন মানুষকে ওরকম করে বললাম আর তার সামনে মুখ তুলব কি করে? ওদিকে বরণ আমায়ই করতে হবে, তোর দুই দাদামশাই বাইরে তাগাদা লাগিয়েছে, কাতু আমার গলা জড়িয়ে বলছে—তুমি ওঠ দিদি; আমি তোমায় না চিনতাম, রাগ করতাম। তুমি বলেছ, না, পাঁচভূতে বলিয়েছে, জানি ভেতবের কথা তো সব...."

মাথার দিব্য দিয়ে একরকম টেনেই তুললে আমায়। দাওয়ায় এসে দেখি তোর বাপ সমস্ত উঠোনটা যেন আলো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সে কী ভিড! বর দেখবাব জন্যে মেয়ে-পুরুষে এত লোক জুটে গেছে যেন তিল ফেলবার ঠাঁই নেই উঠোনে। বড্ড মনটা দমে গেছল, তার পরেই এই দেবকুমারের মতন রূপ ছেলের, বেশ মনে পডে প্রথমটা আমি কী রকম হয়ে গেলাম একেবারে। একবার মনে হোল স্বপ্ন দেখছি না তো? একবার মনে হোল ওবাডির বডঠাকুরের একটা কিছু সাজানো ব্যাপার, এখুনি যেন এ ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে অন্য একটা কি হয়ে যাবে। আহ্লাদে ভয়ে কি রকম যে হয়ে গেছি, কাপড ছাড়বার জন্যে কাতু, তোর ছোটদিদিমা, আরও সবাই তাগাদা দিচ্ছে, শুনছি, কিন্তু যেন হুঁস নেই। তোর বড়দাদু ভিড় ঠেলে ঠেলে যেন চড়কি ঘুরে বেড়াচ্ছে নেমন্তন্ন থেকে নিয়ে বিয়ের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সব্য সব্য ঠিক করা—সোজা কথা নয় তো। একবার কতকগুনো কাপড়-চোপড় হাতে করে উঠল বড়বৌ? বলতে বলতে আমার ঘরের দিকে আসতে আসতে আমায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল,—খাটুনিতে, আহ্লাদে, এদিকে আবার দুভ্‌ভাবনায় যেন কি রকম হয়ে গেছে, আমার দিকে চেয়েই চোখ

ছলছলিয়ে উঠল, বললে—“যাও শীগগির, তুমিই না বলতে ওর বাপের বিশ্বাস ফলবেই, গৌরীকে নিয়ে যেতে আসতেই হবে তাঁকে একদিন....’

বড়দিদিমার গল্প বলার কথা এখনও প্রায়ই মনে হয় শৈলেনের। তাহারা এপাশে ক’জন, ওপাশে ক’জন, মাঝখানে দিদিমা শুইয়া, কুলঙ্গির মধ্যে পিতলের প্রদীপে আলোর শিখা কাঁপিয়া ঘরের ছায়াগুলো যেন সজীব করিয়া তুলিয়াছে। রান্নাঘর থেকে মাঝে মাঝে ছোটদিদিমা কিম্বা হয়তো মায়েরই আওয়াজ আসিতেছে—“তোরা যেন ঘুমিয়ে পড়িস নি, আর দেরি নেই বেশি”। ঘরে কোথায় মুড়ি রাখা আছে, দেশের মুড়ির বিশিষ্ট সোঁদা-সোঁদা গন্ধটা মাঝে মাঝে নাকে আসিতেছে। গল্পের মধ্যে দিদিমার স্বরটা এক একবার আবেগে গাঢ় হইয়া আসিতেছে।

শৈলেনের বড় অদ্ভুত ঠেকিতেছে। এক প্রকারের নূতন অনুভূতিতে মনটা ভরিয়া যাইতেছে, সেটাকে বোধ হয় বংশানুভূতি বলিয়া অভিহিত করা চলে,—মনে হয় মাকে লইয়া যাওয়ার মধ্যে সেও যেন কোথায় উপস্থিত রহিয়াছে। এই মাকে দিদিমার গল্পে নূতন রূপে দেখিয়া তাহার বিস্ময় লাগে। একটু যেন দূর বলিয়াও মনে হয়,—মামার বাড়ির সবাইকে লইয়া মা যেন আলাদা। তাহারপর কবে কোথায় তপস্বিনী উমাকে যেমন কৈলাসে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেইরকম একটা ব্যাপারের মধ্যে দিয়া মা ক্রমে ক্রমে হইয়া পড়িলেন সাঁতরার ওদের। শৈলেনরা যেন সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় কি ভাবে আছে। সেই দুরের মা-ই আজ আবার সমস্ত মামারবাড়ি সুদ্ধ কাছে হইয়া গেছেন, আপন হইয়া গেছেন নিবিড় ভাবে। এ দিকে গল্প চলিতে থাকে, ওদিকে শৈলেনের নিজের জগৎ ওঠে রেখায় রেখায় পূর্ণ হইয়া। যাহারা দেবমূর্তিতে পূজা পান তাঁহারাই যেন মানবমূর্তিতে রূপান্তরিত

হইয়া গেছেন।—কখন আর কি করিয়া বোঝা যায় না, তবে মনে হয় যেন ঠাকুরমার সকাল বেলাকার শ্লোকেব, অজানা অর্থের 'রজতগিরিনিভ' শঙ্কর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, পাশে বধূবেশিনী উমাপার্বতী···এমন সহজ ভাবে, কোন কিছুর গণ্ডি না ডিঙাইয়া হয় ব্যাপারটা, যে শৈলেনের মনে একটু প্রশ্ন উদয় হয় না, বিশ্বাসে এতটুকু বাঁধে না, দৃষ্টিতে এতটুকু কুহেলি স্পর্শ করে না। বাঙালীর ঠাকুর-দেবতা ঘরের লোক, মানুষের নিত্য সুখ-দুঃখে, মানুষের মতোই হাসি আর অশ্রু লইয়া মানুষের সঙ্গে মিশাইয়া আছেন,—মা কখন পার্বতী-উমা হইয়া যায়, পার্বতী-উমা কখন মায়ের মধ্যে কানায় কানায় ভরিয়া ওঠেন বোঝা যায় না, তবে দিদিমার গল্পে নিত্যই যেন এই খেলাই হইয়া চলিয়াছে।····শৈলেনের কান থাকে গল্পে, দৃষ্টি থাকে তাহার নিজের গড়া এই কল্পলোকে। এক এক সময় কল্পলোকই এত বাস্তব হইয়া ওঠে, গল্প আর কানেই আসে না, 'হুঁ' দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। দিদিমা বলেন—"মেজকত্তা ঘুমুলে নাকি?···· গিরি তোদের হোল গা? তোরা যেন যজ্ঞির রান্না রাঁধছিস বাছা, পারে কখনও কচ্ছেলেরা জেগে থাকতে এতক্ষণ?"

শৈলেন বলে—"তুমি বলোনা দিদিমা, ঘুমোব কেন?"

গল্প চলে: "প্রথম যখন ছেলে-কোলে এল গিরি, আমার বেশ মনে আছে, থাকবেই কিনা—কেমন আশ্চর্য রকমে এসে পড়ল—একেবারে হঠাৎ!—চারিদিকে ষষ্ঠীর বোধনের আওয়াজ উঠেছে। সিংহবাহিনীর তলায় যাত্রার দল নেমেছে, তাতে রামির মার দূর সম্পর্কের এক ভাই গান গায়। রামির মা তাকে নিয়ে এসেছে, উঠোনে বসে আমরা গান শুনছি। এই বিকেল বেলাকার দিকটা আর কি, বেটাছেলেরা সব সিংহবাহিনীর তলায় গেছে। আশেপাশের ক'বাড়ির মেয়েরা একত্তর হয়েছে, ছোঁড়াটা গান করছে। গানটা মনে নেই সমস্ত, তবে প্রথম

দিকটা একটু একটু মনে আছে, কানে বড্ড লেগে গেছল কিনা—"মা, গা তোল গা তোল, বাঁধো মা কুন্তল, ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী। লয়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ বলে··' আর মনে পড়ছে না। একে ছোঁড়াটার গলা খুব মিষ্টি, তাতে প্রায় বছর তিনেক দেখিনি মেয়েটাকে, প্রাণটা যেন আইঢাই করে উঠল। চোখের জল না সামলাতে পেরে তোর ছোটদিদিমা আর আমি দু'জনেই আঁচল তুলেছি এমন সময় —"জেঠাইমা কৈ গো?—মা কোথায়?'—বলতে বলতে দোর টপকে একেবারে গিরি!—কোলে এই ইনি—বড় কর্তা····"

দিদিমা দাদার পানে মুখ ফিরাইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া বলিলেন—"এখন বড কর্তা হয়েছেন, মুরুব্বি হয়েছেন; তখন এত্তোটুকুটি—ফুটফুট করছে রং, মাথায় একমাথা কালো কুচকুচে চুল···· "ওমা, কে গো?—গিরি! তুই আমাদের মন থেকে বেরিয়ে মাটিতে পা দিলি নাকি গো?"····সঙ্গে সঙ্গেই তোর ছোটদাদুর সঙ্গে গপ্প করতে করতে জামাই এসে গড করলেন····"

অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হয় শৈলেনের, একটু উঠিয়া ঘাড ফিরাইয়া দেখে, কি ভাবিয়া হাসিয়া বলে—"দাদা?" দাদাও একটু হাসিয়া বলে—"যাঃ"—দুজনেই বোধ হয় ভাবে মস্ত বড় একটা গৌরবের কাজ হইয়া গেছে—যাহাতে গৌরবের জন্যই লজ্জিত হইয়া পড়িবার কথা।

গল্প এগোয়, শৈলেনের আবার ভাঙা গড়া চলিতে থাকে। মনটা যেন স্বপ্নের ঘোরে কোন বিস্ময়কর জগতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, —সেদিনকার মা, কাপড়ে, গয়নায়, আলোয় ঝলমল—তখন তাহারা কেহই ছিল না—তাহারপর ঐ মা—দাদা কোলে,—মনে পড়িয়া গেল পাঁজিতে কবে একটা ছবি দেখিয়াছিল—গণেশকে কোলে লইয়া দুর্গা আসিয়াছেন বাপের বাড়ি, পিছনে মহাদেবের কোলে কার্তিক, পাশে

লক্ষ্মী-সরস্বতী, আরও পিছনে একটা মোট কাঁধে নন্দী কি ভৃঙ্গী ; সামনে চণ্ডীমণ্ডপের মতো একটা বাড়ি থেকে নামিয়া একটি স্ত্রীলোক আগাইয়া যাইতেছে—বোধ হয় মেনকা। ছবির নীচে লেখা আছে—'শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা' ...ঐ মা'র পরে আবার আজকের এই মা···শৈলেন একটু আগে একবার রান্নাঘরে গিয়াছিল,—মা ছোটদিদিমার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে রাঁধিতেছেন, আগুনের আলোয় মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে ; কপালে, ওপর-ঠোঁটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে, সিঁথির সিঁদুর একটু যেন ভিজিয়া চিক্‌চিক্ করিতেছে ; গল্পচ্ছলে কি একটা বোধ হয় কৌতুকের কথা হইয়াছে, মা'র মুখে হাসির জের লাগিয়া আছে এখনও ; অত্যন্ত ব্যস্ত....

শৈলেন প্রশ্ন করে—"হ্যাঁ বড়দিদিমণি, উমাই তো শেষকালে অন্নপূর্ণা হয়েছিলেন বড়দিদিমণি ?"

দিদিমা হাসিয়া বলেন—"শোন কথা মেজকর্তার ! অন্নপূর্ণা যেন আর একজন কেউ !"

সব গল্প একদিনেই শোনা নয়, এমন কি বোধ হয় একবারেও নয়, তবে বড়দিদিমার মুখেই প্রায় সব শোনা। ছোটদিদিমণির আদরটা রূপ ধরিত বেশির ভাগ খাওয়ানয়, গল্প বলিবার মতো তাঁহার বড় একটা ফুরসৎও থাকিত না, তাহা ভিন্ন বড় জায়ের নিকট হইতে নাতিদের পাওয়াও সম্ভব ছিল না গল্প শুনাইবার নিমিত্ত।....বড়দিদিমা বলিতেছেন ঃ

"সমাজ আছে বৈকি, সমাজ নেই তো মানুষের চলছে কি করে ?—দায় আছে ধম্ম আছে মানুষের, সমাজই তো দেখে।....তোদের বড়দাদু

তো পাগল্লের মতন হয়ে উঠল—চরখি বাজির মতন ঘুরপাক খাচ্ছে—এটা সামলে, ওটা ঠিক করে, আর মাঝে মাঝে ঐ এক কথা—'মা আমার তো সব সামলে নিলে নিজের তপিস্তের জোরে, কিন্তু নিকুঞ্জ-দাদার হাত থেকে কি করে পরিত্রাণ পাই?—সে যে এসেই ঝগড়া লাগাবে, কি করে কাটবে রাতটা?....হে ভগবান, হে বাবা তারকেশ্বব, আজকের রাতটা কাটিয়ে দাও....হে মা সিংহবাহিনী'—শেষকালে কথাটা ঘোষাল ঠাকুবের কানে উঠল। তিনি ওদিকের ব্যাপাবটা সামলাচ্ছিলেন, এসে এই উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চীৎকাব কবতে লাগলেন—'বলি, তুমি যে মেয়েমানুষেরও বাড়া হলে হে?—বেলে-তেজপুরের সমাজে কি মানুষ নেই,—সব ভেড়াব দল? এই জোর গলা কবে বলছি—দিক দিকিন বাগড়া, কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে দেখি। নকু ঘোষাল মবে গেছে? ও-ই কেমন করে বেলে-তেজপুবে বাস করে দেখব? ও-ই আগে সমাজের কাছে জবাবদিহি দিক—টাকা খেয়ে, তঞ্চকতা করে ও একটা নিরীহ লোকের কেন এভাবে সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল,—একটা তেজবরে আটচল্লিশ বছরেব দেউলেমাবা জোচ্চোরের সঙ্গে সাজোস করে! তাব নাড়ি-নক্ষত্রেব খোঁজ নিই নি আমি? নেহাৎ আমল দিচ্ছিলে না, কি কবব?....বাজা।—সে হারামজাদা রাজার লোকেরা পৌঁছুচ্ছে না কেন এসে? আমি তাদের দেখে নোব, দেখে নোব কেমন করে তারা আস্ত শরীরে বেলে-তেজপুব থেকে ফিরে যেতে পারে...."আর, তুমি কি ভেবেছ হোতে দিতাম আমরা ও-বিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের চোখের সামনে?"

—ভয়ঙ্কর রাগী লোক, সে কি থামতে চান?

চারিদিকে ছি-ছিক্কা পড়ে গেল। যাই হোক সে রাত্তিরে আর ফিরে আসতে পারলেন না ও-বাড়ির বড়্-ঠাকুর, ওদিকে আবার এই বিটকেল

ব্যাপার কিনা,—যারা আসছিল তারা সব পুল ভেঙ্গে স্মৃতুনির খালের মধ্যে পড়ে মরণাপন্ন। বলে যে ধম্মের কল বাতাসে নড়ে—সে তো মিথ্যে নয়।....অত গোলমালের মধ্যে, অত তাড়াহুড়োর মধ্যে খুবই স্নচরংকুলে কেটে গেল রাতটা। খানিকটা জোগাড়-যন্ত্র ছিলই, তোর দাদামশাই গ্রামের সমস্ত মেয়ে-পুরুষ বলে এল। যখন লোক এসে পড়তে লাগল, হুঁস হল বসাবে কোথায়? আমার তো চিরকালই দুষ্টু বুদ্ধি?—বললাম—'কেন ও-বাড়ির বড়-ঠাকুরের অতবড় বাড়িটা রয়েছে কি করতে?'

দামিনী ঠাকুরঝি মাথা ব্যথার নাম করে বাড়ি গিয়ে শুয়েছিল, উমেশ লাহিড়ী, তোদের বড়দাদু, আরও কয়েকজন গেছেন। আমিও খিড়কির দিক দিয়ে পৌছুলাম। আগেই পৌছে—যেমন বলি—বিনিয়ে বিনিয়ে আপনাত্ব দেখিয়ে বললাম—'নিজের বাড়িতে কাজ, আর তুমি কিনা ঠাকুরঝি শয্যে আশ্রয় করে পড়লে?—আমি জেঠাই, একটু পড়ে ছিলাম তাইতেই সবাই কত গঞ্জনা দিচ্ছে, তুমি আবার হলে বাপের বোন পিসি!....'

মিষ্টি চিপটেন কাটছি, এমন সময় এরা এদিক থেকে সব গিয়ে পড়লেন। তোর বড়দাদু বললে—"দিদি, দেখতেই তো পাচ্ছ, কি আতান্তরে পড়েছি, বাড়ির খানিকটা একটু ছেড়ে দিতে হবে সবার বসবার জন্যে, নৈলে মান-সম্ভ্রম থাকে না।"

দিদিমা নিজের কুটবুদ্ধির স্মরণে হাসিয়া উঠিতেছেন মাঝে মাঝে, বলিতেছেন—"আমি ঘরের মধ্যে ঐ-জন্যেই আগাম গিয়ে জুটেছি, একবার পিত্তিরক্ষে গোছের করে খাটের কাছে গিয়ে বললাম—'শুনছ ঠাকুরঝি, কি বলছেন ওরা?'....তারপর কি উত্তর দেয় না শুনেই দোরের কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বাইরের সবাইকে শুনিয়ে বললাম—"ঠাকুরঝি

বলছেন, এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি কি আলাদা যে ওঁরা আমায় জিগ্যেস করতে এসেছেন, না, গিরি আমার পর ?"....উস্, সেই একটি দিনে অতদিনকার গায়ের জ্বালা সব মিটিয়ে নিয়েছিলাম।—ও আবাগী ওদিকে গায়ের চিড়বিড়িনিতে আড়ামোড়া ভাঙছে বিছানায়, কিছু মুখ ফুটে বলতেও পারে না....এদিকে ওঁরা একটা কথা বলছেন আর আমি খাটের কাছে গিয়ে ধম্মের ডাক ডেকে, দোরের কাছে এসে বানিয়ে বানিয়ে বলছি—হাসিতে পেট এদিকে গুর-গুর করে উঠছে..."

দিদিমা যেন সন্থই উপভোগ করিতেছেন এইভাবে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া ওঠেন্। বলেন—"তারপর দিনও নয়, তার পরের দিন—মেয়ে জামাই যখন চলে গেছে, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বডঠাকুর এল। 'ট্যা-ফোঁ'—কিছু নয়, বাড়ি ঢুকল যেন চোরের মতনটি হয়ে। সব খবর তো পেয়েছিলই, তা ভিন্ন টেরও পেয়েছিল যে সমস্ত বেলে-তেজপুর বেঁকে দাঁড়িয়েছে ওর ওপর।

সকাল বেলা ঘোষালঠাকুর, রমাই চাটুজ্জে, কেদার চৌধুরী, উমেশ লাহিড়ী—আরও দু'তিনজন কা'কে সাক্ষী করে নিয়ে—সেই আগেকার পনের টাকা, তারপরের একশ' টাকা, তার পরের পাঁচশ' টাকা—সব ফিরিয়ে দিয়ে তোদের দাদু একখানা রসিদ লিকিয়ে নিলে।....কম ভোগান্ ভুগিয়েছে আমাদের ওরা ?"

মায়ের মুখে শোনা শৈলেনের।

সব চেয়ে বেশি কাঁদিয়াছিলেন কাত্যায়নী দেবী; অত কান্না বড়দিদিমা পর্যন্ত নাকি কাঁদেন নাই। উল্লেখ করিতে গেলেই মায়ের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিত, বলিতেন—"মেজমাসিমার কথাগুনো যেন

দাগ কেটে ব'সে রয়েছে বুকে—'গিরি, তোকে ভালোবেসে আমি কলঙ্ক নিলাম। তুই মা আমায় কিন্তু কখনও ভুল বুঝিস্ নি—বিশ্বাস করিস, যা ভুল করতে যাচ্ছিলাম, তা ভালোবাসারই ভুল। বল্ বিশ্বাস করলি—বল্, মনে কিছু নেই, বল্ গিরি।'

মায়ের সমস্ত চিত্তটা যেন স্মৃতির আলোড়নে মথিত হইয়া উঠিত, একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত অসীম প্রীতি আর শ্রদ্ধায় বলিতেন—"কী মানুষই ছিলেন, অমনটি আর দেখলাম না।"

এই লেখকের—

স্বর্গাদপি গরীয়সী (তিন খণ্ডে), নীলাঙ্গুরীয়, বরযাত্রী, চৈতালী, বর্ষায, শারদীয়া, হৈমন্তী, বসন্তে, আগামী প্রভাত, দৈনন্দিন, বিশেষ রজনী, রাণুব প্রথম ভাগ, রাণুর দ্বিতীয় ভাগ, রাণুর তৃতীয় ভাগ, রাণুর কথা মালা, অতঃ কিম্, কায়-কল্প ।